

তৃতীয় খণ্ড “বীণাপানি”র সূচী ।

[গজ]

বিষয় ।	লেখক ।	পৃষ্ঠা ।
অন্তর্জগৎ ও বহির্জগৎ	শ্রীযুক্ত বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়	৮৫
আমাদের কথা	৯
একটা নক্সা	বিরিকিমোহন সেন	১৪১
কলিকাতার ইতিহাস সংগ্রহ	১৬, ৪২
কাল	অনন্তকুমার দাসগুপ্ত, বি.এ,	৫০
ক্রীষ্টাব্দ-পূর্বে ভারত-সভ্যতা	সৌরীন্দ্রমোহন গুপ্ত	২১, ১১১
গৃহ-মন্ত্র	২৫
ছিয়াত্তরের মনস্তত্ত্ব	বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়	২, ৬৮
দিবাকর (গল্প)	শ্রীমতী মজুমদার	১১, ৩৮, ৬৪, ৭৪
মন্দের মূর্তি-ভেদ	বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়	১১৫
মধ্য-প্রচার	রাজকুমার পাল	১৩১
প্যালারামের পুঁথি (রহস্য)	অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল	১৩৫
প্রতাপ (গল্প)	শ্রীমতী মলিনীবালা সেন	২৮
“বাবু” (নক্সা)	শ্রীযুক্ত বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়	২৮
মহারাজা প্রতাপ সিংহ	প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যো, ৩৫, ৫৮, ৮০, ১২৪	
সমালোচনা ও মতামত	৪৭, ৯৬, ১৪৫
স্বপ্ন কে ? (১)	নতীশচন্দ্র সেন	

[পত্র]

বিষয় ।	লেখক ।	পৃষ্ঠা ।
আত্ম	শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত	২০
আলি এই বাবুলার	চাঁকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	১০০
একটা সনেট	ঐ ঐ	২৭
কিনে এ জীবন ধরি ?	ঐ ঐ	১০
গোটে	ভগবতীচরণ দাস	৫৭
তা'রে ত বলিনি যেতে	শ্রীমান্নাল মজুমদার	১৩৩
দরিন্দা	চাঁকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৮৫
ধিকার	হরিপ্রসন্ন দানগুপ্ত	৮৯
নব বর্ষ	...	৭৩
লক্ষ্মী মজুম	চাঁকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	২৭
শিশুর প্রতি	সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত	৬২
দেখি গো স্থপন !	চাঁকচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়	৪৯
স্নেহের ভগিনী	অমৃতলাল ঘোষাল	২০

চতুর্থ খণ্ড "বীণাপানি"র সূচী ।

[পত্র]

বিষয় ।	লেখক ।	পৃষ্ঠা ।
অষ্টমত বাদ	শ্রীযুক্ত রাজকৃষ্ণ পাল	৬
কিরোরোপাদনা	শরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী এম.এ., ১৪৫, ১৭১, ১৯৩, ২১৯	
ঐশী-সানন ও শান্তি	বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়	১৪
কাব্যবিশারদের কারাবাস	...	৪৩
চিত্তা	রাজকৃষ্ণ পাল	৫৮

वीणापानि ।

No

লেখক ।	পৃষ্ঠা ।
শ্রীযুক্ত বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়	২১
শালা	২০৮
মি	১২৭
রী	১০৬
দীর পত্র	২৬৪
গল্প)	১২, ২৫
লালা	২৪৮
কও	১০৪
ধর্ম	৬৬, ৮২
শ্রীমতী নলিনীবালা সেন	৩৮
কীরেদপ্রসাদ বিত্তাবিনোদ এম.এ.	৪২, ৭৩, ১১০, ১২১, ১৪৭, ১৮৩, ২০০, ২২৪
শ্রী স্বর্ণময়ী	১৬৫
প্রতাপ সিংহ	২৩, ৪৮, ১৪১, ২৬১, ২৮২
মলা	২৬৮, ২৭৪
জনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১১৭, ১৪০
মালোচনা	২৪১, ২৬৪
না ও মতামত	২৭
(গল্প)	১১৭, ১৪০
দক্ষিণাচরণ সেন	৪৫, ৭১, ৯৫, ১১১, ২১০
রাজকৃষ্ণ ঘোষ	১১৭, ১৪০
গিরীশচন্দ্র ঘোষ	২৪১, ২৬৪
বিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়	২৭

ଅଛି। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି “ବିଶାଳାକାଶ”ର ପঞ্চମ ଅଂଶେ ସମାପ୍ତ ।

[পত্র]

বিষয় ।

লেখক ।

আর যা'ব না

শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র বন্দ্যোপা

আশা

” উপেন্দ্রনাথ সিংহ

একটা সনেট

” চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

এবে রাক্ষসের প্রাণ

ঐ ঐ

কাল-যন্ত্র মাহাত্ম্য

” গোপালকৃষ্ণ ঘোষ বি.এ,

কোথা' যাই

” চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?

” সারদাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

হৃৎক পীড়িতের প্রতি

” চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

পরবে না ?

” গণেশচন্দ্র সেন

প্রার্থনা

” কিরণচন্দ্র দত্ত

কুল

” সারদাপ্রসাদ সেনগুপ্ত

বাসনার অবমান

স্বর্গীয়া মলিনা বসু

বিলাসিনীর আত্ম-বিলাপ

শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র দত্ত

ঐ ঐ

প্রসঙ্গে

” নলিনীকান্ত চট্টো, এম.এ,

” নিত্যকৃষ্ণ বসু এম.এ

ঐ ঐ

বাবন-বাসনা

” কিরণচন্দ্র দত্ত ৩০, ৬০, ৮২, ১১

লনা-মহিমা

ঐ ঐ

সারদার প্রতি

ঐ ঐ

সুশীল

” চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

স্মৃতি

বীণাপানি।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী।

পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে। ভগবতি, ভারতি, দেবি, নমস্তে।”

{ মাঘ, ১৩০৩ সাল। { ১ম সংখ্যা।

সারদার প্রতি।

থেকে পড়ে মনে, মরুময় এই প্রাণে,
 আলোক প্রতিমাখানি কি জানি কাহার ?
 ন আসিয়ে ছুদে, ভাঙ্গা বুক দেয় বেঁধে,
 নিরাশা-সাগরে করে আশার সঞ্চার !
 নিকে জ্বালাতন, নিম্নে এই মরা-মন,
 কেমনে বাঁচিয়ে থাকি বল গো আমার ?
 এক নীর-বিন্দু, প্রাণ-সঞ্জীবনী-সিদ্ধ,
 মরা-প্রাণে মরা-মনে, আবার জীবায় ;
 'র প্রেম-বিন্দু সেটী কহ গো আমার ?

মনে, মিষ্টভাবে সযতনে,
 'সি' গো থেকে থেকে প্রদানে সাস্থনা ?
 বাণী, ক'র সেই মুখখানি,
 ময় মনে জাগে যখনি তখনা,—

কা'র সেই প্রেম-মুষ্টি, প'ড়ে মনে হয়
কা'র অখি সচঞ্চল বিদ্যায় খেলায় ?
~~নাথ শ্রীকৃষ্ণ~~ এককার, আলোকের দ্বন্দ্ব,
ক'রে,—মরা-প্রাণে আবার জীবায়.
কা'র প্রেমালোক নেতী কহ গো আমার ?

9

কিন্তু বহুদিন হায়, অন্তর মকতূহ
কেন গো দেয় না দেখা সে প্রতিমাখানি ?
বোধ হয় চলে গেছে, আর না আসিবে
আর না লানিবে সুধা সেই সুধা ঋণি ,
কই কই কোথো' গেলো, কই সৈ প্রাণের আ
কোথায় কোথায় ছায় জীবন-দায়িনি !
অন্ধকারে ঘাই মাঝা, কোথা' সে সারাং
মানস-মরালাী মম প্রেম-সঞ্জীবনী ?
কোথায় কোথায় হায় জীবনদায়িনি !

8

ডাকিলে পাইনে দেখা, কিন্তু নিজে দেয়
 কেন ওগো লুকাচুরি-খেলা মোব সনে ?
 কি জানি কেন গো হায়, কোমলে কঠিনা
 প্রেমের পাষাণীমূর্তি পড়ে মোর মনে !
 ছেড়ে দে ছেড়ে দে বাণি, খেতভুজ্জে “বীণাপা
 প্রাণনাশা ওই তব লুকাচুরি খেলা ।
 আব, বস্, হৃদাসনে, পালাস্নে
 তব অদর্শনে আমি বড ঝালাপাগ
 ছেড়ে দে ছেড়ে দে বাণি ! লুকার্চা

5

সংসারের আলাতন, ত'য়
ভূমি মো'র এ অগতে জীবন সহ

চাই না সম্ভোগ-তৃপ্তি, তাহে নাই পূর্ণ দীপ্তি,
 তুমি আসি আলো কর হৃদয়-কমল ।
 চাইনা বিবরণ-বিষ, কলকূট মহাবিষ,
 বিলাস-কলুষ-বিষে করে অর অর ;
 মানবের ভালবাসা, তাহে মোর নাহি আশা,
 মিটিয়াছে সে পিয়াসা, তুমি কৃপা কর !
 অঁধারহৃদয়ে বাণি । তুমি আলো কর !
 শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ।

অদ্বৈতবাদ ।

চিত্তনা হইতেই অদ্বৈতবাদের সৃষ্টি । জগতের সমুদয় জবাই
 দাস । মানুষের দেহের যেমন নানা অবস্থা হয়, যথা—শিশু,
 যুবক, যুবা ইত্যাদি ; সেইরূপ মানুষের কর্মের নানা অবস্থা হয়,
 যথা—ভাল কর্ম, মন্দ কর্ম, ঠকা কর্ম ইত্যাদি । আবার মানুষের
 চৈতন্তের নানা অবস্থা হয়, যথা—রাগ, ভয়, শোক ইত্যাদি ।
 মানুষ চিন্তা করিতে করিতে চিন্তায় নানা অবস্থা দেখিতে
 পায়, যথা—স্থল চিন্তা, স্থল চিন্তা, মহাচিন্তা ইত্যাদি । এই মহাচিন্তার
 ফলে যে চিন্তা তাহাকেই “অদ্বৈত” চিন্তা কহে । এখানে আসিলে
 একাকার ।

চিন্তা করিতে করিতে চিন্তার চরম স্থানে গিয়া দাঁড়াইয়া দেখিলে,
 জগত একাকার বলিয়া বোধ হয় । মানুষের এই চিন্তাবস্থার নাম
 অদ্বৈতাবস্থা । ঠাকুর বলিয়াছেন, “যেমন খোড়ের খোলা ছাড়াইতে
 পাওয়াইতে ক্রমে মাজে গিয়া উপস্থিত হইলে, আর তাহা ছাড়ান
 যায় না । এই স্থলে দাঁড়াইয়া যদি চিন্তা করি যে, মাইজ কি বস্তু
 এবং যে সকল খোলা ছাড়াইয়া আসিলাম, তাহাই বা কি বস্তু ? তাহা
 হইলে আমরা এই জানিব যে, মাইজ এবং খোলা এক বস্তু দ্বারা নির্মিত
 হইয়াছে । অর্থাৎ খোলারও যে বস্তু, মাইজেরও সেই বস্তু ! যেমন,

খোলাতেও যে জল এবং ঐ জল থাইতে যেমন আশ্বাদন, মাইজেও সেই জল, থাইতেও ঐরূপ ; খোলার যে বর্ণ, মাইজের সেই বর্ণ ; খোলাতে যে ছাই আছে, মাইজেও সেই ছাই আছে । অতএব খোলা এবং মাইজে একাকার । তাহার পর যদি মাজ হইতে নামিয়া খোলায় আসি, তবে আর একাকার দেখিতে পাই না, তখন দেখি, খোলা স্বতন্ত্র মাইজও স্বতন্ত্র ; স্বতন্ত্র খোলা মানুষের ভক্ষ্য নহে, মাইজ মানুষের ভক্ষ্য । অতএব মাজ ও খোলায় স্থলে যেমন প্রভেদ, দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদেও সেইরূপ প্রভেদ । মাইজ এবং খোলা যেমন বৃক্ষের অবস্থাব কথা, তদ্রূপ দ্বৈতবাদ এবং অদ্বৈতবাদ মানুষের চিন্তার অবস্থার কথা ।”

খোলা ছাড়াইতে ছাড়াইতে যাওয়া, অর্থাৎ চিন্তা করিতে করিতে উপবে উঠার নাম “আবোহণ সূত্র” এবং মাঝে পৌছিয়া, আর পথ না পাইয়া, তথ্য হইতে নামিয়া আসার নাম “অববোহণ সূত্র ।”

বরফ লইয়া যদি চিন্তাব আববোহণ সূত্র ধরিয়া উঠিতে থাকি, তাহা হইলে জলে গিয়া উপস্থিত হইব ; আবার জল হইতে যদি ঐ সূত্র ধরিয়া উঠিয়া পড়ি, তাহা হইলে হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেন গ্যাসে গিয়া দাঁড়াইব । অতএব জল, বরফ এবং বাষ্প বা গ্যাস এক জলের তিনাবস্থা । জলের শেষাবস্থা গ্যাস, এই অবস্থার ওদিকে আব যাইবার উপায় নাই ; অতএব এই স্থান হইতে দেখিলে আমাদের এই বোধ হইবে যে, সেই এক অদ্বিতীয় বাষ্প জলে এবং সেই বাষ্পই বরফে, কাজেই এখানে একাকার । কিন্তু আবার আববোহণ সূত্র ধরিয়া ঐ বাষ্প হইতে ক্রমে জলে এবং বরফে নামিয়া আসিলে দেখিব, জলের সঙ্গে বরফের মিল নাই এবং বরফের সঙ্গে গ্যাসের মিল নাই । জল তরল, বরফ কঠিন ; জল যেরূপ শীতল, বরফ তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শীতল, আর বাষ্পের ত কথাই নাই, তাহা চক্ষে দেখা যায় না । জলের পিপাসা, গ্যাস থাইলে মিটে না ; অথবা বরফের কার্য্য জলের দ্বারা সাধিত হয় না । ফোড়া কাটিবার সময় স্থানিক অসাড় করিতে বরফ ব্যবহৃত হয়, কিন্তু জলের দ্বারা সে কার্য্য হইতেই পারে না । অথবা মুখ ধুইবার কার্য্য বরফ দ্বারা হয় না । অতএব দ্রব্যের

এক অবস্থার সঙ্গে অপরাবস্থার মিল হয় না। শিশুর সহিত যুবকের মিল নাই এবং যুবকের সহিত প্রৌঢ়ার মিল নাই। এই সকল অমিল সূত্রকে দ্বৈতবাদ কহে, এবং মিল সূত্রকে অদ্বৈতবাদ কহে।

ভুলে বা দ্বৈতবাদে আমাতে, হরিতে বা শ্রামেতে অণবা আমাতে এবং গাছেতে, অথবা আমাতে এবং পশু পক্ষীতে বড়ই প্রভেদ; কিন্তু সূক্ষ্ম বা অদ্বৈতবাদে এ সমুদয়ই একাকার।

সকল নরদেহই নিম্নলিখিত দ্রব্যসংযোগে সংগঠিত, যথা—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, অঙ্গার বা কার্বন, নাইট্রোজেন, ক্যালসিয়াম বা চুন, ফস্ফরাস, গন্ধক, সোডিয়াম, ক্লোরিন, পোটাসিয়াম, লৌহ, ম্যাগনেসিয়াম, সিলিকন, তাম্র, সিসা ও ব্যালুমিনিয় ইত্যাদি। এই সকল দ্রব্য আমাতে, হরিতে আছে, এবং শ্রামেতে রাখিতেও আছে। ইহা না থাকিলে, এক চিকিৎসা গ্রন্থ দ্বারা সকলেব চিকিৎসা চলিত না। পরন্তু, ভাগেব ভারতম্যে ঐ সকল মূল দ্রব্য গকতে, ভেড়াতে এবং মৎস্ততে বা সকলেতে আছে। যেমন তোমার আমার ভিতর যে নাইট্রোজেন, নয়দা ছোলার এবং ছাগ প্রভৃতি পশু মাংসের ভিতর সেই নাইট্রোজেন। আবার গাছেব ভিতর, ফলের ভিতর, পশু পক্ষীর ভিতর এবং তোমার আমার ভিতর যে অঙ্গার, যে সোডা, যে গন্ধক, যে ফস্ফরাস আছে, পৃথিবীর সমুদয় দ্রব্যের ভিতর সেই অঙ্গার, সেই সোডা, সেই গন্ধক, সেই ফস্ফরাস সেই বালি, সেই চুন, সেই ছাই, সেই ভস্ম আছে; অতএব এখানে সব একাকার। কাজেই এ সকল যুক্তি অদ্বৈতবাদের উক্তি।

কিন্তু এই একাকার অবস্থা হইতে নামিয়া পড়িলে, ইচ্ছা করিয়া নানানামিলেও তবু নামিতে হইবে। কারণ, একাকার অবস্থায় থাকা চলে না; “তঁাহাকে” দেখা চলে! গাছা হউক, নামিয়া আসিলে দেখিবে, গরু, ভেড়া, ছাগল, গাছ, পালা, গাছের পাতা, গাছেব ডাল, গাছের ফুল; মানুষ,—যুব, পুরুষ, নারী, বালক, শিশু, বৃদ্ধ প্রভৃতি স্ব স্ব প্রভেদ। এত প্রভেদ যে, প্রভেদের ভিতর প্রভেদ। ছই আত্র গাছ এক নহে, ছইটী মানুষ এক নহে। এই স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অবস্থার নাম দ্বৈতবাদ।

ঠাকুর বলিয়াছেন,—“গুরু শিষ্যকে কহিল, ‘দেখ বাপু! আত্র গাছে কাঁঠাল হয়, আর তাল গাছে নীচু হয়; কলা গাছে আম হয়।’ যে শিষ্য এই গুরুবাক্য ঈশ্বর বাক্যবোধে বিখ্যাস করিয়া গুরুকে উত্তরে বলিতে পারে যে,—“প্রভো! তোমার অসাধ্য কি আছে? তুমি ইচ্ছা করিলে সবই করিতে পার। আপনার এক একটা অবস্থাতেই জগতের এই অবস্থা। মানুষ, গরু, ভেড়া তোমার অবস্থার কথা, বৃক্ষলতা তোমার অবস্থার কথা। মানুষের এক রক্তের অবস্থাহুনারে সেই রক্ত যদি নখ, সেই রক্ত যদি মাংস, সেই রক্ত যদি চুল, সেই রক্ত যদি চক্ষু হইতে পারে, তাহা হইলে, আপনার অবস্থা বিশেষে (অর্থাৎ অবৈতবাদে) বে, কলাগাছে কচু এবং কচু গাছে কলা হইতে পারে না, ইহা কে বলিল? ঠাকুর সেই মন আমার দাও, যেন তোমার সঙ্গে একাকার হইয়া যাই। ঠাকুর! তুমি যে চৈতন্য। তোমার সঙ্গে অবৈত এবং নিত্যানন্দ না থাকিলে কি তোমাকে চেনা যায়?”

যখন উর্দ্ধদিকে দৃষ্টি করি, তখন এক আকাশ সকলের উপর দেখিতে পাই। আবার যখন সেই দৃষ্টিকে নিম্নদিকে নামাই, তখন আর অনন্ত আকাশ দেখিতে পাই না, আকাশ যেন খণ্ড খণ্ডভাবে বিভক্ত হইয়াছে। সেই অনন্ত আকাশ ঘটের ভিতর প্রবেশ করিয়া “ঘটাকাশ” এবং পটের ভিতর প্রবেশ করিয়া “পটাকাশ” জলের ভিতর প্রবেশ করিয়া “জলাকাশ” মানুষের ভিতর প্রবেশ করিয়া “মানুষাকাশ” মেঘের ভিতর প্রবেশ করিয়া “মেঘাকাশ” নাম ধারণ করিয়াছে। অবৈতবাদের অনন্তাকাশকে কেহ প্রাচীর দিয়া বন্ধ করিতে পারে না, কিন্তু নিম্নের সমুদয় আকাশকে প্রাচীর দিয়া বন্ধ করিতে পারে। ইহাই হইল আকাশের বৈতবাদ।

অবৈতবাদে দাড়াইয়া মানুষ “ঐশাকে” সকলের পিতা বলিতে পারে, কিন্তু বৈতবাদে আসিলে, এক ঈশ্বরকে সকলের পিতা বলা চলে না, অর্থাৎ ঈশ্বর আমার পিতা, এবং আমার পিতার পিতা, কিরূপে হইবেন? তিনি যদি আমার পিতার পিতা হইবেন, তাহা হইলে তিনি আমার ঠাকুরদাদা হইয়া যান! বস্তুত, স্থলে অবৈত বা ব্রহ্ম

সে করিতে গেলে, এইরূপ গোলযোগে পড়িতে
রূপ ভাবা যায় যে, এক মৃত্তিকা হইতে ঘট,
II, খুরি এবং সরা ইত্যাদি হইয়াছে ; এখন খুরি,
সী ও জালা সকলেই যদি তাহাদের সেই এক
নাটিকে জন্মদাতা পিতা বলিয়া উপাসনা করে, তাহা
বলা হয় না। কারণ, যথার্থই উহার সেই এক অদ্বিতীয়
ই জন্মিয়াছে। তবে সরা, খুরী, জালা, কলসী প্রভৃতি
বস্তু বিশেষের নাম মাত্র। অতএব আমরাও সেই এক
ঈশ্বর হইতেই জন্মিয়াছি, তাই তিনি আমাদের সকলের
। তবে যে, পিতা, পুত্র, ভ্রাতা প্রভৃতি নাম পাইয়াছি, ইহা
নাদের অবস্থা বিশেষের জন্ত।

এরূপ একাকাব ভ্রমবশতঃ পারি, কিন্তু একাকার করিতে পারি না।
কারণ, খুরির কার্য কলসীতে হয় না ; অথবা পুত্রের কার্য পিতা
দ্বারা হয় না ; স্বামীর কার্য স্বামীতে করিবে, ভ্রাতা দ্বারা কি সে কায
মিটিবে? উর্দ্ধদৃষ্টিতে এক উপাদানে সকলকে মিলাইতে পারি,
কিন্তু নিম্নদৃষ্টিতে যিনি যে স্থানের বা যে অবস্থাপন্ন, তাঁহাকে সেই স্থানে
সেই অবস্থায় রাখিয়া থাকি। জামা, কাপড়, রুমাল, ঠকিন প্রভৃতি
সকলই এক সূতা দ্বারা হইয়াছে, বিলক্ষণরূপে তাহা অবগত আছি,
কিন্তু কাপড় পরিধান করিবার অবস্থায়রূপ, এ অবস্থায় জামাকে
পরিধান করা চলে না ; জামা যে অঙ্গের পরিধেয়, তাহাকে সেই অঙ্গে
পরিধান করিতে হয়। রুমালের কাজ জামায় হয় না, অথবা জামার
কার্য রুমালে হয় না ; যদি হয়, তাহা হইলে জামাকে ছিঁড়িয়া রুমালে
অগ্রে পরিবর্তন করিতে হয় ; তবে ত জামা দ্বারা রুমালের কার্য
হইবে। পরন্তু জামা ছিড়িয়া, রুমাল করিলে, তখন লোকে আর তাহাকে
জামা বলিবে না, রুমালই বলিবে। এত পরিবর্তন তিনি না করিয়া
দিলে হয় না। অতএব একাকার ভাবা চলে, করা শীঘ্র চলে না ;
বেগর তাঁহার রূপা ভিন্ন, যোগ ভিন্ন হয় না। - তবে তাঁহার কাছে
যাইতে হইলে একত্রে একাকার হইয়া যাইতে হয়, নচেৎ নয়।

ঠাকুর বলিয়াছেন, “আমি ত এক । আমি,
কিন্তু আমি নিজেই নিজের হস্ত এবং পদকে এবং
আমার হাতের কার্য্য পায়ে করিতে পারে না,
হাতে করে না । যে যাহার, অবস্থানুসারে সে তাহার ৷

ঠাকুর কেশব বাবুকে বলিয়াছিলেন, “হাঁয়ে কে
ব্রাহ্মণের পৈতা ফেলাইতেছি।” উত্তরে কেশববাবু
“আজ্ঞে হাঁ ! যখন এক ঈশ্বরের পুত্র সকলেই, তখন সক
ভাই ভাই ! অতএব ভা’য়ে ভা’য়ে আর প্রভেদ
প্রয়োজন কি ?”

ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “বটে । তুই নিজের নামটা বামহস্ত দিয়া
দেখি । অথবা জল বলিলেই যদি সকল জলকে বুঝাইত, তাহা হইত
নর্দমার জল এবং গঙ্গাজলে প্রভেদ থাকিত না । গঙ্গাজল পানীয় খাও
যায়, নর্দমাব জল খা দেখি । যখন তোর বাম হস্তে এবং দক্ষিণ
হস্তে প্রভেদ রহিয়াছে, তখন কি ব্রাহ্মণ শূদ্রে প্রভেদ থাকিবে না ।”
ইহার উত্তরে কেশববাবু বলেন, “মহাশয় ! আপনিও ব্রাহ্মণ, কিন্তু
আপনার পৈতা নাই কেন ?” ঠাকুর বলিয়াছিলেন, “দেখ, কেশব !
আমি পৈতা পরি, কিন্তু আমার পৈতা হাবাইয়া যায়, খুঁজিয়া পাই
না । যখন ঝড় উঠে, তখন বটগাছ অশ্বখগাছ চেনা যায় না । ঝড়
থামিয়া গেলে, গাছ চেনা যায় ; সে সময় পৈতা পড়ি, আর ঝড়ের সময়
পৈতা কোথায় উড়িয়া যায়, খুঁজিয়া পাই না । তুই লোকের পৈতা
ফেলাইতেছি কেন ? উহাদেব দেহে ঈশ্বর, প্রেমের ঝড় উঠিলে
পৈতা আপনি উড়িয়া যাইবে ।”

কলা, মূলা প্রভৃতি ফলকে, বৃক্ষ লতা প্রভৃতি-গাছকে, মানুষ গরু
ভেড়া প্রভৃতি জন্তুকে, ইট কাট প্রভৃতি দ্রব্যকে অথবা যদি জগতের
সমুদয় দ্রব্যকে অষ্টৈত বা ব্রহ্মাণি দ্বারা দক্ষ করা যায়, তাহা হইলে
এই জগত দক্ষ হইয়া কেবল এক অদ্বিতীয় ভাষ্যে পরিণত হয়, অর্থাৎ
এক হইয়া যায় । কিন্তু আবার জ্ঞানবারি দিয়া ঐ সকল দক্ষদ্রব্যকে
পুনর্জীবিত করিলে, আবার স্ব স্ব পৃথক পৃথক বোধ হইবে । তখন

দেখিবে, কাহার সঙ্গে কাহারও মিল নাই। এক অবিভীষ লোহ দ্বারা ছুরী, কাঁচি, ছুঁচ, তরবার এবং রেলের গাড়ি হইয়াছে; আবার সেই লোহ আমাদের রক্তের ভিতর আছে। কিন্তু তাহা বলিয়া, ছুঁচের কাজ কাঁচিতে হয় না; অথবা কাঁচির কাজ রক্তে হয় না। অতএব অবৈতনবাদে একাকার ভাবা যায়, কিন্তু দায়। পরন্তু যদি তাঁহার দয়া হয়, তাহা হইলে প্রবল গ্রীষ্মেও শীতের উদয় হয়—এত শীত যে ছুথানা লেপ মুড়ি দিতে হয়। তখন রক্তের দ্বারা ছুঁচের কাজ হয়; কাঁচি দ্বারা কলম কাটা যায়।

তখন,—

একমেবাদ্বিতীয়ং ।

তখন,—

জন্মণী রমণী, রমণী জননী,

অথবা কে যে তুমি তা' নাহি চিনি।

তখন,—

সে বড় বিষম ঠাই—

গুরু-শিষ্যে দেখা নাই।

তখন,—

সবাই ভগ্নী, সবাই ভাই,

অথবা বা ভাব তাই তাই।

তখন,—

অহং মোহং,

অথবা স্বয়ং ।

শ্রীরাজকৃষ্ণ পাল ।

একটি সনেট ।

বড়ই কঠোর এই মাটির ধরতী ;
 ভেঙ্গে চূরে গেছে হিরা পেষণে তাহার !
 কোথা স্নেহ—কোমলতা—সুখা সজীবনী,
 কোলে তুলে লও গুরু মাথাটি আমার !
 কি মরণ বিভীষিকা—অঁধার জগৎ ;
 একাকী পথিক আমি জীবন-প্রান্তরে !
 কোথায় কিরণ তুমি, দেখাও সে পথ,
 ঘুরিতে পারি না আর নিরাশ অন্তরে ।
 শোক-তাপ-হুঃখে প্রাণ অবসন্ন ক্ষীণ ;
 জীবনে বিশ্বাস নাই, হৃদয়ে সে বল ;
 আশারো সে ক্ষীণ রশ্মি সন্নেহে মলিন,
 তাও শেষে ধুয়ে লবে নয়নের জল !
 অনেক সহেছি আর সহেনা এ প্রাণে ;
 কোথা' তুমি নারায়ণ রাখ প্রেমদানে ।

শ্রীচাক্রক্স বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মহারাণা প্রতাপসিংহ ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

কালচক্রের আবর্তনে প্রতাপ সিংহ ক্রমশঃ বার্কিক্যে উপনীত
 হইলেন । আমাদের ভাগ্যদোষে সেই বার্কিক্য আবার অকালে উপনীত
 হয় ; ইহার কারণ এই যে, দুঃসহ চিন্তাসপর্ণের বিষম দংশন, অনন্ত মানসিক
 ক্লেশ ও সাংসারিক ব্যগ্রণারশির কঠোরতম প্রহার । দিনের পর দিন
 অনন্ত কালমাগরে মিশিয়া গেল, প্রতাপের স্বর্গারোহণের দিনও ততই
 নিকটবর্তী হইতেছে কিন্তু চিতোরোদ্ধারের আশা তিনি ত্যাগ করিতে
 পারিলেন না । প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তম চিতোরনগরী যবন-কর-কবলিত ।

ইহা কি বীর হ্রদয় প্রতাপ সহ্য করিতে পারেন ? মহারাজা প্রতাপসিংহ এসময় সলিলা পেশালা সরোবরের তটোপরি কতকগুলি কুটার নির্মাণ করিয়া, তথায় শীত গ্রীষ্মকাল প্রভৃতির উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিতেন । মহারাজার ভাগ্য সুপ্রসন্ন, তথাপি কেন তিনি পর্ণকুটারে বাস করিতেন ! ইহার কারণ এই যে, যেহেতু তিনি চিতোর নগরীর উদ্ধার সাধন করিতে সক্ষম হন নাই, তজ্জন্তই আজ প্রতিজ্ঞা পূর্বক তিনি পর্ণকুটারশায়ী সাধু সন্ন্যাসীর স্তায় অবস্থান করিতেছেন । মিবারের চির-রাজধানী চিতোরনগরীর হীনাবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার চিত্ত বিগলিত হইয়া বাইত, তাই আজ তিনি ভোগবিলাস পরিত্যাগ পূর্বক এইরূপ ভাবে কালহরণ করিতেছেন । পাঠক ! সমগ্র জগতের ইতিহাস তন্ন তন্ন করিয়া দেখ দেখি, কোথাও এরূপ স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসীর অত্র একটা দৃষ্টান্ত পাও কি না ?

বীরেন্দ্র কুলকেশরী প্রতাপ সিংহ আজ ঐহিক জীবনের চরম সীমার উপনীত, তাঁহার পুত্র অমরসিংহও সুখ দুঃখের চিরসহায়, পরম বিশ্বস্ত ভীলগণ ও ক্ষত্রিয়বংশীয় সর্দারগণ তাঁহার শয্যাপার্শ্বে উপবেশন করিয়া তাঁহাকে সান্ধনা করিতেছেন । প্রতাপ এই শেষ মুহূর্ত্তেও স্বীয় স্বদেশে প্রেমিকতা ও প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত হওয়া দূরে থাকুক, স্বপ্নেও তাহা দেখেন নাই । প্রতাপ মিবারের পূর্ব স্বাধীনতা ও প্রবল গৌরব উদ্ধার করিতে সম্পূর্ণ সক্ষম হইলেন না বলিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন । তাঁহার পুত্র ও সর্দারগণ পাছে তাঁহার মৃত্যুর পর যবনের অধীনতা স্বীকার করেন, তজ্জন্ত তিনি শেষ মুহূর্ত্তেও সবিশেষ উদ্বিগ্ন ছিলেন । পরে তাঁহার পুত্র অমরসিংহ ও সর্দারগণ প্রতিজ্ঞা করেন যে, “যত দিন না মিবার ভূমির স্বাধীনতা পূর্ণ মাত্রায় উদ্ধার হয়, ততদিন আমরা কুটারেই বাস করিব ও আপনার স্তায় চিরদিনই যবনের শত্রুতা চরণ করিব।” এই কথাগুলি বীর হ্রদয় প্রতাপের কর্ণকুহরে প্রবেশ করিলে তিনি সহাস্তবদনে, নিশ্চিন্তমনে ও প্রশান্তভাবে অমরধামে যাত্রা করিলেন । জনৈক স্বাধীনচেতা ইংরাজীভাবাপন্ন দেশীয় কবি তাঁহার এই প্রতিজ্ঞাসম্বন্ধে এইরূপ বলিতেছেন,—

প্রতাপ বলিলেন,—

“Now swear, my boy, upon thy sword,
Thy country to defend,
And swear that ne’er in homage mean,
Thy royal knees shall bend.
“Eternal conflict thou must wage—
Such as thy sire begun—
To crush the haughty Moslem power,
Or be thyself undone.
Then will my soul sleep sound in peace,
This troubled spirit rest.—”

প্রতাপের সমতুল্য বীর মানবেতিহাসে অতীব বিরল। প্রবল পরাক্রান্ত দুঃস্থ মোগল সেনাগণের সহিত একাদিক্রমে পঞ্চবিংশতি বৎসব যুদ্ধ করিয়া যে শুভ্র যশোবাশি লাভ করিয়া গিয়াছেন, তাহা চিরদিনই ভারতেতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। বীর ত অনেক আছেন, কিন্তু প্রতাপের স্থায় বীর কয়জন? কে এই অল্পমাত্র সৈন্য সমভিব্যাহারে ভীমবিক্রান্ত বিপুল সহায় সম্পন্ন সুবিশাল রাজ্যধিকারী বৈরীকে বিরুদ্ধাচরণ করিতে সক্ষম হইয়াছেন? যে দুর্দিনে ভারতের ভাগ্য গগন হইতে প্রতাপকে উজ্জ্বলতম নক্ষত্র কক্ষচ্যুত হইয়া কালগ্রাসে পতিত হয়, সে দিনেব বিষয় শ্রবণ করিলে আজ পরাবীন হিন্দুজাতির হৃদয় শতধা বিদীর্ণ হইয়া যায়। তিনি যে অসাধারণ বীরের প্রভাবে দিল্লীখণ্ড আকবরের সহিত প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীতা ক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি স্বদেশ প্রেমিক সন্ন্যাসীগণের উচ্চতম আসনে স্থান পাইয়াছেন। “প্রতাপ নরকূলে দেবতা।” তিনি মাতৃভূমিকে দুর্ভিক্ষে ক্রেশ হইতে উদ্ধার করিবার নিমিত্ত এ মহীমণ্ডলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এরূপ অসাধারণ ক্রেশ, অসীম যন্ত্রণা কি কখন মানবে সহ করিতে পারে? প্রতাপ আজীবনকাল অনন্ত ক্রেশ সহ করিয়াও যে যবনের অধীনতা স্বীকার রূপ পাপময়ী চিন্তাকে

যে মানস-মন্দিরে স্থান দেন নাই, বরং অস্বাভাবিকের সহিত সমরানল প্রজ্জ্বলিত রাধিয়া নিজেকে সার্থক বোধ করিতেন। তাঁহার হৃদিশা বতই ঘনীভূত হইয়াছিল, তিনি ততই উৎসাহিত হইয়া যবনের শত্রুতা-চরণ করিয়া গিয়াছেন। বিপক্ষকে শত সহস্রগুণে সহায় সম্পন্ন জানিয়া, যে বীর কিছুমাত্র ভীত হইতেন না, তিনি কি মানব? ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত যখন মোগলের অধীন, তখন তিনিই কেবল সম্রাটের বিরুদ্ধে অসিধারণ করিয়া অবিচলিত সাহস, অমাহুষিক স্বদেশ-প্রেমিকতা, অসাধারণ বীরত্ব ও অলৌকিক স্বাধীনতা-প্রিয়তার পরিচয় দিয়া, হিন্দুজাতির মুখোজ্জল করিয়া গিয়াছেন। প্রতাপসিংহের কীর্ত্তিস্তম্ভ অত্রংলিহ হিমাদ্রি অপেক্ষাও উন্নত, ধবলাগিরি অপেক্ষাও শুভ্রবর্ণ। যতদিন জগতে ইতিহাসের সম্মান থাকিবে, যতদিন একজন মাত্র ব্যক্তি আগ্রহ-সঙ্কলনের মানবকীর্ত্তির অতীত সাক্ষী ইতিহাস অধ্যয়ন করিবে, ততদিন প্রতাপসিংহের নাম কেহ কখনও ভুলিবে না। ভারতকে যখন অমানিশা রজনী আচ্ছন্ন করিয়াছিল, তখন তিনিই স্বীয় অভূত ক্ষমতাবলে পূর্ণিমার শুভালোক ভারতে বিস্তার করিয়া জগতের সম্মুখে হিন্দুজাতির মুখ উজ্জল করিয়া গিয়াছেন। যতদিন হিন্দুজাতির একজন মাত্র ব্যক্তি জীবিত থাকিবেন, যতক্ষণ তাঁহার ধমনীতে একবিন্দু শোণিত থাকিবে, ততক্ষণ তিনি প্রতাপকে স্বীয় মানস-মন্দিরে প্রতিষ্ঠা করিয়া শ্রদ্ধার পুষ্পাঞ্জলি দিতে কখনই ত্রুটি করিবেন না। সমগ্র জগতকে জিজ্ঞাসা কব—কে বিশাল রাজ্যের অধীশ্বর হইয়াও স্বদেশোদ্ধারার্থ একরূপ প্রচণ্ড প্রতিদ্বন্দ্বীতা-কৈত্রে অবতীর্ণ হইয়াছেন?—কে সুখা-ধবলিত সুখসেব্য অট্টালিকা পরিত্যাগ করিয়া বনে বনে, পর্বতে পর্বতে, কন্দরে কন্দরে নিঃস্বল সন্ন্যাসীর ভাষ্য ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর ভ্রমণ করিয়াছেন? কে স্বদেশের স্বাধীনতা-উদ্ধারে কতকটা কৃতকার্য হইয়াও সামান্ত ব্যক্তির ভায় পশুভূতীরে বাস করিয়া শীত বর্ষাদি ঋতু হইতে আশ্রয়ার্থ প্রয়াস পাইয়াছেন?—কে হৃৎফেননিত সুকোমল শয্যা ও রাজভোগ পরিত্যাগ করিয়া স্বদেশের স্বাধীনতার নিমিত্ত কন্দমূল ফলে ক্রিয়বায়ণ

ও তৃণশয্যায় শয়ন করিয়া আত্মোৎসর্গের চরন দৃষ্টান্ত দেখাইয়া গিয়াছেন?—কে শান্তির স্বকোমল ক্রোড় সেছাপূর্বক পরিত্যাগ করিয়া ক্রমাগত পঞ্চবিংশতি বৎসর শত্রুগণ-কর্তৃক নির্দয়ভাবে লাঞ্চিত ও উৎপীড়িত হইয়াছেন? ইহার একমাত্র উত্তর—বীরেন্দ্র চূড়ামণি সংগ্রাম-পৌত্র প্রাতঃস্মরণীয় প্রতাপসিংহ ।

মহাত্মা টড্ এইরূপ লিখিতেছেন ;—

“Had Mewar possessed her Thucydides or her Xenophon, neither the wars of the Peloponnesus nor the retreat of the “ten thousand” would have yielded more diversified incidents for the historic muse, than the deeds of this brilliant reign amid the many vicissitudes of Mewar.

* * * There is not a pass in the Alpine Arvali that is not sanctified by some deed of Protap,—some brilliant victory, or oftener, more glorious defeat. Huldighat is the Thermopylae of Mewar; the field of Dewir her Marathon”

শ্রী প্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

ঐশী-শাসন ও শান্তি ।

স্বশৃঙ্খলা সংস্থাপনার্থ—শাসনবিধি—প্রয়োজনীয়, আর সেই সকল বিধি সম্যক পরিচালনায় প্রভু-শক্তির প্রয়োজন । এই শাসনবিধি আমাদের অন্তরে, বাহিরে, দেশে, সমাজে সর্বত্রই বর্তমান রহিয়াছে । কীটানুকীট হইতে অনন্তকোটি বিশ্বব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত এই নিয়মে নিয়ন্ত্রিত । এই বিধি প্রকৃতিব প্রত্যেক অঙ্গে কার্য্য করিতেছে বলিয়াই জগতের ক্রিয়া আবহমানকাল সূচাক্রমে চলিয়া আসিতেছে ।

এই বিশ্বরাজ্যের এই সমস্ত বিধি-ব্যবস্থার পরিচালনে যে প্রভুশক্তি প্রযুক্ত্য হইতেছে, সেই শক্তিই পরমা শক্তি, আর সেই প্রভুই মহাপ্রভু। মহাপ্রভুর মহতীশক্তি প্রতিনিয়ত এই নিখিল বিশ্ব-শাসনে নিযুক্ত। সেই রাজার রাজা সেই প্রভুর প্রভু দুই-দমন শিষ্ট-পালনাদি রাজধর্মে এই স্তমহান বিশ্বরাজ্য শাসন করিতেছেন। তাহার বিচারের আর আপীল নাই, তাঁহার বিচারালয়ে উকীল কাউন্সিলের সমাগম নাই, তাঁহার বিচার-মন্দিরে আইনের কূটতর্ক স্থান পায় না; সেখানে সেই ধর্মরাজের ধর্মাদিকরণে নিয়ত সত্য ও ত্রায়ের ধারায় বিচার এবং শাস্তি হইতেছে। ত্রিভুবন তাঁহার বিচারে নতশির, তৎপ্রদত্ত শাস্তি মন্তকে ধারণ করিয়া কর্মকলাহুসাবে ফলভোগ করিতেছে।

পাপী আমরা, সেই ধর্মরাজকে চক্ষে প্রতাক্ষ করিতে না পারিলেও তদীয় বিচারব্যবস্থা ও শাসন শাস্তি প্রতিনিয়তই প্রতাক্ষ করিতেছি, আর শাস্ত্রগ্রন্থ অতীতের সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। পাপীর পাপাচরণের শাস্তি দিতে, ভুভার হরণ করিতে, ধর্মের জয় ঘোষণা করিতে, ত্রায়ের মর্যাদা রক্ষা করিতে সেই চক্রধব কত চক্রান্ত অবলম্বন করিয়াছেন, মহাভারত—রামায়ণ—পুরাণাদি তাহার সাক্ষ্যপ্রদান করিতেছে। যখনই ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয়, যখনই পাপের ভরা পরিপূর্ণ হয়, তখনই তিনি একবারে স্বয়ং সারে জামিনে তাঁহার এই বিশ্বরাজ্যে অবতীর্ণ হইয়া স্বীয় দোষিও প্রতাপে শাস্তি স্থাপন করিয়া থাকেন।

আমরা অবোধ—আমরা যাহাকে হুঃখ, শোক, পরিভাপ, ব্যসন ইত্যাদি মনে করিয়া স্ত্রীয়মান হই, তাহা তাঁহার শাসন বই আর কিছুই নহে, আমাদের স্বকৃত অপরাধের ফলভোগ বই আর কিছুই নহে। অবোধ অজ্ঞান বালক হিতৈষী পিতার শাস্তিতে বিরক্ত হয়, অলস অমনোযোগী ছাত্র জ্ঞানদাতা শিক্ষাগুরুর শাসনে দোষারোপ করে, আর জ্ঞানান্ধ মোহান্ধ আমরা সেই পরম কারুণিক পরম পিতার, সেই অনিষ্টা বিনাশক বিদ্যাদাতার শাস্তিতে কতই হুঃখিত হই, কতই দোষারোপ করি।

শ্রেমময় পরমপিতার শ্রেম-নিকেতনে এই বিশাল বিশ্বরাজ্য —

বাহাতে তাঁহার প্রজাবর্গ সর্বদা আনন্দে কালতিপাত করিতে পারে, সেই ইচ্ছায় তিনি কত মঙ্গলকর, অশেষ হিতকর বিধি-ব্যবস্থাব প্রণয়ন করিয়া রাখিয়াছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই বিশাল-বিশ্বের যে দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দিকেই তদীয় প্রেমের অনন্ত প্রস্রবন প্রত্যক্ষ করিতে পাবিবে।

তবেই আমাদের এত বাতনা, এত কষ্ট, এত ক্লেশভোগের কারণ— আমাদের দুষ্কিরী, আমাদের অবাধ্যতা, আর আমাদের স্বৈচ্ছাচাষিতা। আমরা বিজ্ঞান পবিত্রের অবিজ্ঞা অর্জন করিয়া তবজ্ঞানশূন্য বিজ্ঞানের জ্ঞানে অন্ধ হইয়া তদীয় অশেষ মঙ্গলকর বিধি-ব্যবস্থাব অবমাননা করিতে গিয়াই, তাঁহার আজ্ঞা লঙ্ঘন করিতে গিয়াই আমরা শাস্তিভোগ করি, আর জ্ঞানের গর্বে মত্ত হইয়া নানাবিধ কৃত্রিম উপায়ে সেই অমোঘ ঐশ্বরিক শাস্তি ব্যর্থ করিতে চেষ্টা পাই, ভাবি না, আমাদের সে চেষ্টা পঙ্গুর গিবি-লজ্জনের চেষ্টা অপেক্ষাও হাস্যজনক, বামনের চাঁদ ধরিবাব চেষ্টা অপেক্ষাও বৃথা।

সেই ধর্ম্বরাজ আমাদের পাপাচরণের শাস্তি বিধানার্থ সচচাচব ত্রিবিধ উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। এই ত্রিবিধ উপায়কে আমরা ত্রিবিধ হুঃখ বা “ত্রিতাপ” বলি।

আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক এই ত্রিতাপ বা ত্রিবিধ হুঃখ দ্বারা সেই পবন কাকণিক ধর্ম্বরাজ তাঁহার প্রজাবর্গের শাস্তি ও শিক্ষাবিধান করিতেছেন। আমাদের মানসিক বিকার ও তদোৎপন্ন শারীরিক বিকারাদি (যাহাকে আমরা রোগ বলি) প্রথমোক্ত শ্রেণীর অন্তর্গত, চোর-তস্কবাদের অত্যাচাবজনিত হুঃখই আধিভৌতিক আর অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ইত্যাদি প্রাকৃতিক ব্যাপারের বিভ্রাট নিমিত্ত দুর্ভিক্ষাদি হুঃখই, আধিদৈবিক। কাল মাহাত্ম্যো, যুগ ধর্ম্মে আমাদের পাপাচরণ যতই বর্দ্ধিত হইতেছে, সেই সুবিচারক ততই আমাদের দমন করিবার জন্য এই ত্রিবিধ শাস্তি উপযুক্তপরি ব্যবহার করিতেছেন। আমরা মোহে আজ্ঞর হইয়া, শিক্ষার গর্বে উন্মত্ত হইয়া, বোগের নিদান নিরাকরণ করিতে না পারিয়া নানাবিধ কালনিক

ঔষধের প্রয়োগ করিতেছি। বর্তমানে ছুর্ভিক্ষের করাল কবল অব-
লোকনে আমরা প্রায়শই ভীত, কম্পিত ও জঞ্জরিত হইতেছি; মহামা-
মার মার শব্দে প্রায়ই আমাদেরকে আক্রমণ করিতে আসিতেছে।
দিন দিন নূতন নূতন পীড়া আমাদের সর্বনাশের নিমিত্তই বৃষ্টি জন্ম-
গ্রহণ করিতেছে। আজ এই ভয়ঙ্কর মারিভয়, কাল ভয়ানক ছুর্ভিক্ষ,
একথা ত আমরা প্রায়ই শুনিতে পাইতেছি। এ দ্রাস, এ ভীতি,
ঐশী-শাস্তি ভিন্ন আর কি বলিতে পারি ?

আমাদের পূর্বপুরুষগণের শারীরিক ও মানসিক সুখ-শান্তির সহিত
আমাদের বর্তমান অবস্থা তুলনা করিলেই ব্যক্তিমাত্রেরই এতদুভয়ের
বিস্তব পার্থক্য দেখিতে পাইবেন। বল দেখি—৫১৭ টাকা মাসিক
বেতনের উপর নির্ভর করিয়া তোমার বৃদ্ধ প্রপিতামহঠাকুর দোল
ভগ্নোৎসবাদি কবিতা, পুঁজ পোঁজ, দোহিত্র, দোহিত্রী প্রভৃতি আত্মীয়
স্বজনে পরিবেষ্টিত হইয়া যে সুখ শান্তিতে সুদীর্ঘজীবন অতিবাহিত
করিয়া স্বর্গাবোহণ করিয়াছেন, আজ মোটা বেতনের চাকরী কবিতাও
সেই সুখ-শান্তি, সেই দীর্ঘজীবন তোমার নিকট স্বপ্নবৎ প্রতীয়মান
হইতেছে কি না ? তাঁহাদের আয় ব্যয়, তাঁহাদের চিকিৎসকের খরচ
ও তাঁহাদের পারিবারিক সুখ-স্বচ্ছন্দতাব সহিত তোমাদের তত্তৎ
বিষয়ে তুলনা করিয়া ভাব দেখি, আমাদের এত অধোগতি, এত
যন্ত্রণা কেন হইতেছে ? এ বিষয়ে আমাদের—পাপাচার কি একমাত্র
কারণ নহে ?

আমাদের অন্তরে যত অধিক সাম্প্রদায়িক ভাবের আবির্ভাব হইবে,
পাপ-প্রবৃত্তি ততই তিরোহিত হইতে থাকিবে। এই সাম্প্রদায়িকভাবের
আবির্ভাব বা তিরোভাব আমাদের আচার ব্যবহার ও আহার বিহারাদির
উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করে। এই জন্তই বহুদর্শী, ত্রিকালজ্ঞ বুধগণ
আমাদের সাম্প্রদায়িক রক্ষা করিবাব জন্ত আচার ব্যবহার, আহার
বিহারাদি বিষয়ে কতকগুলি হিতকর নিয়ম প্রণয়ন করিয়া দিয়াছেন।
তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন যে, সেই সকল নিয়ম পরিপালনে মানবের
অন্তরে সাম্প্রদায়িকতা প্রাহুর্ভাব হইয়া, সাম্প্রদায়িক ভাবকে নষ্ট করিয়া

কেলিবে এবং সাঙ্ঘিকভাবে আধিক্য অন্তরে ধর্মবলেরও আধিক্য
ঘটিবে এবং ধর্মবলাধিক্যে আত্মার উন্নতি, সূতরাং শারীরিক উন্নতিও
সংসাধিত হইবে, কিন্তু আমরা সে পথে না গিয়া—কেবল শরীর লইয়া
ব্যস্ত হইয়াই, নিষিদ্ধ আচারের প্রেতশয় দিয়া দিন দিন পাপের পথে
অগ্রসর হইতেছি। পাপাচাব আমাদের অন্তর কলুষিত করিতেছে,
সুতরাং আমাদের দেহও অন্তঃসার শূন্য হইয়া যাইতেছে। তাই আজ
আমরা ঐশী-শাসনে এত জর্জরিত, ত্রিতাপে নিষত সন্তপ্ত হইতেছি।

ধর্মই আত্মার বল, শুদ্ধাচারই আত্মার একমাত্র পরিপোষক,
আত্মার উন্নতিতেই মানসিক উন্নতি, আর মানসিক উন্নতিতেই শারীরিক
উন্নতি। এইরূপ ক্রমাবলম্বনে শারীরিক উন্নতিবিধান না করিতে
পারিলে, কখনই আমাদের উন্নতিবিধান হইবে না; সুতরাং কখনই
আমরা এই ত্রিবিধ তাপেব হস্ত হইতে অব্যাহতি পাইব না।
ধর্মবলই এই ত্রিবিধ হুঃখনাশক। ধর্মবলেব নিকট সকল হুঃখই
নতশির।

অতএব আমাদের এই সকল কষ্ট, হুঃখ ও বিপদাদি আমাদের
আত্মাপরাধবৃক্ষেব ফল বই আর কিছুই নহে, তাই নীতিশাস্ত্র বিশাবদ
বলিবা গিয়াছেন—

“বোগ, শোক, পবিতাপ, বন্ধন বাসনানি চ।

আত্মাপরাধ বৃক্ষানাম্ ফলঘোতানি দেহিনাম্ ॥

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

প্রতাপ।

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

যাইয়া দেখিলাম, সুবো বস্ত্রতই আত্মহত্যা করিয়াছে। একখানি সুকোমল দুগ্ধফেননিভ শয্যায সুকুমার দেহলতাপানি স্থাপিত রহিয়াছে। আব সেই শয্যা প্লাবিত করিয়া, বক্ষঃস্থল প্লাবিত ববিয়া কধিব-ধাবা ছুটিতেছে। চক্ষু দুইটা ধীবে মুদ্রিত হইয়া আসিতেছে। আব সেই মুদ্রিত চক্ষুকোলে বুকি দু-একটা অশ্রুকণা শুকাইতেছে, অন্তনোদ্যুত সৌন্দর্য্যরাশি বলকে বলকে উছলিয়া পড়িতেছে। সুরো তখনো বিবাহের পটুসাড়ী পরিয়া।

পার্শ্বে নবীনবাবু বসিয়া মর্য়ভেদী আর্তনাদ কবিতেছেন। মাটিতে তাঁহাব জ্বী ধূলিবিলুঙিতা হইয়া চীৎকার করিতেছেন। দোহার আর্তনাদে ঘর ফাটিতেছে। দিগ্ দিগন্তর কাঁপিয়া উঠিতেছে। অদূবে দাস-দাসীবা বসিয়া নীববে অশ্রু বিসর্জন কবিতেছে। আব সেই হতভাগা বব—জগদীশ নীরব নীম্পন্দ ভীতব হ্রায়, চকিত বিস্মিতেল হ্রায় স্তম্ভীত হইয়া, দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া আকুল নেত্রে চাহিতেছে।

সে হৃদয়-বিদারক দৃশ্য দেখিতে কিছুতেই আমি সমর্থ হইলাম না। আমার হৃদয় শতধা-চূর্ণ হইয়া গেল। আমি উচ্চৈশ্ববে ক্রন্দন করিয়া উঠিলাম। যে কুসুমলতাটি আমি বাল্যকাল হইতে সহস্বে বদ্ধিত করিয়াছি, আজ সেই লতাটিকে এ হেন অবস্থায় দলিত দেখিয়া, আমার এক প্রাণ শত প্রাণ হইয়া ফাটিয়া বাহির হইতে লাগিল। আমার স্নেহের একমাত্র অবলম্বন, সেই সুরো আজ রক্তাক্ত কলেবরা; কেশ পাশ দিয়া আজ রক্ত ধরিতেছে, অফুট চম্পক কলির হ্রায় অঙ্গুলীমালায় রক্তস্রোত শুকাইতেছে, দ্রুমচ্যুত বল্লবীর হ্রায় দেহ-লতাপানি ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। আমি আর দেখিতে পারিলাম না; দ্রুতপদে পার্শ্বস্থ কুটীরে যাইয়া শুইয়া পড়িয়া উচ্চৈশ্বরে কাঁদিতে লাগিলাম। এইরূপ

অবস্থায় কতক্ষণ ছিলাম, বলিতে পারি না ; কিছুকাল পরে একজন চাকর আসিয়া আমাকে ডাকিল,—“প্রতাপ বাবু !” আমি চমকিয়া চাছিলাম । সে বলিল, “বাবু আপনাকে ডাক্‌ছেন ।” সে আসিয়া আমার হাত ধরিয়া উঠাইল, আমি চলিলাম ।

* * * * *

নবীন বাবু বলিলেন, “প্রতাপ ! সুবো অঙ্গহত্যা করিল কেন ?”

আমি । কিছুই ত বুঝিতে পারিতেছি না—কিন্তু—

নবীন বাবু । কিন্তু কি প্রতাপ ?

আমি । বিবাহের কিছু পূর্বে সে আমাকে ডাকিয়াছিল ; ডাকিয়া বলিল যে, তোমার সঙ্গে হয়ত আমার আর দেখা হইবে না—আমার এই কোটাটী তুমি উপহার গ্রহণ কর ; আমার অনুরোধে ইহা কল্য খুলিও । আমি আর বলিতে পারিলাম না, আমার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল ।

নবীন বাবু ক্ষতস্ববে দ্বিবকর্থে বলিলেন, “তাব পর ।”

আমি । তাব পর আর কিছুই জানি না, সে ক্ষতপদবিক্ষেপে চলিয়া গেল । আমি বহিবাটীতে দিরিয়া আসিলাম । সে কোটা সেই রকমই পড়িয়া বহিয়াছে । আমি তাহা এখনও খুলি নাই ।

নবীন বাবু দার্শনিক্য পরিত্যাগ করিলেন । ধীব অথচ কম্পিতস্বরে বলিতে লাগিলেন, “কোটার কথা আমার আগে বল নাই কেন ? সকলই আমার দ্রবদৃষ্ট, প্রতাপ ! কোটাটা শীঘ্র আমার কাছে লইয়া আইস ।” আমি কোটা আনিতে চলিয়া গেলাম । নবীন বাবু পাগলের ভাষ বলিতে লাগিলেন,—“মহাত্মা আর্য্যস্বামিগণ ! তোমাদের বাল্য-বিবাহের ব্যবস্থা আমি তুচ্ছ করিতাম, আজ তাহার ফল হাতে হাতে পাইলাম । হিন্দুরমণী মনকেই সকল বিষয়ের সাক্ষ্য মনে করে ; পাষাণের হাত হইতে কেমন করিয়া নিজের অমূল্য সত্যস্বরূপ রক্ষা করিতে হয়, তাহা জানে । টাকা কড়ি, ধন দৌলত অতি তুচ্ছ মনে করিতে জানে ; পার্থিব জিনিষে অতিমাত্র বীতস্পৃহ হইতে জানে । হায় হায় ! আমি এতটা ~~এতদিন~~ বসিতে পারি নাই কেন ? তাহা

হইলে বুঝি আজ আমার প্রাণের সুরো এমন করিয়া মরিত না। হায়! আমি যদি অষ্টম বর্ষে ইহাকে বিবাহ দিতাম, তাহা হইলে বুঝি এমন করিয়া আজ আমায় কাঁদাইত না। হায়! অদূরদর্শী ক্রীণদৃষ্টি, পাপিষ্ঠ আমি, আৰ্য্যাবিদিগকে কর্তব্যজ্ঞানশূন্য মনে করিতাম। জানিতাম না। হিন্দু-গৃহে লজ্জাশীলা রমণীব যুবতী-বিবাহ কীদৃশী ভয়াবহ। হায় প্রতাপ! তুমি দবদে হইলে কেন?”

আমি কোঁটা লইয়া আসিলাম। নবীন বাবু শেখ কথটা আমার কর্ণকূহরে প্রবেশ করিল। আমি চমকিয়া উঠিলাম। দেখিলাম, নবীন বাবু চক্ষু শুষ্ক, মুখমণ্ডল গভীর। কোঁটাটা তাহাব সম্মুখে রাখিলাম। তিনি বলিলেন, “খোলা।”

কোঁটাটা খোলা হইল। দেখিলাম তাহার মধ্যে খানচাবেক স্বর্ণলঙ্কাব। নবীন বাবু অলঙ্কাবগুলি উঠাইলেন; উলটাইয়া পালটাইয়া তিনচারিবার দেখিলেন; বলিলেন, “এইগুলি সুরো বড় ভালবাসিত।” গহনাগুলি উঠান হইলে তন্নিম্নে একখানি সুদীর্ঘ পত্রিকা দেখিলাম। নবীন বাবু জিজ্ঞাসা কবিলেন, “ওখানা কি?” আমি বলিলাম, “এক খানা পত্র।” নবীন বাবু বলিলেন, “পড়।” আমি পড়িতে লাগিলাম।

অষ্টম পরিচ্ছেদ।

“প্রতাপ! যদি বিবাহ শুধু বহ্বিক আড়ম্বর না হয়, যদি নিতান্ত একটা লোকাচার নৃত্য-গীত-বাণ্য বিশেষেব অঙ্গ না হয়, তবে প্রতাপ! বলিতে লজ্জা কি—কি জগুই বা আর লজ্জা কবিব—আমার বিবাহ হইয়াছে। আমার মনের মতন হৃদয়ের স্রামী আমি পাইয়াছিলাম, আমি হতভাগিনী, তাই ভোগ কবিতো পাইলাম না। তাহাকে যদি না পাইলাম, তবে এ ছার জীবন কিসের জন্য? য হৃদয় একবার তাহার চবণশ্রান্তে উৎসর্গ করিয়াছি, কোন প্রাণে তাহার প্রতি বিশ্বাস-ঘাতিনী হইয়া অপরের প্রতি তাহা সমর্পণ কবিব। সাবিত্রী বলিয়াছেন, “কর্ণের নাক্ষী মন।” আমি রমণী, আমিও সাবিত্রীর মত মুক্তকণ্ঠে

বলিতে জানি, “কর্ণের সাক্ষী মন।” বাহ্যিক লোকাচার আমি মানি না। তবে আমি অসহায়, কিন্তু আমারও শক্তি আছে, মনে রাখিও, আমি শক্তিশালী।

“প্রতাপ! আজ আমার লজ্জা নাই, বলিতে ভয় নাই, আজ আমি জগতের সমক্ষে, নিলজ্জা, নির্ভয়া; কারণ আমি আর জগতের সহিত, তোমার সহিত কথা কহিতে পাইব না। এ জগতে তুমি বই আর কেহ আমার স্বামী হইতে পারিবে না। কিন্তু তোমাকে ত পাইলাম না! এখন তোমায় পাইলাম না, তখন আমার মৃত্যুই শ্রেয়, আমি রমণীকূলে কলঙ্কিনী হইয়া জীবন ধারণ করিতে চাহি না। পবিত্রা সাবিত্রীর কূলে কালিমা রোপন কবিতো চাহি না। প্রতাপ! তোমার জন্য আমি মবিলাম না; তুমি দুঃখিত হইও না। আমি মন্দভাগিনী। তাই আমার মরিতে হইল; তোমাব কি দোষ?

“প্রতাপ। প্রতাপ! ও প্রতাপ। আজ একবার প্রাণ ভরিয়া তোমায় ডাকিয়া লই। তোমাকে ত আব পাইব না, এই জন্মে তোমাকে ত আব পাইব না, তবে আমার লজ্জা কি? আজ এ সময়ে আব লজ্জা করিব না, একবার হৃদয় ভরিয়া তোমায় ডাকি। হৃদয়েশ। স্বামিন্। প্রভো! স্তবোর হৃদয়বল—আমি ডাকি, তুমি শুন।

“তুমি বড় দুঃখিত হইতে, তোমার কাছে যাইতাম না। কোন্ প্রাণে, কোন্ সাহসে তোমার কাছে যাইব? তুমি আমাকে প্রায়ই দিদি বলিয়া ডাকিতে—আমি তাহা সহ্য করিতে পারিতাম না—আমার হৃদয় তখন ফাটিয়া বাহির হইত। তাই তাড়াতাড়ি তোমার নিকট হইতে চলিয়া যাইতাম, কিন্তু তবুও তোমাকে বড় দেখিতে ইচ্ছা করিত, লুকাইয়া লুকাইয়া অনেক সময় চক্ষু ভরিয়া তোমাকে দেখিতাম, কিন্তু তোমাকে দেখিয়া আজও আমার সাধ মিটে নাই।

“তুমি দেবতা, তাই আমাকে ভগ্নির মত ভালবাসিতে, আমি মন্দভাগিনী, সে স্নেহের প্রতিদান করিতে পারি নাই। আমি আন্তে আন্তে উগ্র হলাহল পান করিয়াছি; এখন হৃদয় ভরিয়া উঠিয়াছে, তাই যাতনায় ছটফট করিয়া মরিতেছি। আমি দুর্বল হৃদয়কে

রা রাখিতে পারি নাই—সামান্য তৃণের ত্রায় প্রবল তরঙ্গ-
ভাসিয়া চলিয়াছি! জলন্ত বহ্নি দেখিয়া প্রফুল্লহৃদয়ে পতঙ্গের
খাপ দিয়াছি, তাই আজ মরিতেছি। প্রতাপ! তোমার কি
খাব! আমার জন্ত দুঃখিত হইও না।

“এ মন্দভাগিনী জন্মের মত তোমার নিকট বিদায় চাহিয়া
লিল। আমার মনে রাখিবে—তোমাকে দিব, এমন কিছুই নাই;
যে এই কথানা অলঙ্কার আমি বড় ভালবাসিতাম—ইহাই তোমাকে
দিয়া যাইতেছি। প্রতাপ! যখন তোমার বিবাহ হইবে, তোমার
দ্বীকে এই কথানা গহনা পরাইয়া আমাকে একবার মনে করিও—
ইহাই আমার শেষ অনুরোধ।

“পিতাকে আমার শান্ত করিও, বৃদ্ধের আর কেহই থাকিল না।
তাহার এই মন্দভাগিনী কন্যাকে জন্মেব মত ভুলিতে বলিও। পার্থিব
সুখভোগ আমাব কপালে ছিল না। পিতাকে যথাসম্ভব সাস্থনা
করিও। প্রতাপ! ভালবাসার যদি পুঙ্খানুপুঙ্খ থাকে, পরজন্মে কি তোমার
পাইব না? স্বামিন্ তোমাকে কি কখন সেবা করিতে পাইব না?
তোমার কি কখন হৃদয়ে ধাবণ করিয়া সুখী হইতে পারিব না? আমার
সময় কমিয়া আসিতেছে, আমি চলিলাম। ইতি—

মন্দভাগিনী সুরো

[ক্রনশঃ]

শ্রীমতী নলিনীবালা সেন।

সমালোচনা ।

শ্রীকৃষ্ণের কলঙ্ক কেন ?—প্রথম ভাগ, শ্রীকৃষ্ণের দেব-
নিয়োগী কর্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত ।

হিন্দুধর্মের বীণাগণ হিন্দুদের দেবতাগণের নামা প্রকার কুৎস
রটনা দ্বারা স্বল্পজ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তিগণের হৃদয়ে হিন্দুদেবতাবিশেষ
জন্মাইবার চেষ্টা করিতেছেন। নিয়োগী মহাশয় শ্রীকৃষ্ণের চরিত্রে
সেই কলঙ্ক অপনোদনার্থ বিশেষ পবিশ্রমের ও অনুসন্ধানের পরিত্র
প্রদান দ্বারা বর্তমান পুস্তকগণি প্রণয়ন করিয়া সমাজের মহৎ
উপকার সাধন করিয়াছেন ।

সরল গৃহ চিকিৎসা ।—রাণাঘাট, নদীয়া, অভ্যন্তরীণ
কেনিকেল ওয়ার্কন্স হইতে ডাঃ জে. সি. মুখার্জী কর্তৃক প্রকাশিত,
মূল্য ১০ টারি আনা মাত্র ।

“ডাঃ জে. সি. মুখার্জী” সহজে গৃহ চিকিৎসার জন্য এই পুস্তক-
খানির প্রণয়ন করিয়াছেন । উদ্দেশ্য ভাল । পুস্তক পাঠে কতকটা
সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে বলিয়া বোধ হয় । তবে এক্ষণে পুস্তক
যেমন হওয়া উচিত, তেমন হয় নাই । ভাষা ও মুদ্রণের প্রতি
একটু নজর করিলে ভাল হইত । মুষ্টিযোগগুলি পরীক্ষা করিয়া
দেখিলে মন্দ হয় না ।

চক্রচিস্তামণি ।—শ্রীযুক্ত ভূগাচরণ তর্করত্ন ভট্টাচার্য্য মহাশয়,
প্রণীত । শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্য্য এবং সুরেন্দ্র চন্দ্র বসাক কর্তৃক
প্রকাশিত । দ্বিতীয়বার মুদ্রিত । মূল্য ১০ আনা মাত্র ।

ষট্চক্র নিরূপণ ও তত্ত্বদক্রম ইহাতে পদ্যে লিখিত হইয়াছে ।
বিষয় যেমন গুরুতর, বুঝান তেমন বিঘ্ন হয় নাই । এ বিষয়ে
গাঙ্গা বিস্তৃত পুস্তক লিখিলেও সাধারণে তাহা বুঝিতে পারেন কি
হউক, পুস্তকের সহৃদয় জ্ঞান আমরা সন্মতি

বীণাপাণি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে । ভগবতি, ভাবতি, দেবি নমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড ।

ফাল্গুন, ১৩০৩ সাল ।

২য় সংখ্যা ।

প্রতাপ ।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর ।]

নবম পরিচ্ছেদ ।

বজ্রনী পোহাইল । কুঞ্জে কুঞ্জে বিহগ কুঁড়িল, হেলিয়া তুলিয়া
হয়তুল অমিল বহিল । কত ফুল ফুটিল, কত ফুল মুদিল । বজ্রনী পোহাইল,
বোজ যেমনি কবিষা নববন্ধে হেলিয়া তুলিয়া রাত পোহায়, আজ
তেমনি করিয়া পোহাইল । এ বিখে একটা হৃদয়,—নবীন বাবু মত
বিশাল একটা হৃদয় যে ভাসিয়া গেল, একটা পরিবার যে ছার খার
হইল, এত বিদ্যা, এত বুদ্ধি, এত লজ্জা যে, অনাদরে নষ্ট হইয়া গেল,
এ অভুলনীয় সৌন্দর্য্য, অপার কপবাশি, অভুলনীয় যৌবন যে দুমিনিটে
এমন কবিয়া ফুরাইয়া গেল, তবু রাত পোহাইল, তবু প্রকৃতির আনন্দ
তবুদের একটা তরঙ্গ কমিল না ।

বেলা হইল। অগত ব্যাপিরা স্বর্ষ্যের স্বর্ণ ছটা হানিল। পৃথিবী
কাজে ব্যস্ত হইল। আমাদের যে আজ সব কাজ কুরাইয়াছে; এত
আমোদ কোলাহল যে থামিয়া গিয়াছে, এত আদর যে অনাদর হইয়াছে,
এত আনন্দ যে নিরানন্দ হইয়াছে, এত সুখ যে দুঃখ হইয়াছে, সব
পৃথিবী কাজে ব্যস্ত। আকাশে বেলা উঠিল।

নবীন বাবু সহসা উন্মত্তবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। জলদ গম্ভীর স্বরে
চীৎকার করিয়া বলিলেন—“প্রতাপ।” আমি ভীত হইলাম, তাহার মুখের
দিকে ভয়ে ভয়ে চাহিলাম, নবীন বাবু বলিলেন “প্রতাপ এত বাজনা
কেন থামিয়াছে, উহাদের কেন আনিয়াছিলাম? সুরোর যে আজ
বাসী বিবাহ। বাজনা বাজাইতে বল।”

আমি আবণ্ড ভীত হইলাম। কিছুই বলিতে সাহস করিলাম না।
কিঞ্চকাল উন্মত্তবৎ বেড়াইতে বেড়াইতে নবীন বাবু আবার বলিলেন
“বাজনা বাজাইতে বল।” আমি চুপ কবিয়া দাঁড়াইয়া রহিলাম। বিস্ত
নবীন বাবু বড় ব্যস্ত হইলেন, বলিলেন—“তুমি কথা শুনিলে না, আমিই
বলিতেছি” নবীন বাবু বাহির বাটীতে চলিয়া গেলেন। আমিও পশ্চাৎ
পশ্চাৎ চলিলাম।

নবীন বাবু বাহির বাটীতে আসিয়া বাজনা ডাকাইয়া পাঠাইলেন,
খাজাঙ্কিকে তলব করিলেন। পুৰোহিত আসিতে বলিয়া পাঠাইলেন।
আমি ভিজ্ঞাসা করিলাম “কেন?” তিনি পূর্ববৎ গম্ভীর স্ববে উত্তর
করিলেন “কাজ আছে”—বলিয়াই চমকিয়া আমাব দিকে ফিরিলেন
জিলিলেন “তুমি এখানে কেন? সুরো একলা বহিয়াছে, তুমি সেখানে
যাও।” আমি উত্তর কবিত্তে সাহস করিলাম না, দাঁড়াইয়া বহিলাম।
দেখিয়া আবার বলিলেন, দেবি করিতেছ কেন, যাও শীঘ্র যাও। আমি
অন্তঃপুরে আসিলাম।

* * * * *

যখন আকাশে দ্বিপ্রহরের বেলা উঠিল, তখন শুনলাম, সুরোর
সাধের ফুলের বাগানে বড় বাজনা বাজিতেছে। আমি বড় ভীত
হইলাম, নবীন বাবুর ভাব আমার বড় ভাল বলিয়া বোধ হইয়া ছিল না।

বাক্যনা শুনিয়া আরোও ভীত হইলাম। সহসা একজন কর্মচারী আসিয়া বলিল “বাবু ডাকিতেছেন।” আমি জিজ্ঞাসা করিলাম “বাবু কোথায়?” কর্মচারী বলিল “দিদির বাগানে।” আমি আর দাঁড়াইলাম না। কর্মচারীকে শ্রবোর মৃত দেহের নিকট বসিতে বলিয়া, তাড়াতাড়ি চলিলাম। পা বাড়াইয়া দেখিলাম, নবীন বাবু আসিতেছেন। আমাকে দেখিয়া নবীন বাবু বলিয়া উঠিলেন “শ্রবো কৈ?” শ্রবোকে লইয়া চল, শীঘ্র এস, সময় যায়, বলিয়া নবীন বাবু আবার চলিয়া গেলেন। আমি কিছু বলিতে সাহস করিলাম না। শ্রবোর মৃতদেহ স্বন্ধে ফেলিয়া ধীরে ধীরে চলিলাম।

বাগানে গেলাম, দেখিলাম চন্দন কাঠের চিতা সাজান হইয়াছে। পাশে কলসে কলসে দ্রুত বহিয়াছে। শ্রুগন্ধি তৈল, তলুদ, সিন্দুর, আলতা, পটুসাড়ী, লাজ, চন্দন সব গোছান রাখিয়াছে। কলসে কলসে জল বহিয়াছে, পার্শ্বে পুবেদিত দাঁড়াইয়া।

নবীন বাবুর চোখে জল আসিল। আমার দিকে চাহিতে চাহিতে আমার স্বাক্ষর শ্রবোর মৃতদেহ দেখিতে দেখিতে নবীন বাবুর চোখে জল আসিল। মুছিতে মুছিতে নবীন বাবু বলিতে লাগিলেন, “প্রতাপ আমায় কমা কর, আমি তোমায় স্নেহ করিতাম, কিন্তু গরীব বলিয়া স্বপ্ন করিতাম। তোমায় বিত্তাব জন্ত, তোমার বিনয়ের জন্ত, পবিত্র স্বভাবের জন্ত, তোমায় স্নেহ করিতাম, ভূমি দবিজ, আমি অর্থ পিশাচ, তাই তোমায় স্বপ্ন করিতাম। সেই স্বপ্নাব ফলে, আমার শ্রবো আজ মবিয়াছে, আমার নীচ স্বভাবের জন্ত শ্রবো আজ মবিয়াছে। আমার পাপের প্রাণশক্তি করিবার জন্ত শ্রবো আজ মরিয়াছে। আমায় কমা কর।” বলিতে বলিতে নবীন বাবু আমার কাছে দৌড়াইয়া আসিলেন, আমি ফুকারিয়া কাঁদিয়া উঠিলাম।

আমায় শাস্ত কবিত্তে কবিত্তে নবীন বাবু বলিলেন—“আজ তোমার সহিত শ্রবোকে যদি একত্র করিতে পারিতাম, এমনি করিয়া তোমায় অন্ধে যদি শ্রবোকে সঁপিয়া দিতাম, তবে আজ আমার শ্রবো মরিত না। আমি পানিষ্ঠ, তাহা করি নাই, তাহার ইহলোকের পুণ্য আমি হরণ

করিতেছিলাম, তাই সে চলিয়া গিয়াছে। কিন্তু প্রতাপ! ইহ জগতে হিন্দু-বর্মণী স্বামীর পায়ে মাথা রাখিয়া, হাসিতে হাসিতে মবিতে চাষ। স্বামীর সম্মুখে যে চিতায় পুড়িতে পাবে, ইহ জগতে সে বড় সৌভাগ্যবতী। প্রতাপ, আজ সুরোব বিবাহ ।”

বাজনা ঘোর বোলে বাজিয়া উঠিল। সুরোব মৃতদেহ সুগন্ধি তৈল, হরিদ্রায় সিক্ত করিয়া স্নান কবান হইল। আলতা, চন্দন, সিন্দূর, পট্টবস্ত্রে ভূষিত করিয়া, চিতায় উঠান হইল। পুরোহিত বাসীবিবাহের মন্ত্র শব্দিল, লাজ বসিত হটল। চিতা জ্বলিল। আমরা সম্মুখে এতটা হইল, আমি কিছুই বলিতে পাবিলাম না।

*

*

*

রাত্রি দ্বিপ্রহর, আমি সে দিন ঘুমাই নাই। পৃথিবীতে আব কি আছে? বুক ভাঙ্গিয়া যে শতধা চূর্ণ হইয়া গিয়াছে। আর দ্বিপ্রহরের কাণ্ডে, নবীন বাবু সেই পাগলের মত কার্যাবলীতে আমি পাগল হইয়া পড়িয়াছি। সংসারে কি আর সুখ আছে? সংসারে কি আর শান্তি আছে? সুরোব মত হৃদয় কি আব এ সংসারে পাওয়া যায়? আমি ভাবিতে ভাবিতে বাটীর বাহিবে আসিলাম। কেহ দেখিতে খাইল না, কেহ ডাকিল না, আমি সংসার পবিত্যাপ করিলাম।

দশম পরিচ্ছেদ ।

কি আর বলিব? কথা ত কুরাইয়াছে; যে দিনেব কথা বলিয়াছি, তাব পল্ল আট বৎসর কাটিয়া গিয়াছে। এই আট বৎসরে কত ঘটনা ঘটিয়াছে তোমরা কেহ বিশ্বাস করিবে না। বিশেষ বলিলেও তোমরা পাগল বলিবে, তাই বলিতে চাহি না। বনে বনে, পাহাড়ে পাহাড়ে, পর্বতে পর্বতে, দেশে বিদেশে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে বেড়াইতে জীবনের এই আটটা বছর কাটিয়াছে। ইহার শেষে আমি আনামের পার্কভ্য প্রদেশে যাইয়া উপস্থিত হইয়াছিলাম।

এক দিন রজনীতে একটা গাছে কাপড় দিয়া, ডালের সহিত দেহ

বাঁধিয়া শুইয়াছিলাম। ভোর হয় হয়, এমন সময় দেখিলাম—এক জটাভূটধারী দিব্য জ্যোতির্গুণ সন্ন্যাসী মূর্তি, ধীর পাদবিক্ষেপে বৃক্ষের নিম্ন দিয়া যাইতেছেন। আমি দেহেব বন্ধন খুলিলাম। তাড়াতাড়ি নীচে আসিয়া পদতলে লুটাইয়া পড়িলাম, বলিলাম—“প্রভো! আমাকে রক্ষা কর, পাপের আগুনে দেহ পুড়িতেছে, আমায় দীক্ষা দাও।

সন্ন্যাসী আমার উঠাইলেন, মুহূর্ত্ত হাসিয়া বলিলেন,—“বৎস! হৃদয়ের অন্তরূপ হৃদয় না পাইয়া, সংসারের পদ চাপে ভীত হইয়া সন্ন্যাসী হইতে আসিয়াছে, সংসার হইতে ভয়ে পলাইয়া আসিয়াছে, তোমায় দীক্ষা দিব না। যাও বৎস! সংসারে কিবিষা যাও, তোমার সংসারের কাজ আজও কুরায় নাই, বিস্তর কর্তব্য তোমার পড়িয়া রহিয়াছে। ফিরিয়া যাও, বিবাহ করিও।”

আমি বলিলাম,—“বিবাহ করিব না ভাবিয়াছি, সংসারের মাকড়সা এড়াইতে চাই। কেন প্রভো! আবার সে শিকলি পরিতে বলিতেছেন?”

সন্ন্যাসী নখন ঈষৎ বিস্মিত কবিলেন, বলিলেন,—“পাপিষ্ঠ! তোমার মাতা আজও জীবিতা। দুঃখিনীর কত কষ্ট কি একবার ভাবিয়াছ?” আমি চমকিয়া উঠিলাম, হৃদয় চঞ্চল হইল। সন্ন্যাসী চলিয়া গেলেন। আমি বাটী ফিরিলাম।

৩০ বৎসর বয়সে বাটী আসিয়া সন্ন্যাসীর উপদেশ মত বিবাহ করিলাম। মাতা বড় সুখী হইলেন। নবীন বাবুর বাটী আর যাই নাই। তাহাদের কি হইয়াছে বলিতে পারি না।

সুখে আছি, কিন্তু আজও মাঝে মাঝে হৃদয় কাঁপিয়া উঠে। এ সংসার সংসার বলিয়া বোধ হয় না। সুরোর গহনা কথানা সাথে আনিয়াছিলাম। যাহাকে বিবাহ করিয়াছি, তাহাকে এক দিন পরিত্যাগ দিয়াছিলাম। দেখিতে দেখিতে আমার চোখে জল আসিল।

শ্রীমতী নলিনীবালা সেন।

মহিলা মহিমা।

(১)

কেমনে বুঝি'ব আমি নারীর মহিমা,
অনখ্য অনখ্য কবি,
পাইয়ে নারীর ছবি,
গাহিয়াছে কত গান নাহি তার সীমা।

(২)

কি দিয়ে গঠিল বিধি ও রূপ মাধুরী,
কেমনে বর্ণিব তাহা,
ভাবিয়ে না পাই বাহা,
লঙ্কণে আসিলে পরে করে মন চুরি।

(৩)

নানারূপে নারীজাতি এ বিশ্ব সংসাবে,
খেলিতেছে কত খেলা,
ললিত লহরী-লীলা,
সম্পূর্ণতালিকা তার কেবা দিতে পারে।

(৪)

কে বর্ণিবে ইন্দুমতী ললনার লীলা,
কখন দে শেফালিকা,
কছু কুটম্ব মল্লিকা,
হেসেহেসেচলেপড়ে দশদিশিআলা।

(৫)

রূপেব প্রভাবে তোর মত বসুন্ধরা,
লো ললনে। লীলায়ি,
স্বর্গ মর্ত্ত বিশ্ব-জয়ি,
তোমার ও রূপরশি, প্রাণ মনহরা।

(৬)

ধরাতে উপমা তব কোথায় সুন্দরি,
কি আছে এ অবনীতে,
তোমাব তুলনা দিতে ?
কবির মানস সরে মবালী মাধুরী।

(৭)

যাকিছু সুন্দর ধরে ধরা মনোবমা,
কল্প চন্দ্রমার ছানি,
কুসুম সুবতি রাশি,
নকলিতোমায় আছে বিমলিনী বামা।

(৮)

বিশ্বের জননী তুমি আনন্দ রূপিনী
তুমি মাতা অগন্ধাত্রী,
তুমি গো সন্ধ্যা গায়ত্রী,
অপার মহিমা তব বিশ্ব-বিমোহিনি।

(৯)

সুবার প্রেরণী তুমি প্রেম কল্পলতা,
যুবা যা'রে হৃদে ধ'বে,
ভুলে আছে এ সংসারে,
হৃদে হৃদি শিশাইবা হর হৃদি-ব্যথা।

(১০)

কনিষ্ঠ ভায়ের তুমি স্নেহের ভগিনী,
কি কব তোমার কথা,
মাহুতীনে তুমি মাতা,
বুকেবেঁধা শোকে তুমি বিশল্যকরণী।

(১১)

সুন্দর বাল্যকালে সুন্দরী বালিকা,
বিধুমুখে সুধাহাস,
তায় আধ আধ ভাব,
ধরাধামে স্বর্গচাত, মন্দার কলিকা ।

(১২)

সুষ্ঠিমতী প্রেমকণা নয়ন পুতলি,
তুমি বালা খুকুমণি,
আনন্দের সুদ্র খনি,
ছুটে ছুটে খেলা কব খেলায়ে বিজলি ।

(১৩)

তোমার বালিকা খেলা অতি মনোরম,
সুন্দরবনীত কায়,
অলঙ্কার শোভাপায়,
থেকে থেকে চলে পড় ফুলবালা সম ।

(১৪)

ববোবুদ্ধি সহকারে তুমি লো ললনা !
নানামতে কর খেলা,
কৈশোরে কিশোরী লীলা,
কেবাসেই খেলা ছবি অঁকিবে অজনা ।

(১৫)

কেমনে অঁকিবে আমি সেই রূপ ছবি,
কখন চঞ্চলা মেবে
হেসে হেসে যাও ধেরে,
কখন গজীরা তুমি হেরে নর কবি ।

(১৬)

কি সুন্দর কিশোরীর অপরূপ ভাব,
কতু তুমি কতু গোরা,
কতু বুকে হান ছুরি,
কোমলতা কঠিনতা বিচিত্র স্বভাব ।

(১৭)

অতীব কৈশোর ক্রমে আগত যৌবন,
যেন বিকসিত কলি,
ধায় শত শত অলি,
ধরাধাম স্বর্গপূবী নয়ন শোভন ।

(১৮)

কে তুমি অপূর্ণ সৃষ্টি ওলো কুহকিনি,
কোথা পেলি হেন শোভা,
প্রাণ কাড়া, মনলোভা,
কেরে স্বীয়া শক্তিরূপামহা মায়াবিনি ?

(১৯)

কে অঁকিবে বিধুমুখী সুবতী ললনা,
সুমধ্যা সে নিভধিধী,
চন্দ্রিকা চারু-হাসিনী,
লাবণ্য প্রতিমা বালা মরাল গমনা ।

(২০)

কাছে নাহি যেতে পারে সুবতী নারীর,
কেমনে নিখুঁত ছবি,
চিত্রিয়ে দেখাবে কবি,
দূর হ'তে কাড়ে প্রাণ পরাজিত বীর ।

(২১)

যা কিছু সংগ্রহ আছে ভাবিনীর ভাব,
দেখি যদি সেই সব,
দিতে পাবি অবয়ব,
কবিপদ অল্পসরি পুরাই অভাব ।

(২২)

নখবে ঠিকরে মরি খণ্ড শলী আভা,
আহা কি চরণ তল,
নিম্নিত বক্তা উৎপল,
অলঙ্কার চাক রেখা বাড়াইছে প্রভা ।

(২৩)

কুণ্ড কুণ্ড কন্ কন্ বাজিছে হুপুহ,
শুনে মধুময় তান,
প্রমত্ত পথিক প্রাণ,
চমকি' কিরিয়ে দেখে ধরা সুরপুর ।

(২৪)

থমকি থমকি থির মন্থর গমনা,
রাজ হংলী ছলে চলে,
যেন গো সরসী জলে,
অপূর্ণ মাধুসীময়ী যুবতী ললনা ।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকিবণচন্দ্র দত্ত ।

সামাজিক সভ্যতা সমালোচনা ।

অগভেব ইতিহাসে নানা সভ্যজাতি ও সভ্যদেশের কথা শুনিতে পাওয়া যায়। প্রাচীন পুরাত্ত্ব ভাবতীয় আৰ্য্যজাতি, ব্রীক্জাতি, মিসরজাতি ও চীনজাতিবই প্রাধান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। এই সকল জাতিই অবশ্ৰু সময়সময়ে সভ্যতার সর্বোচ্চশিখরে আবোহণ কবে নাই, একেব পর অন্তে এই উচ্চপদবী প্রাপ্ত হইয়াছিল। সে যাহাই হউক, ইহাদের উন্নতি নদ্বন্ধে যত মত দ্বৈধই থাকুক, ইহারা যে সভ্য সংজ্ঞা প্রাপ্ত সে বিষয়ে মতভেদ নাই।

এ সকল জাতিব পতনের পর বোমজাতির অভ্যুত্থান দেখিতে পাওয়া যায়। বর্তমানের ইয়ুরোপ মহাদেশই সভ্য বলিয়া কথিত। পূর্বোক্ত সভ্যজাতি-সমূহের ক্রিয়া কার্য্য আচার ব্যবহার পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, তাহারা শারীরিক ও মানসিক উন্নতিবিধান করিয়া, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের উন্নতিসাধন করতঃ স্বীয় মনুষ্যত্বের পরিচয় প্রদান পূর্বক

এই “সভ্য” আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছিল, কেবল সাজসজ্জা বা ফিটকাটে থাকিয়া তাহারা এই উচ্চ আখ্যা প্রাপ্ত হয় নাই ।

সভ্যতার নানাবিধ-শ্রেণী বিভাগ দেখিতে পাওয়া যায় । পূর্বোক্ত সভ্যতা, জাতীয় সভ্যতা শ্রেণীভুক্ত ; ইহা ভিন্ন সামাজিক সভ্যতা, সাম্প্রদায়িক সভ্যতা, দেশীয় সভ্যতা প্রভৃতি সভ্যতাব অনেক বিভাগ আছে ।

অন্ত সকল প্রকার সভ্যতার কথা ছাড়িয়া দিয়া প্রথমে “সামাজিক সভ্যতাব” সমালোচনা করা যাউক । আমাদের এই বঙ্গীয় হিন্দুসমাজে সভা কে ? আর সভ্যতাব লক্ষণই বা কিরূপ ? তাহাই প্রথমে দেখা যাউক ।

যদি আচার ব্যবহার, সাজ-পোষাক ও চাল-চলন, সভ্যতার স্বভাব হয়, তাহা হইলে এ সমাজে সভ্যতাব প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় সুকঠিন ব্যাপার ; কাবণ বর্তমান বঙ্গীয় সমাজে আহার ব্যবহার, সাজ-পোষাকে কোন নির্দিষ্ট নিয়ম নাই । ক্রটি, প্রবৃত্তি, শিক্ষা, দীক্ষা, মতি গতি অনুসারে ও অনুকরণে আহার ব্যবহার ও পোষাক পরিচ্ছদে বিভিন্নতা দেখিতে পাওয়া যায় । ঐ যে দাড়ি-চসমা-চেনধারী যুবক, নিদার্পাঙ্গ কলেবর বহুবিধ বসনে আবৃত করিয়া শ্বেদসিক্ত বদনমণ্ডল ক্রমাল দ্বারা মুছিতে মুছিতে ক্ষতপদে গমন করিতেছেন, আর পথে পরিচিত সন্দর্শনে মধ্যে মধ্যে দ্বৈত শিরশ্চালন ও অজ্ঞানানন্দন-স্বভাব-শুলভ দস্তবিকাসনে আপ্যায়িত করিতেছেন ; উহাকেই কি “সভ্য” বলিব ? এবং উহার ওই নবীন নটবর বেশ, ওই সুঠাম সুবন্ধিম হাব ভাব, হেলন দোলন, আব চাহন বলনকে কি সভ্যতার লক্ষণ স্বরূপ নির্দেশ করিয়া যাইব ? অথবা ওই যে অনাচ্ছাদিত বিশালবপু ললাটে দীর্ঘ ত্রিপুরধারী পুরুষ উত্তরীয় বন্ধে ধীরপদে গমন করিতেছেন, আর পশ্চিমধ্যস্থ পরিচিত সকলের সহিত সহাস্তবদনে আলাপ করিতেছেন, উহাকেই কি সভ্য সংজ্ঞা প্রদান করিব ? এই উভয় ব্যক্তিই ত এক সমাজের এক দেশের অন্তর্গত ; বল দেখি এ উভয়ের মধ্যে কে সভ্য ?

যদি বল এই উভয়ের মধ্যে বাঁহার চাল-চলন, পোষাক-পরিচ্ছদ দশজনের স্মৃতিসম্মত, বাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞান শ্রুজনের প্রশংসিত, তিনিই সভ্য ; তাহা হইলে এই উভয়ই সভ্য পদবী পাইবাব উপযুক্ত । কারণ, উভয়েরই চাল-চলন, জ্ঞান বিজ্ঞান দশজনের অনুমোদিত ও শ্রুজনের প্রশংসিত, উভয়েই জ্ঞান বিজ্ঞানে বিলক্ষণ উন্নত ; তবে ক্রটিভেদে উভয়ের মধ্যে এত প্রকৃতি ভেদ, মজুবা ইহার মধ্যে কেহই তোমার আমার চক্ষে ‘অসভ্য’ বলিয়া প্রতিপন্ন হইবেন না । বল দেখি ঐ নব্য সভ্য ভ্রম যুবককে তুমি কোন্ সাহসে ‘অসভ্য’ বলিতে চাঁও, আর ওই দেবোপম সাধুপুরুষ যিনি দেশীয় প্রাচীন প্রথাব বশবস্তী, তাঁহাকেই বা কোন প্রাণে, কোন বিজ্ঞানে ‘অসভ্য’ বর্বর-শ্রেণীভুক্ত করিতে পাব ? আমাদের সমাজের শীর্ষস্থানীয়, ধর্মেব রক্ষক, শাস্ত্রীয় বিধান কঠা ব্রাহ্মণ পণ্ডিতগণ যদি অসভ্য হন, তবে জানি না ভারতে সভ্য কে আছে ! !

যখন দেখিতে পাওয়া যায়, এক সমাজের মধ্যেই, এক দেশের মধ্যেই সভ্যতা সহস্রে মতভেদ ও মতবৈধ বহিয়াছে, তখন সর্বস্বাদী সম্মত ‘সভ্য’ স্থির করা শ্রুটি ন ; আর সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দেশও স্মৃতবাং গুরুতর ব্যাপার । ক্রটিভেদে এক সমাজের, এক জাতির মধ্যেও সভ্যতা সহস্রে ‘নানামুনিব নানামত’ দেখিতে পাওয়া যায়, স্মৃতবাং আমি বাঁহাকে সভ্য বলিব, হয়ত তোমাব মতে সে ঘোর অসভ্য ; তাই বলিতেছি, সভ্যতার সংজ্ঞা নির্দেশ বিষম সমস্যা ।

যদি সাজ-সজ্জা, পোষাক-পরিচ্ছদেই সভ্যতার সীমা নির্দিষ্ট হয়, তাহা হইলে হয় নব্য বাবুগণ, না হয় বুদ্ধপিভামহগণ, অথবা হয় সহরেগণ, না হয় পল্লীগ্রামবাসিগণ এই উভয়ের মধ্যে এক দলকে অবশ্যই অসভ্য হইতে হইবে, কিন্তু এতদুভয়ের মধ্যে কাহাকেও ত অসভ্য বলা যায় না, উভয়েই গণ্যমান্য ও সভ্য ভব্য বলিয়া দেশের কাছে সমাদৃত ।

পোষাক-পরিচ্ছদের প্রথা ও প্রণালী নিয়ত পরিবর্তনশীল । আমাদের দেশে অতি পুরাকালে যে প্রকার পোষাক ছিল, মুসলমান

রাগছে তাহা পবিবর্তিত হইয়া যায়, আবার ইংবাজ রাজত্বেও ইহা পরিবর্তিত হইয়াছে ও হইতেছে। এ সকল প্রথা অনুকরণ সাপেক্ষ ; সুতরাং সমাজে সর্বদা একপ্রকার পোষাক-পরিচ্ছদ আদরণীয় হইবার ম্লেহ। বাঁহারা সাজ-পোষাকে পূর্বরীতি অবলম্বন করেন, তাঁহারা বর্তমান রীতির বিরুদ্ধ মতাবলম্বী ; সুতরাং এক মতাবলম্বীরা অন্য মতাবলম্বীকে অবশ্যই অসভ্য বলিবে : অথবা যিনি কলা সভ্য ছিলেন, আজ তাঁহাকে অসভ্য হইতে হইবে, আবার যিনি অজ্ঞ সভ্য, হয়ত তিনি গড় কল্যা অসভ্য ছিলেন। ইহাতে প্রতীয়মান হইবে যে, সভ্যতা একটা কণস্থায়ী কথামাত্র। ইহাও প্রকৃত লক্ষণ কিছুই নাই।

এই সভ্যতা লইয়া আজ কাল আমাদের সমাজে, পাড়ারগারে সহরে, নব্যে বুদ্ধে, নাতিতে ঠাকুবন্দাদায়, বৈষ্ণবে ব্রাহ্মণে, নবীনার প্রবীণায় ও অধ্যাপকে আফিসাবে বিষম বিগ্রহ বাধিয়া যাইতেছে— একপক্ষ অন্য পক্ষকে অসভ্য প্রমাণ করিতে বদ্ধপবিকব, কিন্তু মীমাংসা কিছুই হয় নাই, সুতরাং ইহাদের মধ্যে কোন দল যে সভ্য, তাহা স্থির কবা কষ্টের ব্যাপার।

আমাদের দেশে সভ্যতার সাবেক লক্ষণ একপ্রকার ছিল, বর্তমানে আব একপ্রকার হইয়াছে। সাবেক সভ্যতা পল্লীগ্রামে আজিও কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সে সভ্যতা বর্তমান সভ্যতার দৃষ্টিতে ঘোর অসভ্যতা ও বর্জ্যতা।

বিপ্রচলিত দেশীয় রীতি-নীতি, আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রথা অব্যাহত বাধিয়া, বাঁহারা জ্ঞান বিজ্ঞানে উন্নতিলাভ করিয়াছেন, তাঁহারাই 'সেকেলে' সভ্য, আর পবেব অনুকরণে আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের খিচুড়ী পাকাইয়া বাঁহারা হজুকের হিড়িকে আন্ত-হারা হইয়া "কুচিবিকার" আনিয়া ফেলিতেছেন, তাঁহারাই একেলে বা নব্য সভ্য।

আমরা বিনাদোষে প্রাচীনকে ত্যাগ করিয়া নূতনের প্রয়াসী নহি। অনুকরণ অবশ্য স্থান বিশেষে অশেষ কল্যাণদায়ক হইয়া থাকে, তাই বলিয়া অনুকরণের অনুরোধে হাটক দূরে নিক্ষেপ করিয়া

কাচ পাইবার প্রত্যাশায় ধাবিত হইব না। যাহা আমাদের নিজেব, যাহা আমাদের শাস্ত্রসম্মত, যাহা আমাদের মহাপুরুষগণের অনুমত, তাহাই আমাদের আদরের ও যত্নের জিনিষ। আমাদের সহাজনেরা আহায়ে ব্যবহারে, পোষাক-পরিচ্ছদে ও চাল-চলনে যে পথ অবলম্বন করিয়া গিয়াছেন, সেই পথকেই আমবা প্রকৃত পন্থা মনে করিব। যিনি যে পরিমাণে সেই পথেব পথিক হইতে পারিবেন, যিনি যে শবিমাণে সেই পথে অগ্রসর হইতে পারিবেন, তিনি সেই পরিমাণে “সভ্য” পদবীতে আরোহণ করিবেন। আমাদের এই সভ্যতা অন্তরে দৃষ্টিতে বিসদৃশ হইলেও, অন্ত্রে ইহাকে অসভ্যতা, বর্জ্যতা বলিলেও আমবা আমাদের সমাজে--হিন্দুব দৃষ্টিতে কখনই অসভ্য হইব না।

দেশের জল বায়ু ভেদে আহাৰ-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদের পার্থক্য সমুদ্ভূত হয়। যে দেশের যেরূপ দেশাচার, তাহাই সম্পূর্ণ-রূপে রক্ষা করাই সভ্যতার লক্ষণ। তবে পোষাক-পরিচ্ছদ সম্প্রদায় ভেদে, কার্যভেদে পবিবর্তিত হয়, এ নিয়ম সকল দেশে সকল সময়েই প্রচলিত আছে। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের পোষাক, ঘোষীর পোষাক, গৃহীৰ পোষাক কখনও একপ্রকার হইবে না। গৃহীৰ মধ্যেও আবাব কার্যাবলম্বন পোষাক, বেড়াইবাব পোষাক, শীতকালেব পোষাক, গ্রীষ্মকালেব পোষাক প্রভৃতি নানা প্রকারে কণাস্তরিত হইবে, ইহা স্বভাবসিদ্ধ। এ সকল পোষাক পবিবর্তনে সভ্যতাব সীমা নির্দিষ্ট নহে। যাহা স্বভাবজ তাহাই বজায় রাখাই সভ্যতাব অনুমত, আব স্বভাবের বিকস্বে, দেশাচারের বিপরীতে, অপবেব অনুকরণে, প্রকৃতির প্রতিকূলে কাৰ্য্য করাই অসভ্যতা।

ঐবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায় ।

এ যে রাকসের প্রাণ !

এ যে রাকসের প্রাণ !

নাই দয়া, নাই মায়া, শীতল সলিল-ছায়া,

শুধু বিশ্বজ্ঞাসী ক্ষুধা—নিত্য বক্তৃগান !

ক্ষুধিতা শাকিনী মত, আগুলি সংসার পথ,

বদন ব্যাদান করি—নাহিক বিরাম !

নিশ্বাসে নিশ্বাসে সরে, কত প্রাণী সে উদরে,

তারি অস্থিপূর্ণ এই—হৃদয়-অশান !

অভিমান, রোবরাগ, তার সে কংশন-দাগ,

কথির রঞ্জিত ঠোটে—কলঙ্ক-নিশান !

এ যে রাকসের প্রাণ !

কে কবে কি চেয়েছিল, কে কবে কি দিয়েছিল,

করিয়াছি চিরদিন অতি ভুচ্ছ জ্ঞান !

দয়া মায়া স্নেহ আর, মানবের এ স্বরার,

হৃৎকো অঁথির ঠার—হাসির মেলান ;

চাহিতে অমনি পায়, লাভালাভ কি বা ভায় ?

বালকের ক্রীড়নক ভেবেছি সে দান !

বধনি হয়েছে থুসী, একটু আধটু ভুবি,

ছুঁড়িয়া ফেলেছি শেষে ; প্রাণের কি মান !

কি আকাঙ্ক্ষা নাথ বৃকে, চেয়ে আছ এই মুখে ?

এ শুক নদীতে আর ডাকিবে না বাণ !

হৃদয় করিয়া খালি, বাকী রক্ত দাও ঢালি,

এ রাকসী পিপাসার হৃদক নির্মাণ !

নাহি পার—স'রে যাও, মিছে আর কেন চাও,

কাতরতা—অকূলতা—সম্মলনমান

ভুলিবে কি ষাট ?—এ যে রাকসের প্রাণ !

শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মহামায়া

(গল্প ।)

(১)

কৃষ্ণধনের স্ত্রী মহামায়াদেবী একবার করিয়া খুঁটরালায়ে যান, আর একটা করিয়া বিপদ আনিয়া স্বামীর কাছে গচ্ছিত করিয়া দেন। কৃষ্ণধন ডেপুটী-ম্যাজিষ্ট্রেট। হাকিমি করিতে তাহাকে অনেক জেলায় ঘুরিতে হয়। প্রতিবার স্থান পরিবর্তনের সময় তিনি মহামায়া-দেবীকে দেশে রাখিয়া আসেন। তাঁহার যে গ্রামে বাস সে গ্রামের লোক অতিশয় দরিদ্র। কাজেই গ্রামবাসিগণের বিপদ, এক মহামায়ার কল্যাণে নানামূর্তি ধরিয়া কৃষ্ণধনের উপার্জিত অর্থে হস্তক্ষেপ কবে। মোটা মাহিনা পাইয়াও, বিশেষ কিছু সঞ্চয় করিতে পারিলেন না দেখিয়া, কৃষ্ণধন মহামায়াকে দেশে পাঠাইবেন না স্থির করিলেন।

কৃষ্ণধন একেবারে দয়াদাক্ষিণ্য-শূন্য ছিলেন না। তবে তাহার দয়াদাক্ষিণ্যের একটা সীমা ছিল। দারিদ্র্য-প্রতিকারে, বিপদের সহায়তায়, তাঁহার আন্তরিক ইচ্ছা থাকিলেও, তিনি আপনায় শক্তির অসম্পূর্ণতা অনুভব করিয়া, মহামায়ার মত, পরোপকারের অন্ত নিজের ভবিষ্যতের প্রতি দৃষ্টিহীন হইতেন না। বিশেষতঃ তিনি দরিদ্রের সম্মান ছিলেন; এবং বাল্যকালেই তাহার পিতৃমাতৃবিয়োগ হয়। তাহার পুত্রপৌত্রাদির মধ্যে আবার যে কেহ দারিদ্র্যের জ্বালাময় দংশনে জর্জরিত হইবে ও তাহার কাণ্ডজ্ঞানহীনতার তীব্র সমালোচনায়, তাহাদেব জীবনেতিহাসের মুখবন্ধ রচনা করিবে, এটা তিনি কল্পনায়ও আনিতে সাহস করিতেন না। জীবনযুদ্ধে পৃষ্ঠদর্শনের সমুদায় দোষ, পূর্বপুরুষের অমিতব্যয়িতাব উপর নিক্ষেপ করা বাঙ্গালীর একটা প্রধান স্বভাব—এটাও কৃষ্ণধনের বিশেষ বিদিত ছিল। পুত্রের মঙ্গলচিন্তা পিতামাতার কর্তব্য, কিছুমাত্র নষ্ট না রাখা

বর্তমান কালোচিত সভ্যতার অননুমোদিত—ইত্যাদি নানা উপদেশ-
মূত্রে কৃষ্ণধন মহামায়াব হাত বাঁধিবার চেষ্টা করিতেন। দুই চাবি
দিনের অন্ত কৃতকার্যও হইতেন। কিন্তু যেদিন সংসারের নানা
কষ্টাটের মধ্যে পড়িয়া মহামায়া স্বামীর উপদেশটা ভুলিয়া যাইত,
সেদিন মহামায়াব দায়-শ্রোতে বাণ ডাকিত। কখন বা অনির্ণয়নীয়
কারণ পরম্পরায়, আন্তঃসলিলিক প্রবাহের স্রাব মহামায়াব দান,
কৃষ্ণধনের উপার্জনটাকে আন্তঃসাবশূক্ত করিয়া ফেলিত। মাহিনা আনিয়া
ঘরে না রাখিতে রাখিতে কৃষ্ণধন শুনিতেন তাহার অর্ধেক খরচ
হইয়া গিয়াছে। মহামায়াব এই আয়বিস্তৃতিরোগটা দেশেব জল
বায়ুর গুণেই কিছু প্রবল হইত। নিকৃপায় কৃষ্ণধন মহামায়াকে
দেশে পাঠাইবেন না স্থির করিলেন।

কিন্তু মহামায়াকে পাঠাইবেন কোথায়? পিতামাতার মৃত্যুর
পর মহামায়া পিতৃকালবে ঘাইতে চাহিত না। যদিও বা কখন
ঘাইত, সে সময় কৃষ্ণধনকে সঙ্গে ঘাইতে হইত। আর সেখানে
ঘাইলেই, যে কয়দিন থাকিতে হইত, সেই কয়দিনই সময়ে অসময়ে
পিতামাতার উদ্দেশে মহামায়াব ককণকন্দনে কৃষ্ণধনের কর্ণের বধিরতা
অবশ্যজ্ঞাবী হইয়া পড়িত। কৃত্রিম কোপপ্রকাশে মহামায়াকে নিরস্ত
করিতে ঘাইলে বিপবীত ফল হইত। হৃদয়েব আবেগগুলি বাহিব
হইবার পথ না পাইয়া, শিরায় ধমনীতে প্রবৃষ্ট হইয়া একটা না
একটা রোগের সৃষ্টি করিত। তাহার জন্ত যে অস্থিরতা ও অর্থব্যয়,
তা হইতে মহামায়াব মুক্তহস্ততা শতগুণে ভাল। কৃষ্ণধন স্ত্রীকে
সঙ্গে সঙ্গে রাখিবেন, স্থির করিলেন।

(২)

সঙ্গে সঙ্গে রাখিয়াও কৃষ্ণধনের মহামায়া-ভীতি দূর হইল না।
কৃষ্ণধন যখন মেদিনীপুরে, তখন মহামায়া এক নূতন রকমের বিপদ
আনিয়া উপস্থিত করিল। একদিন নিমন্ত্রণোপলক্ষে বাটীর বাহির
হইয়া মহামায়া অষ্টমবর্ষীয় পুত্র শ্যামসুন্দরের একটা ক'নে আনিয়া
উপস্থিত করিল। বালিকাটি পথে খেলিতেছিল, আর সেই পথ

দিয়া পান্দী করিয়া মহামায়া নিমজ্জন বাড়ী যাইতেছিল। বালিকার সৌন্দর্যে মহামায়ার নয়ন আকৃষ্ট হইল। অঙ্গে একখানিও অলঙ্কার নাই দেখিয়া, তার প্রাণ কাঁদিয়া উঠিল। পান্দী হইতে নামিয়া মহামায়া কস্তাটিকে কোলে কবিল, তাহার হৃদয় উথলিয়া উঠিল। পান্দীর ভিতর শ্যামসুন্দর ছিল, তাহাকে বলিল “শ্যামসুন্দর তোর হারগাছটা খুকিকে দে না।” শ্যামসুন্দরের গলায় গার্ডচেন ছিল। সে তৎক্ষণাৎ মাতৃ আজ্ঞা পালন করিল। হার খুলিয়া বালিকার গলায় পরাইয়া দিল।

মহামায়া কি কবিতে আসিয়াছিল ভুলিয়া গেল। বালিকাকে পান্দীতে ভুলিয়া বাটী ফিবিল! কৃষ্ণধনকে দেখাইয়া বলিল, “এই লও, তোমার বউ আনিয়াছি।”

কৃষ্ণধন বালিকাটিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন বটে, কিন্তু মহামায়ার বদ্বিব অস্তিত্বে তাহাব বিশেষ সন্দেহ থাকায়, বালিকাকে শুধু দেখিয়াই পুত্রবধূরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার কবিলেন না। কৃষ্ণধন স্বভাব-কুলীন। তাহার পুত্রের বিবাহে নানারূপ বাধাবিপত্তি ছিল। সামাজিক নিয়মানুসারে কয়েকটা নিদিষ্ট ঘরের সহিত বৈবাহিকবন্ধনের বাধ্য-বাধকতা'র যে সে ঘরে কুলীনেব পুত্র কস্তাব আদান প্রদান চলিতে পারে না। কৃষ্ণধন কস্তার পরিচয় জানিতে চাহিলেন। এই ধানেই একটু গোল হইল। মহামায়া কস্তাটিকে সুন্দর দেখিয়াই খরিয়া আনিয়াছিল। সৌন্দর্য্যই বালিকাব পরিচয়। অস্ত্র পরিচয়ের আবশ্যকতা আছে, এটা মহামায়ার মনেই ছিল না। মহামায়া বালিকার পরিচয় দিতে পারিল না বলিয়া, কিছু অপ্রতিভ হইল। কৃষ্ণধন সমস্ত ব্যাপারটা বুঝিয়া হাসিলেন। আব মহামাযাকে আবাব নিমজ্জন রাখিতে ও যেখান হইতে কস্তাকে কুড়াইয়া আনা হইয়াছে, সেই স্থানেই ছাড়িয়া দিতে আদেশ দিলেন।

(৩)

মহামায়ার হৃদয়ে সরলতা ও দয়ার কিছু আধিক্য ছিল। এমন কি আধিক্যটা গহিত হইবার সমস্ত লক্ষণই পাইয়াছিল। শুধু কৃষ্ণ-

ধনের সাবধানতায় সেটা বড় একটা অনিষ্ট করিতে পাবিত না। অনিষ্টের প্রকোপটা তাহার উপার্জনের উপর দিয়াই চলিয়া যাইত। সেটা কৃষ্ণধনের এক বকম সহিয়াই আসিয়াছিল। কিন্তু এবারে কৃষ্ণধন বিষম ফাঁপরে পড়িলেন।

পুত্র বিবাহ করিয়া বধূবৃত্তের সহিত কিছু ধনবহুও শস্তর গৃহ হইতে আনিবে, এটা শিক্ষিত অশিক্ষিত, সকল পিতাবই আশ্বাসিক ইচ্ছা। তাহার উপর কৃষ্ণধন বড় কুলীন। কৃষ্ণধন স্থির করিয়া-ছিলেন, মহামায়ার হাতে যখন কিছুই থাকিবে না, তখন পুত্রকে কোন ধনীর কন্যার সহিত বিবাহ দিয়া, তাহাকে দাবিদ্বয়ের হাত হইতে রক্ষা করিব। কিন্তু সে আশাতেও মহামায়া ছাই দিল। মহামায়া বালিকাব কুল-গোত্রের সন্ধান লইয়া আবাব স্বামীব কাছে উপরোধ কবিল। বালিকাব পিতা তাহাবই আদালতেব একজন সামান্ত আমলা। সম্বাদ্ধ ভাল কুলীন ভঙ্গ। কিন্তু বিবাহ হইলেই শ্যামসুন্দরের কুলভঙ্গ হইবে। এমন বিবাহে কেমন কবিশা কৃষ্ণধন সম্মতি দেন! তিনি মহামায়াকে এই অন্তায় কার্য্য হইতে নিবস্ত করিতে সাধ্যানুসারে চেষ্টা করিলেন। পুত্রের শিশুত্ব, বাল্যবিবাহের বিষময়ত্ব, কুলভঙ্গের অপকারিতা, নানাতর্কযুক্তি তিনি মহামায়াব কাছে উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সমস্তই মহামায়াব চোখের জলে ভাসিয়া গেল। তখন নিকৃপায় হইয়া কৃষ্ণধন মহামায়াব ইচ্ছায় আব বাধা দিতে চাহিলেন না। সামাজিক ও বৈবয়িক অবস্থার ও পদমর্য্যাদার অসামঞ্জস্য উপেক্ষা করিয়া কর্মচারীব কন্যাকে বধূদে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন। বিবাহের কেবল একটা পাকা দেখার অপেক্ষা ছিল। এমন সময় বালিকাটা নিজের বিবাহেব প্রতিবন্ধক হইয়া সব কাজ পণ্ড করিয়া ফেলিল। একদিন মহামায়া বালিকার মাতাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী আনিল। বালিকাও সঙ্গে সঙ্গে আসিল। আসিয়া শ্যামসুন্দরের সঙ্গে সঙ্গে খেলিতে আরম্ভ করিল। খেলিতে খেলিতে কেমন করিয়া যে হতভাগা মেয়ে শ্যামসুন্দরকে বোয়াক হইতে ফেলিয়া দিল যে, সেই পতনেই বালক মূর্ছিত হইয়া পড়িল।

অনেক চেষ্টার সে, মূর্ছার অপনোদন হয়। লজ্জিত বালিকার মাতা কত্না লইয়া ঘরে ফিরিয়া আসিল। সেই অবধি বালিকার পিতাও লজ্জায় কৃষ্ণধনের সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। মহামায়াও আর এই অলক্ষণা কত্নার জন্য কৃষ্ণধনেব কাছে একটাও কথা কহিতে পারিল না। মহামায়া ভাবিল, ইহা কুলভ্রষ্টোত্তমের কুফলের পূর্বসূচনা। একমাত্র পুত্র শিক্ষিত কৃষ্ণধনও এই আকস্মিক ঘটনায় একটু অশুভ ফলকাজী হইয়া পড়িলেন। ঘটনাটা আকস্মিক বলিয়া উড়াইয়া দিতে তাঁহার হৃদয়-বলে কুলাইল না। তবে তিনি মহামায়াকে এই সময় দুটা মিষ্টি-তিরস্কার কবিতার অবকাশ পাইলেন। বলিলেন,—“সৎকার্য্যই কর, আর অসৎকার্য্যই কর গুরুজনেব অনুমতি লইতে হয়। হিন্দুর ঘবেব স্ত্রী, স্বামীকে যদি গুরু বলিয়া জান, তবে আব স্বেচ্ছাধীন হইয়া কার্য্য করিও না।”

মহামায়া বলিল,—“এবার হইতে তোমাব অনুমতি না লইয়া আব কোনও কার্য্য করিব না।”

কৃষ্ণধনেব বেশী দিন মেদিনীপুবে থাকা হইল না। পূর্বেই বলিয়াছি, লজ্জিত ব্রাহ্মণ আর কৃষ্ণধনের সহিত দেখা করিতে সাহস করিল না। আদালতে স্বাক্ষবাদিব প্রয়োজন হইলে, অন্ত লোক দিয়া পাঠাইয়া দিত। ব্রাহ্মণের লজ্জায় কৃষ্ণধন বড় বিপদ-গ্রস্ত হইয়া পড়িলেন। অনেক বুঝাইয়া আশ্বাস দিয়া, কত্নাকে সৎপাথে অন্ত করিবার সমস্ত ব্যয় ভাব গ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞিত হইয়াও যখন তাহাকে কাছে আনিতে পাবিলেন না, তখন মেদিনী-পুর তাহার কণ্টকময় বলিয়া বোধ হইল। শেষে দরিদ্র ব্রাহ্মণকে বুঝা আশ্বাস আশ্বাসিত করিয়া সে মনোভঙ্গের হেতু হইয়াছিলেন, তাহার পূরণ স্বরূপ তাহাকে উচ্চপদে উন্নীত করাইয়া সে স্থান ত্যাগ করিলেন। আর মনে মনে স্থির করিলেন, সকল নষ্টের মূল মহামায়াকে আব কখনও বাটীক বাহির হইতে দিব না।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকীর্ত্তনপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

কাব্য বিশারদের কারাবাস ।

আজ কয়েক বৎসর গত হইল, শ্রীযুক্ত কাদম্বিনী গাঙ্গুলির মান-হানী সূচক প্রবন্ধ পত্রস্থ করিয়া ভূতপূর্ব “বঙ্গনিবাসী” সম্পাদক শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র পাল মহাশয় আদালত কর্তৃক সেই হতমান পুনঃ প্রদান ব্যাপদেশে কাবাদেণ্ডে দণ্ডিত হইয়াছিলেন ; এ ঘটনা বোধ হয়, আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণের মধ্যে অনেকেব স্মরণ থাকিতে পাবে। সেই সময়ে আমাদের বিখ্যাত বিখ্যাত সহযোগীগণ হতমান পুনঃ প্রাপ্তি বিষয়ে প্রকাশ আদালতের সাহায্য গ্রহণ করা উচিত কিনা? এবং উক্ত প্রকারের পুনঃ প্রাপ্ত মান বাস্তবিকই মান পদ বাচ্য কিনা? এই বিষয় স্থিরীকরণার্থ বহুল প্রবন্ধাদি প্রকাশে অনেক কাগজ, কলম ও সময় নষ্ট করিয়াছিলেন। অনেক দিন এইরূপ ব্যাপাবেব অভ্যুত্থান না দেখিয়া মনে করিয়াছিলাম,—‘সাধাবণ মানই মান—ধর্ম্মাধিকরণ রূপায় যেটা পুনঃ প্রাপ্ত বলিয়া জানা যায়, সেটা বাস্তবিক মান নহে, একটা বীভৎস বীড়ম্বনা মাত্র, এবং তাই বুঝি এখন আর লোক সে অপ-মানের প্রত্যাশা করেন না।’ আজ আবার সেই পাশ্চাত্য শিক্ষানু-করণ-লব্ধ ব্যাপাবেব পুনবতিনয় দর্শনে বুঝিলাম—সেই গবল বাক-বিতণ্ডা কালী কলম কাগজ—বাস্তবিকই বিনাকারণে অপব্যয়িত হইয়াছে।

কলিকাতা মিটিকলেজেব প্রফেসার মাস্তবর শ্রীযুক্ত হেরম্ভচন্দ্র মৈত্র মহাশয়ের পত্নী শ্রীযুক্তা কুমুমকুমারী মৈত্রেব ধনিয়া লওয়া মান হানী-কর কুচিচিপূর্ণ কবিতা পত্রস্থ করায় মহামাত্র হাইকোর্টের জজ ও জুরীগণের (Unanimous Verdict) একমত বিচারে ; মাস্তবব হিতবাদী সম্পাদক শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ মহাশয় সুবিচারে হউক, আর কুবিচারে হউক, নৈবহুর্কিপাকে আজ ৯ মাস কারাবাসে নিষ্কিন্ত হইয়াছেন।

“হিতবাদী” সম্পাদক কারাগারে প্রেবিত হওয়ায় কুমুমকুমারীর হতমান সগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে কিনা, তাহা আমরা অবগত

নহি। যদি হইয়া থাকে ভাল, কিন্তু এই বিষাদের মুখে পড়িয়া আজ যে সকল ঘরের কথা সাধাবণ্যে জানাজানি হইয়া গেল, তাহার ব্যবস্থা কি হইল? সকল লোকেই সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতালোক প্রাপ্ত একথা কেহই বিশ্বাস করিবেন না; সুতরাং কেহ কেহ হস্ত এততেও মান পুনঃ প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছেন না, তাহাদের পক্ষে কি? আলোক প্রাপ্ত জনের “মানহানী” আইনের এই গুড় রহস্য আমাদের হৃদয়ঙ্গম হইল না, কি কবির দূর্বৃষ্ট!! এ ব্যাপারে কেবল আমবা কেন, বাস্তবিক ভাবতবাসী মাত্রেই হুংখিত হইয়াছেন।

“হিতবাদী” সম্পাদকেব পক্ষে বাহা হইয়াছে, তাহাতেই বিপক্ষগণ বোধ হয়, সন্তুষ্ট হইয়াছেন। ইহা অপেক্ষা বেশী হইলেও যে না হইতেন তাহা বলিতে পারি না। যদি ১ মাস দণ্ড হইত, তাহাতেও তাহাদের যে পরিমাণ মানের জয় জয়কার হইত, ৯ মাসেও তাহাই ফিবিয়াছে, তাহা অপেক্ষা বেশী কি কমে ফিরে নাই, এজন্য বলিতেছি, হিতবাদী সম্পাদকেব বাহা হইবা গিয়াছে, তাহাই যথেষ্ট হইয়াছে— আর কেন? এস, সপক্ষ বিপক্ষ সকলে এস, স্ব স্ব উদাবতা শুণে আজ মহাবাগী ভাবতেশ্বরীর স্বর্গী বাৎসরিক উৎসব উপলক্ষে যে সকল সংকল্প অনুষ্ঠিত হইবে, হিতবাদী সম্পাদকের কারামুক্তি বাহাতে তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হয়, তৎপক্ষে প্রাণপণে চেষ্টা করি। এস সাম্য মৈত্রী ভাব মনে জাগাইয়া তুলিয়া স্ব স্ব উদাবতা প্রকাশ করি। সহৃদয় বন্ধুগণ, পাঠক-পাঠিকাগণ কেহই যেন এ বিষয়ে পশ্চাত্তাপ না হই। যে দেশের উপকাব কবে, সাধাবণেব উপকাব কবে, সেই পূজ্য; হিতবাদী সম্পাদক আমাদের অনেক উপকাব করিয়াছেন, এস সেই পূজ্যের জন্ত আমরা আজ সোৎসাহে সমবেত হই।

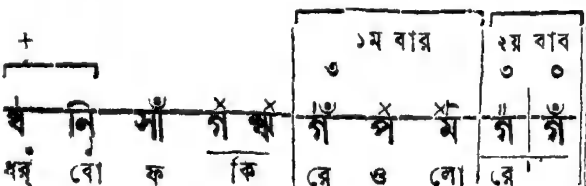
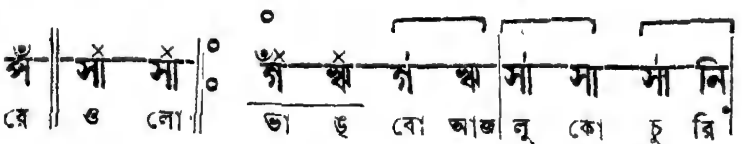
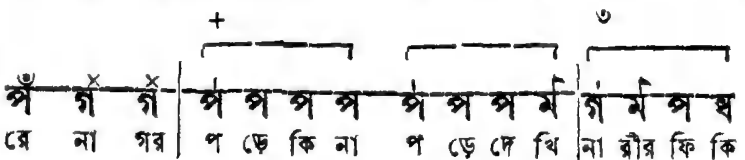
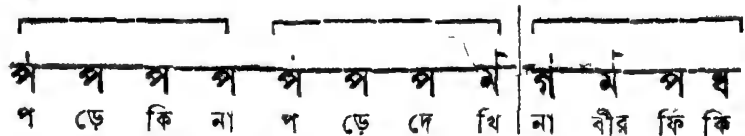
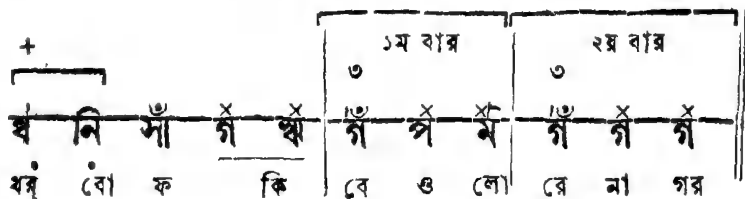
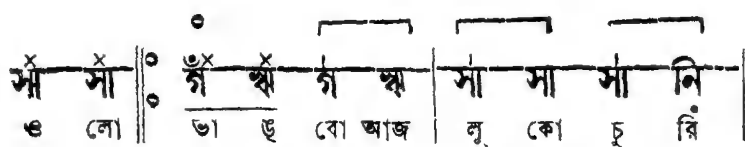
স্বরলিপি।

ইমন—কাওয়ালী।

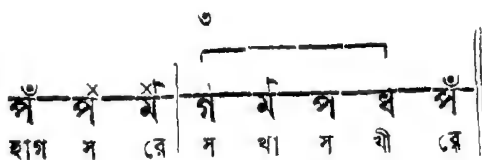
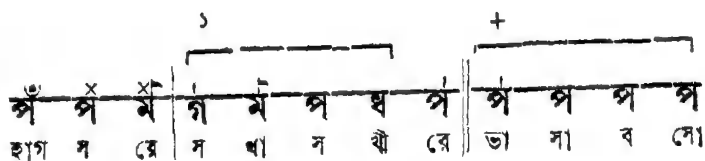
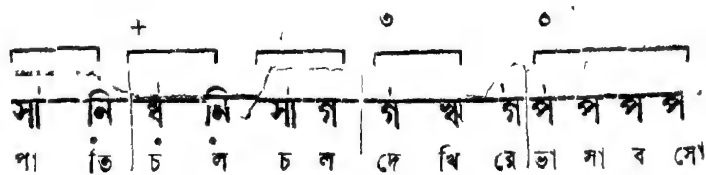
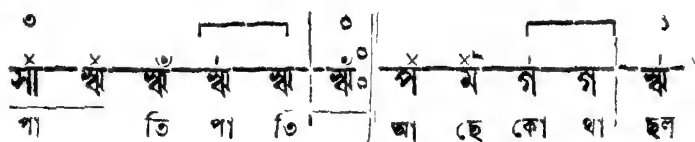
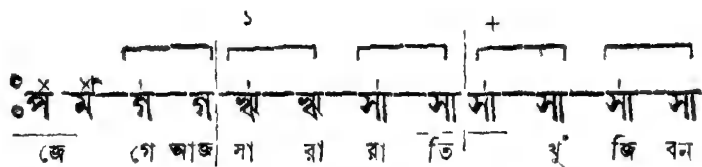
কথা—৮ রাজকৃষ্ণ রায়।

স্বর—শ্রীযুক্ত রামভাষণ দাশ্রাল।

আহ্বায়ী।



অন্তরা ।



শ্রীমক্ষিণাচরণ সেন ।

স্বরলিপির গান।

ইমন্—কাওয়ালী।

ওলো ভাঙ্‌ব আজ লুকোচুরি

ধর'ব ফকিরে ;

নাগর পড়ে কিনা পড়ে দেখি

নারীর ফিকিরে।

জেগে আজ সারা রাত, খুঁজি বন পাতি পাতি,

আছে কোথা ছল্ পাতি,

চল চল দেখিরে,—

ভাসাব মোহাগ মরে সখা সখীরে ॥

—

মতামত ।

~~বঙ্গ-জীবন~~ মাসিকপত্র ও সমালোচনা । শ্রীযুক্ত তারিণীচরণ সেন সম্পাদিত । আমরা এই মাসিকপত্রিকা খানির ২য় ভাগের ১ম, ২য় ও ৩য় সংখ্যা একত্রে প্রাপ্ত হইয়াছি । ইহাতে কতিপয় নূতন ও কতকগুলি পুৰাতন লেখক লেখনী চালনা করিতেছেন । আরও দুই এক সংখ্যা না পাইলে বেশী কিছু বলিতে পারিলাম না । তবে মোটের উপর ইহার পবিচালন কার্য মন্দ হইতেছে না । আমরা পত্রিকা খানির দীর্ঘ-জীবন প্রার্থনা করিতেছি ।

অমরাবতী এজেন্সি—আজ কয়েক বৎসর হইল, শ্যামবাজার রামচন্দ্র মৈত্রেয় লেনে শ্রীযুক্ত চৌধুরী ফ্রেণ্ডস্ কর্তৃক উক্ত এজেন্সি বা পুস্তকবাহী-সমিতি স্থাপিত হইয়াছে । আমরা উক্ত এজেন্সি প্রস্তুত ১ শিশি—লাল রবার ষ্টিম্পের কালী, ১ শিশি—অদৃশ্য কালী ও উহা ব্যবহার করিবার একটি পেন নিবন্ধ কলম ও এক ফায়েল ব্ল্যাক কালীব পাউডার প্রাপ্ত হইয়াছি । আমরা উক্ত কয়েকটি দ্রব্যই পরীক্ষা কবিয়া দেখিয়াছি, দ্রব্য কয়েকটি বাস্তবিকই সুন্দর ও সাধারণের ব্যবহার উপযোগী হইয়াছে । মূল্যও সম্ভবতঃ সুলভ বলিয়া বোধ হইল । সাধারণে উক্ত এজেন্সির দ্রব্য একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিলে আনন্দিত হইব ।

বীণাপাণি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে । ভগবতি, ভারতি, দেবি নমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । } চৈত্র, ১৩০৩ সাল । } ৩য় সংখ্যা ।

মহামায়া ।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর ।]

(৪)

ইহার পর আট বৎসর অতীত হইয়াছে। শ্রামশূন্যর প্রবেশিকা-পরীক্ষায় উচ্চস্থান অধিকার করিয়াছে। কৃষ্ণধন বহুকালের পর স্ত্রী ও পুত্র লইয়া ছুটি উপলক্ষে দেশে আসিয়াছেন। মেদিনীপুর হইতে আসিয়া অবধি কৃষ্ণধন আর কোথাও মহামায়াকে যাইতে দিতেন না। বাটীর বাহির হইলেই স্বামীকে বিপদগ্রস্ত করেন—বলিয়া মহামায়াও আর কোথাও যাইতে চাহিত না। এই আট বৎসরে কৃষ্ণধন কিছু সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়াছেন; মহামায়ার নামে কোম্পানীর কাগজ কিনিয়াছেন। এই কাগজ ও যান্ত্রমহ হইতে প্রাপ্ত, শ্রামশূন্যরের নিজের কিছু ভূসম্পত্তি, প্রভের আয়ে, তাঁহার অবর্তমানে মহামায়ার ও পুত্রের কোন ক্রেশ থাকিবে না ভাবিয়া, কৃষ্ণধন ভবিষ্যতের জন্ত নিশ্চিন্ত হইয়া বহু-

দিন পরে দেশে ফিরিয়াছেন। তাঁহার এতটা করিয়া বিশেষ কাৰ্য্যকরিতা করিয়াছেন গৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাকে অনেক কষ্টভোগ করিতে হইয়াছিল। সে কষ্টের কথা শ্রবণ হইলে, জীবনের বিধিমাধ্যমে বাধ্যস্বত্বিতও তাঁহার মনঃপীড়া আনিয়া উপস্থিত করিত। তাঁহার প্রিয়জনের মধ্যে আর কেহ যে সেই অবস্থায় পড়িবে, এটা তাহার মনে আসিলেই গাত্র শিহরিয়া উঠিত। তাই তিনি মহামায়ার মুক্তহস্ততায় বড় তুষ্ট ছিলেন না। শুধু স্ত্রী বলিয়া নয়, আর এক বিশেষ কারণে তাহাকে মহামায়ার ভবিষ্যতের জন্ত বিশেষ ব্যাকুল হইতে হইয়াছিল।

অনাথ আশ্রয়হীন বালক কৃষ্ণধন, মহামায়ার পিতার দয়ার সংসারে দাঁড়াইবার স্থান পাইয়াছিলেন। অবশেষে তাঁহার কাছ হইতেই মহামায়া রূপ স্ত্রীস্বলাভ করিয়া তাহারই ভাগ্যে সমাজে উচ্চস্থান ও চাকরীতে উচ্চপদ পাইয়াছেন। এই সব ভাবিয়া কৃষ্ণধন মহামায়ার জন্ত সর্বদা চিন্তিত থাকিতেন। মহামায়ার পিতা অনেক উপার্জন করিয়াও বিশেষ বকম কিছু রাখিয়া যাইতে পাবেন নাই। মহামায়াও পিতার গোত্র ধরিয়াছে দেখিয়া তাঁহার রক্ষা কর্তব্য জানে কৃষ্ণধন নিজের হাতে খরচ পত্রের হিসাব রাখিয়াছেন। এখন একরূপ নিশ্চিত হইয়া আটবৎসর পরে, কৃষ্ণধন মহামাকে স্বাধীনতা পুনঃ প্রদান করিলেন। শ্রামশুল্কের বড় বড় ষর হইতে সম্বন্ধ আসিতে লাগিল। দুই দিন বাদেই পুত্র পুত্রবধূ লইয়া তাহাকে সংসার রাজত্বের রাণী হইতে হইবে, পুত্রের জন্ত তাহাকে আবার অনেক পরিবারের সম্পর্কে আসিতে হইবে বুঝিয়া কৃষ্ণধন মহামাকে যথেষ্ট কাজ করিতে আদেশ দিলেন। সমস্ত সঞ্চিত অর্থ মহামায়ার হস্তে দিয়া, এবং উপার্জনের সমস্ত অর্থ মাসে মাসে দিতে প্রতিশ্রুত হইয়া আপনি কর্তৃত্ব হইতে অবসর গ্রহণ করিলেন।

বহুকাল পরে দেশে ফিরিয়াছে বলিয়া, গ্রাম সম্পর্কীয়া ঠান-দিদি, মাসী, পিসী, ননদিনীদল মহামাকে চারিদিক হইতে

দেখিতে আসিল। কেহ মহামায়ার শরীরে শক্ত চেষ্টা করিয়া কিছুই দেখিতে পাইল না। “আহা! তোর শরীরে কিছুই নাই,”—বলিয়া প্রায় সমস্ত চোখটা বজ্রাচ্ছাদিত করিয়া, সেই অঙ্গ-হীনায় মুখের ভাবটা একবার অপাঙ্গে দেখিয়া গেল। দেখিয়া লইল—মহামায়ার ভাবের কিছু পরিবর্তন হইয়াছে কি না। কেহ “তোর পাণে আর চাওয়া যায় না” বলিয়া, দৃষ্টির সমস্ত ভাব মহামায়ার মুখের উপর চাপাইয়া রাখিল। কেহ মহামায়ার জন্ত ভাবিয়া ভাবিয়া ক্ষীণ হইয়া, ‘আর কাহারও সহিত ভাব রাখিব না’ বলিয়া প্রতিজ্ঞা বদ্ধা, সকলকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিতে লাগিল। কেহ কৃষ্ণধনের শরীর রক্ষার বড় অমনোযোগ দেখিয়া, তাহার নিদ্রাহীনতার কথা মহামায়াকে শুনাইল। আশ্রয় আকিসের পবিত্র শ্রমটা দিব্যচক্ষে দেখিতে দেখিতে কত আক্ষেপ করিল। আব জাগ্রাহীন দক্ষমুখ সাহেবই যে শাস্ত নিরীহ কৃষ্ণধনের এই চাকরী-রূপ দুর্য্যতির কারণ, তাই তাহাকে অজ্ঞান গালি দিল। কেহবা শ্রামসুন্দরকে দেখিয়াই তাহার প্রতি মায়ের যত্নহীনতার সমস্ত চিহ্নগুলাই দেখিতে পাইল। তাহার মুখ শুষ্ক, কেশকৃষ্ণ, গায়ে ধূলা—মহামায়ার মায়ার নিদর্শন বালকের অঙ্গের কোন স্থানে দেখিতে পাইল না। কাজেই সমতাহীনা মহামায়া তাহাব কাছে হুইটা তিরস্কার খাইল। গ্রাম্যকুলকামিনীগণের এইরূপ অশাচিত আদরের ভিতরে পড়িলে, অতি বড় বুদ্ধিমতীও আত্মাহ্বান হইয়া যায়, কিন্তু মহামায়ার এবারে বড় তাহা হইল না। তাহার হুই চারি দিনের ব্যবহারেই প্রতিবাসিনীগণ বুঝিলেন,—‘এই আটবৎসরের ভিতরে মাগী কেমন আর এক রকম হইয়া গিয়াছে।’ কেহ কেহ বলিল,—“সাহেব বিবির সঙ্গে থাকিয়া ও তাহাদেয় ধরণ দেখিয়া মহামায়ার ভিতর হইতে হিন্দুয়ানি লোপ পাইয়াছে। মেজাজ সাহেবী হইয়াছে। লোক দেখান একটা নমস্কাবৎ করিতে হয় তাই করিল, প্রাণে আর ভক্তি নাই। নহিলে মাগীর হাত হইতে আর জল গলে না কেন?”

আসল কথা বহুদিন হইতে স্বাধীনতা ভোগের জন্য না থাকায় কৃষ্ণধন মহামায়ার কিছু বাধবাধ গৈকিতে লাগিল। তাহার উপর মহামায়া স্থির করিয়াছিল, স্বামীর অনুমতি ভিন্ন কোন কাজ করিবে না। কাজেই কর্তব্যাকর্তব্য নির্ধারণের জন্ত তাহাকে কথায় কথায় স্বামীব কাছে ছুটিতে হইত। ক্রয়ের কথায়, দানের কথায়, লোকতার কথায়, গৃহধর্মের প্রতি কথায় মহামায়া স্বামীব কাছে অনুমতি চাহিতে লাগিল। তাহাব অনুমতি গ্রহণের আলায় অস্থির হইয়া, কৃষ্ণধন মহামায়াব হাত হইতে কর্তৃত্ব কাড়িয়া লইবার ভ্রম দেখাইলেন। বলিলেন, “তোমার যাহা ভাল বিবেচনা হয় করিবে, আমার অনুমতি লইবার অপেক্ষা করিও না।”

মহামায়া এই সময়ে স্বামীকে পথে পাইল, বলিল,—“হিন্দু ধর্মের স্ত্রী—স্বামীব আদেশ পালনই যদি তার ধর্ম, তাহা হইলে মহামায়া স্বামীর কোন আদেশ পালন করিবে?—সেই তখনকার না এখন কার?”

মহামায়ার কথা শুনিয়া কৃষ্ণধনের সেই আটবৎসরের আগের কথা মনে পড়িল। কৃষ্ণধন বলিলেন,—“স্বামী যখন যেমন আদেশ করিবে তাহাই পালন কব, ধর্মে পতিত হইবে না। আগে তোমাকে অনুমতি লইতে আদেশ করিয়াছিলাম, এই আটবৎসর তুমি পালন করিয়া আসিতেছ; এখন আবার অনুমতি লইতে নিষেধ করিতেছি, তুমি অসঙ্কোচে নিষেধ মানিয়া চলিয়া যাও।”

“যদি আবার তোমাকে বিপদে ফেলি?”

“কেন আমাকে কি বিপদে ফেলিতেই শিখিয়াছ! তুমি যা ইচ্ছা কর। তার জন্ত যদি বিপদেই পড়ি, তোমাকে তিরস্কার খাইতে হইবে না। আমার বিশ্বাস স্বামীগতপ্রাণা মহামায়া যদি স্বামীর আদেশে বিপদও ডাকিয়া আনে, তাহাতে কৃষ্ণধনের শূভ ভিন্ন অশুভ হইবে না।”

মহামায়া। দেখ এখনও বুঝিয়া বলা

ককণ্ড ভাবিয়াছি বলিয়াছি ।

স্বামীঃ এই শেষ কথাটার মহামায়ার বড় লাইন হইল। সে আর কোনও উত্তর না দিয়া স্বামীকে একটা গড় করিল।

ককণ্ড ভাবিয়াছিলেন, মহামায়ার যখন কোম্পানীর কাগজ হইয়াছে, তখন নগদ টাকা সব উড়াইয়া দিলেও খাইনাব পরিবার কষ্ট হইবে না। মহামায়াও ভাবিয়াছিল, স্বামী যত কেন বলুক না, যখনই একটু গোলমাল ঠেকিবে, তখনই তাহাকে জিজ্ঞাসা করিব। আপনার মনে যা' খুসী তাই করিয়া মহামায়া বড়ই কষ্ট পাইয়াছে।

নিষাপাঠকারিণীর চক্ষে এ স্থানটায় কেমন কেমন ঠেকিতে পারে। কিন্তু কি করিব? এক একটা জ্বীলোকের সেই সেকালের নজ্জ, এই একালের কেমন একটা স্বভাব যে, সুবিধা পাইলেই কৰ্ত্তাটাকে একটা আধটা প্রণাম করিয়া বসে, নানারকম পড়িয়া ভালবাসার সাম্যভাবটা বিশেষ করিয়া বুঝিয়াও তাহাদের জ্ঞান জন্মে না। পাঁচ জনের দেখিয়া শুনিয়াও তাহারা শিখিতে পারে না। স্বামী-বেচারীর তাহাতে বড় বিশেষ লাভ নাই, বরং সমানে সমান হইলে, প্রাণপ্রতিমার আদব আবাদাবে ছই একটা তর্ক বিতর্ক চলিতে পাবে। কিন্তু ওই একটা আধটা প্রণামের নেশায় পড়িয়া তাহাকে বিষম দায়ে ঠেকিতে হয়। জেলাব বড় হুজুরের, জমীদার বেচারাদের নিকট প্রার্থনাটা যেমন আদেশের পিতামহী, দেখিতে বুদ্ধিহীন, কিন্তু কার্যতঃ সূচতুবা নীতিজ্ঞার বেলায়ও ঠিক তাঁই। স্বামীর সহিত সমান পদবীরূঢ়া কোন পাঠিকা ঠাকুরাণী, আশ্রম পর্যন্ত যদি জীবনের সঙ্গীটির নিকট হইতে সমস্ত প্রাণ্য-যজ্ঞ আদায় করিতে অসমর্থ হইয়া থাকেন, তাহা হইলে প্রভুকে এই প্রণাম ঐষ্যটা একবার সেবন করিয়া দেখিবেন। বকেয়া বাকী শুদ্ধ আদায় হইয়া আসিবে। স্বামীটা বোলআনা রকমেই আত্মত্যাগীনে আসিবে। তবে সেটা করিতে হইলে, আগে আত্মসন্তি-মানসী ত্যাগ করিতে হয়। কিন্তু হায়! এখন এত অগ্রসর হইয়া

তাঁহা কি কখন করা যায়। অভিমান ত্যাগ—তাহারিবে হে
স্বামীন! তোমাকে শ্রীকৃষ্ণার অর্পণমাত্র করিলাম।

মহামায়ার অভিমান রাখিবার সম্পূর্ণ অধিকার ছিল। কৃষ্ণধন
কোন দেশে বাস করিত,—সে হট্টমালার দেশের গাই বাছুরে
মাটি চবিত, কি লোকে হীরার ছাইয়ে দাঁত ঘষিত, কি প্রতি
গৃহস্থের ঘরে কুইমাছ ও পটোল ভারে ভারে আদিত, মহামায়া
কিছুই জানিত না। এমন সময়ে তাহার বিবাহ হইয়াছিল।
শুদ্ধ তাই নয়, তাহার পিতৃগৃহ হইতেই কৃষ্ণধন মাতুষ হইল,
তাহার আদবের অর্দ্ধেক কাড়িয়া লইল। হট্টমালার দেশ, তাহারই
পিত্রালয়েব প্রাচীর বেষ্টিত প্রাঙ্গণ মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া সেই
স্থানেই রাজত্ব কবিতো লাগিল। এমন কৃষ্ণধনের উপর এক আধ
দিন আদেশ করিবার, কিম্বা একটু আধটু অভিমান দেখাইবারও
কি অধিকার মহামায়ার ছিল না?—অধিকার সম্পূর্ণই ছিল।
আর সে অধিকার দেখাইলে, কৃষ্ণধন সহিতে পাবিত কিমা কে
বলিতে পারে? দারিদ্র্যানিপীড়িত, পরানভোজী, পবাবসখশায়ী
আবার গর্ক কি? গৃহজামাতাব সমস্ত লক্ষণাক্রান্ত হইলেও কৃষ্ণধন
মহামায়ার পিতার কাছে এক দিবসের জন্তও অনাদবপ্রাপ্ত হইলেন
নাই। সেই সে কালের ব্রাহ্মণ, কুলীন জামাতার মর্যাদা
রাখিয়াই শুধু নিশ্চিন্ত হইলেন নাই। মহামায়াকে এমন শিক্ষার
শিক্ষিতা করিয়াছিলেন, যে আজও পর্যন্ত মহামায়া স্বামীর উপর
অভিমান করিতে শিখিল না। মহামায়া বুঝিতে পারিলেন যে,
তাহার পৈত্রিকধনে তাহার কি অধিকার ছিল। হুই এক পয়সা
খরচ করিতে ইচ্ছা করিলে, সেই কৃষ্ণধনের মুখ চাহিয়াই থাকিতে
হইত। বাপের কাছে চাহিলে পাইত না। কিন্তু বুঝিতে পারিত
না, কৃষ্ণধন কোথা হইতে পয়সা পাইত। মহামায়া স্বত্ত্বালয়ে
আসিবার জন্ত কৃষ্ণধনকে অনুরোধ করিত, বিশ্বাস ছিল সেখানে
বাইলেই মনের মত খরচ করিতে পারিবে। কিন্তু জানিত না
যে, সে হট্টমালার দেশে, স্বামীর এমন একটা তরতলও নাই যে,

অমল কৃষ্ণধনে মুহূর্তের জল্পে যৌবনের আক্রমণ হইতে বাধাটাকে রক্ষা করিতে পারে। মহামায়ার পিতা কল্লার অভিজ্ঞতার অবগত হইয়া কৃষ্ণধনের গ্রামে একটি ছোট অথচ সুন্দর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া এবং দৌহিত্র শ্রামসুন্দরের অন্নপ্রাশন উপলক্ষে সে গ্রামের সমস্ত লোককে পরিতোষ করিয়া খাওয়াইয়া দেন। মহামায়া সেই প্রথম শিশুর গৃহে আসিল। আসিয়া দিন কয়েক মনের মত খরচ করিয়া বাচিল। আর বুঝিল, এমন শিশুর ঘর থাকিতে এতকাল বাপের বাড়ী পড়িয়াছিলাম কেন?—মহামায়া বাপের বাড়ী আর বড় একটা বাইতে চাহিত না। তাহাতে মহামায়ার পিতা মাতার আনন্দের সীমা ছিল না। কালে যখন মহামায়া স্বামীর অবস্থার কথা সমস্তই জানিতে পারিল, তখন তাহার হৃদয়ের স্তরে স্তরে ভক্তি গাঁথিয়া গিয়াছে।

কাজেই নব্যাপাত্রিকা ঠাকুরাণীদের কাছে হৃদয় দৌর্জল্যের পরিচয় দিয়া, মহামায়া স্বামীকে চিপ করিয়া একটি নমস্কার করিয়া বসিল। উঠিয়া বলিল,—“যেমন তুমি আমাকে আমার অনিচ্ছায় স্বাধীনতা করিলে, আমিও তেমনি জব্দ করিয়া তোমাকে প্রতিশোধ দিব। তোমাব সব টাকা খবচ করিব, তবে ছাড়িব।”

মনে মনে বলিল, তুমি যেমন ক্রুপণ, আমি তার শতগুণ ক্রুপণতা দেখাইব। তোমাকে ধানে চালে খাওয়াইব। কৃষ্ণধনের প্রাণটা নমস্কারে থুলিয়া গেল। কৃষ্ণধন আবার বলিলেন, “শুধু তাই কেন মহামায়া, এতকাল তোমার উপর কর্তৃত্ব করিয়াছি, আজ হইতে সেই কর্তৃত্বভাব তোমার উপরে দিলাম। আজ হইতে আমি তোমার আজ্ঞাব্যবর্তী হইলাম।”

(৫)

মাস ধানক মহামায়া চূড়ান্ত গৃহীপীপণা দেখাইল। মহামায়ার হাত হইতে যথার্থই জল গলিল না। প্রতিবেশিনীগণ, বাহারা মহামায়ার মুখ দেখিত, তাহার মুখের হুটী কথা শুনিতে সকল কাজ কেলিয়া তাহার কাছে ছুটিয়া আসিত, তাহারা এখন

মহামায়ার মুখ দেখিয়া অন্নভাবে আশঙ্কিত লাগিল। কথায় কর্কশতা অনুভব করিল। ক্রমে তাহাবা মহামায়ার কাছে আসা বন্ধ করিল। তাহাতেও যখন তৃপ্ত হইল না, তখন একত্র বসিয়া মহামায়ার স্বভাবের পবিবর্তন সম্বন্ধে নানাবিধ জল্পনা আবিস্তর করিল।

বর্তমান রূপগতায় সকলেই প্রথমে দুঃখ করিল। দুঃখ ক্রমে রাগে পবিণত হইতে লাগিল। রাগ হইতে গালি আসিল। সকলে একবাক্যে বর্তমান মহামায়ার মুখে অগ্নিদেবেব আবাহন কবিল। আর তাহারা যে মহামায়ার কাছে যাইয়া তাহার চতুর্দশ পুরুষের ভাগ্যের প্রতিষ্ঠা কবিত, এটাও পবস্পবকে বিশদরূপে বুঝাইয়া দিল। তাহাদেব মধ্যে কাহাবও কাহ্নারও চরণধূলি স্পর্শ কবিয়া কত রাজনন্দিনী আপনাদিগকে ভাগ্যবতী বিবেচনা কবিয়াছিল ও তাহাদিগের আদব যত্ন উপেক্ষা কবিয়া, নিজ নিজ পর্ণকুটীবে ফিবিয়া তাহাবা নিস্পৃহতাব পবাকান্ধা দেখাইয়াছিল, এটাও বমণী-কুলমধ্যে কাহাবও বুকিতে বাকী বহিল না। মহামায়া এখন এমন হইয়াছে, মহামায়া আগেই বা কি ছিল। বর্তমান মহামায়াকে ছাড়িয়া তাহাবা অতীত মহামায়াকে ধবিয়া বসিল। ক্রমে তাহারও মুণ্ডপাত কবিল। শেষে তাহাব রূপেব, গুণেব, স্বভাবেব, বংশের অসংখ্য অসংখ্য দোষ বাহিব কবিয়া তবে নিশ্চিত হইল। সেই মহিলাকুলমধ্যে দুই একজনের পবস্পবেব মধ্যে বিবাদ ছিল। এক মহামায়ার কল্যাণে তাহাদেব সেই পূর্ব বিবাদ মিটিয়া গেল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকীবোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

বিলাসিনীর আত্মবিলাপ।

১

বিলাসিনী মোর নাম হৃদয় শশান,
বিলাস-কলুষ-বিষ হৃদে পায় স্থান ;
কলিজা ভেঙ্গেছে মোর,
ঝবে সদা অঁঠি লোর,
তথাপি আছে গো বন্ধুধেছি পরাণ।

২

সিঁথিতে সিন্দূরবিন্দু করেতে কঙ্কন,
কিসের অভাব মোর পরেছি ভূষণ ;
তীব্র করালের রেখা,
দিয়াছে আননে দেখা,
তথাপি নূতন রাগে রঞ্জিত আনন।

৩

নিত্যনবসাজে সাজি ফুলদিগো মাথে,
প্রাণতসাজেনা মোর তাবসাথেসাথে ;
নলিনাক্ষ আর নাই,
তথাপি কটাক্ষ চাই,
সোহাগের সোহাগিনী-তবুপথেপথে।

৪

ছিলাম রমণী আমি স্বভাব সুন্দরী,
আজি হেয়, হুণ্য আমি নাম বারনাবী,
নাহি মৃৎ মৃৎ হাসি,
যা দেখ এ বাসিহাসি,
জাগরণে হরে প্রাণ নিত্যবিভাবরী।

৫

মধু আশে আসে কাছে মত্তমধুকর,
মনে করে আমি বুঝি মধুর আকর,
মধুচক্র ভেঙ্গে গেছে,
ছলমাত্র তার আছে,
ফিরে বাও মধুলোভী মধুপনিকর !

৬

কেহ আসে প্রেমআশে কোথা দরশন,
হে প্রেম ! অনন্তমৃত-সঞ্জীবনী-ধন !
হৃদে মোর নাহি বাহা,
কেমনে প্রদানি তাহা ?
ফিবেষাও স্থানান্তবে প্রেমিকহুঙ্কন !

৭

প্রাণপতি সহবাসে প্রাণের নন্দন,
অঙ্কেতে পাইয়া বালা প্লবিতমম ;
কি কঠিন মম হিয়া,
দেখ মনে বিচারিয়া,
জননী হইলে বধি সম্মানে আপন !

৮

আছে কি গো মমসম পিশাচীললনা ;
ধাতার এধরা-মাঝেদিতে গো তুলনা ?
প্রেমিক রে ফিরে যাও,
পাতকীবে ভুলে যাও,
মায়াবিনী ছদ্মবেশা রাক্ষসী ভীষণা।

৯	১০
হে কুলকামিনী শুন মোর নিবেদন, পতিব্রতা সতী সাক্ষী সীমস্তিনীগণ; ভালবেসো প্রাণনাথে, রবে সদা সাথে সাথে, দেখোজেনোনাহিকাড়েপ্রাণেরবতন।	হে যৌবন উদ্বেলিত ভাসমান জন, উচ্ছিন্নরূপের মোহে ভুলনা কখন; ঘরেতে পাইবে যাহা, কোথায় নাহিক তাহা, পবিত্র প্রেমের থনি অঙ্গনা আপন।

ঐকিরণচক্রে দত্ত ।

চিন্তা ।

স্নায়ু বিধানের ক্রিয়াকে “চিন্তা” বলা হয়। স্নায়ু আমাদের দেহস্থ দ্রব্য বিশেষ,—কিন্তু উহার ক্রিয়া বা খেলা দেহস্থ দ্রব্য নহে; এই জন্ত চিন্তা আমাদের বাহিরের দ্রব্য।

উদ্ভিজ্জ বিজ্ঞা দ্বারা আমরা জানিয়াছি যে, ফুল যে দ্রব্যের উপর উপবিষ্ট থাকে, তাহাকে “বৃত্তি” বলে, পুষ্পের নিম্নে যে অংশটুকু তাহাকেই বৃত্তি কহে। আমাদের মন যে অংশের উপর অবস্থিতি করে, তাহাকেও আমরা “বৃত্তি” বলিয়া থাকি। এখন দেখা যাউক, মন আমাদের কোন বৃত্তির উপর অবস্থিতি করে।

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ ও মাৎসর্য এই পাঁচটি আমাদের মনের মূলবৃত্তি। অর্থাৎ জগতের সমুদয় মানবের মন এই পাঁচ বৃত্তির উপর অবস্থিত। যে যাহা “বলে” তাহা এই পাঁচ বৃত্তির রংগে বলিয়া থাকে। ভগবান রামকৃষ্ণ বলিয়াছেন “যে মূলা খায়, তাহার মূলার ঢেকুর উঠে।” বস্তুতঃ ঐ পাঁচটি বৃত্তির তারতম্যানুসারে যাহার হৃদয়ে যে বৃত্তির খেলা অধিক হইয়া থাকে, সে সেই বৃত্তি অনুসারেই কথা বলিয়া থাকে। মানুষ বৃত্তি ছাড়া

কথা বলিতে পারে না! বাহার বৃত্তি নাই, সে জগতেও নাই, সে মরা! এই জগতই সাধক শ্রেষ্ঠ রামপ্রসাদ সেন বলিয়া গিয়াছেন,—“বৃত্তির নাশকেই মরণ বলে।”

মানুষের বৃত্তি একটা! সেই বৃত্তির নাম “চিন্তা” বা ভগবান অথবা চিন্তামণি! তবে পাঁচটা বৃত্তির কথা পূর্বে বলিলাম কেন? তাহাই এক্ষণে বলিতেছি। যদি আমাদের পাঁচটা বৃত্তির উপর মন বহিল, তাহা হইলে, আমাদের ঈশ্বরের প্রয়োজন হয় না। ঐ পাঁচটা বৃত্তি ছাড়া, এমন একটা মনের অবস্থা আছে যে, সেই অবস্থাকেই ঈশ্বর বলা হইয়া থাকে। যেমন সাতটা রংয়ের উৎপত্তি স্থান সাদা! সেইরূপ আমাদের ঐ পঞ্চবৃত্তির উৎপত্তি স্থান সাদা! অথবা উদ্ভিজ্জ জগতের দিকে দৃষ্ট করিলে, আমরা দেখিতে পাই যে, পুষ্প যে বৃত্তির উপর অবস্থিতি করে, তাহার কোনটা পঞ্চভাগে বিভক্ত, কোনটা দুইভাগে কিম্বা ততোধিক ভাগে বিভক্ত; কোনটা বা অখণ্ড! যেমন গোলাপ পুষ্পের বৃত্তি কতকগুলি চির দ্বারা স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। কিন্তু ধূতুরা ফুলের বৃত্তির চির নাই, উহা অখণ্ড! এই অখণ্ড বৃত্তি বলিয়াছি, এই পুষ্প আমাদের দেবাদিদেব মহাদেবের প্রিয় বস্তু। যাহা হউক, গোলাপ ফুলের বৃত্তি ৪।৫ খণ্ডে বিভক্ত হইলেও উহা যে একটা বৃত্তি ভিতর হইতে চিরিয়া হইয়াছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়, সেইরূপ আমাদের মনের পাঁচটা বৃত্তি এক অদ্বিতীয় মনের ৪।৫ টি চিরমাত্র।

সাদা রং হইতে সাতটা মূল রং পাওয়া যায়, তাহার মিশ্রণের ভারতম্যা, অর্থাৎ ভাগের ইতব বিশেষ করিয়া নিশাইলে, তাহা দ্বারা নানাবিধ নূতন নূতন বর্ণের উৎপত্তি হয়। এই নূতন নূতন মিশ্রিত বর্ণকে উপবর্ণ বলা যাইতে পারে। সেইরূপ আমাদের পাঁচটা মূল বৃত্তির মিশ্রণে নানাবিধ নূতন নূতন বৃত্তি হইয়াছে, এই মিশ্রিত বৃত্তিকে “প্রবৃত্তি” বা উপবৃত্তি বলা যাইতে পারে। যেমন ২ ভাগ ক্রোধ এবং ২ ভাগ মোহ (মোহ

অর্থে মায়া বা স্নেহ) মিলিত করিলে, “তিরস্কার” নামক উপবৃত্তির উৎপত্তি হইয়া থাকে। অর্থাৎ সদ তিরস্কারের ভিতর “ক্রোধ এবং মোহ” বৃত্তির মিশ্রণই দেখিতে পাওয়া যায়।

“দয়া” ইহা একটা মানুষের উপবৃত্তি বা প্রবৃত্তি, ইহার ভিতর মোহ (মোহ অর্থে স্নেহ বা ভালবাসা) ৩ ভাগ, বিমুগ্ধ কাম (কাম অর্থে কৰ্ম বা ধর্ম) ১ ভাগ, পাওয়া গিয়া থাকে। এইরূপ ভাবে প্রবৃত্তিগুলির ভিতর ইচ্ছা করিলে মূলবৃত্তির বিকাশ সকলেই দেখিতে পাইবেন।

বৃত্তিগুলির মিশ্রণের তারতম্যে একটা একটা মূলবৃত্তি অর্থাৎ প্রত্যেক মূলবৃত্তিগুলি নানাবিধ আকার ধারণ কবিয়াছে। বিশেষতঃ দেশ কাল পাত্রানুসারে এক মূলবৃত্তি কোথাও স্নিগ্ধভাব, কোথাও মধুরভাব, কোথাও ভক্তিবাবে দেখা গিয়া থাকে। সূর্য্য যখন উদয় হয়, তখন তাঁহাব কিরণ বড়ই স্নিগ্ধ—বড়ই সুন্দর! আবার ঐ সূর্য্য যখন দেশ কালানুসারে মধ্য গগনে উপস্থিত হয়েন, তখন সেই এক অদ্বিতীয় সূর্য্যকিরণের উগ্রমূর্ত্তি হইয়া থাকে। যদি বল “কাছে” এবং “দূরে” বলিয়া এরূপ হইয়া থাকে। সূর্য্য হইতে পৃথিবী যখন দূবে থাকে, তখন তাঁহাব স্নিগ্ধমূর্ত্তি; এবং পৃথিবী যখন তাঁহাব নিকটে যায়, তখন সূর্য্যকিরণ পৃথিবীতে বেশী পড়ে বলিয়া, তাঁহার উগ্রমূর্ত্তি। ইহা বলিলেও আমরা এক অদ্বিতীয় সূর্য্যকিরণ যে দেশ কাল পাত্রানুসারে দুইভাবে উপলব্ধি কবি, ইহা সত্য! “উগ্র” এবং “অনুগ্র” ভাব যে সূর্য্যকিরণে আছে, তাহা নিশ্চয়ই। তেমনি এক মূলবৃত্তি ধরন,—“মোহ” মোহ অর্থে ভ্রম; ভ্রম অর্থে ভুল বা মায়া, মায়া অর্থে স্নেহ, স্নেহ অর্থে ভালবাসা; এই ভালবাসা বা মোহ বৃত্তিটী দেশ কাল পাত্রানুসারে কিরূপ মূর্ত্তিধারণ করে দেখুন।

সন্তানের উপর ভালবাসা আছে, সে ভালবাসার নাম স্নেহ; পিতাব উপর যে ভালবাসা তাঁহার নাম ভক্তি, স্ত্রীর উপর যে ভালবাসা তাঁহার নাম প্রেম বা পিরিত, স্নেহ, ভক্তি এবং প্রেম

এক অদ্বিতীয় মোহবৃত্তি অর্থাৎ ভালবাসা হইতে হইলেও উহাদের মূর্ত্তি স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। ঐ সকল মূর্ত্তির ভিতর কোথাও ভয় মিশ্রিত, —ভালবাসা, কোথাও ককণা মিশ্রিত ভালবাসা, কোথাও বিনিময় ভালবাসা ইত্যাদি মিশ্রিত ভাবে থাকে বলিয়া ঐগুলিকে “প্রবৃত্তি” বলা যাইতে পারে। বিনিময়ের ভালবাসাকেই “স্বার্থ” প্রবৃত্তি কহে। জগৎ বিনিময়েব ভালবাসাতেই চলিতেছে। অতএব এখানে স্বার্থ শূন্য জীব নাই।

(ক) বৃত্তি প্রবৃত্তি ছাড়িয়া মানুষ যেমন কথা কহিতে পারে না, সেইরূপ স্বার্থ ছাড়িয়া, মানুষ কার্য্য করিতে পারে না। পিতা মাতা স্বার্থের জন্ত পুত্রপালন করে; গৃহস্থেরা স্বার্থের জন্ত বিড়াল পুষে,—পাখি পুষে,—কুকুর পুষে; সেইরূপ স্বার্থের জন্ত পিতা মাতার সম্মান পুষিয়া থাকে। মাষ্টার স্বার্থের জন্ত ছেলে পড়ায়! রাখালেকা স্বার্থের জন্ত গরু মাঠে লইয়া যায়। অনেকের পিতা বিবাহের সময় ছেলের দর বাড়িবে বলিয়া, ছেলেকে পাস কবাইয়া থাকে। অর্থাৎ ছেলের গায়ে বিড়ার মার্কা মাঝিয়া দেন। ঝাঁকাবা মার্কা দেখিবা মন্দ জিনিষও ভাল বলিয়া লয়েন, তাঁহারাই “মার্কা” মাঝা বিড়া ভালবাসেন। মার্কা মাঝা বিড়াই হইল অসম্ভ্যাক্রম প্রবৃত্তিব জীবন।

“ক” চিহ্নিত প্যাবাটীর মধ্যে যে কথা বলিলাম ঐ কথা-গুলিও ভিতর “আমার” কোন বৃত্তি বা প্রবৃত্তি লুকাইত আছে, বাছিয়া বাহির ককন! উদাহরণের জন্ত ঐ প্যাবাটী দেওয়া হইল।

যাহা হউক, বৃত্তি প্রবৃত্তির তারতম্য যেমন এক ভালবাসার নানামূর্ত্তি হইয়া থাকে, সেইরূপ মানুষের সমুদয় বৃত্তি প্রবৃত্তি একরূপ নহে,—স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র। যেমন স্বার্থমিশ্রিত দয়া; প্রেমমিশ্রিত দয়া, ইত্যাদি নানাবিধ দয়ার অবস্থা আছে। এই বিভিন্ন অবস্থা-গুলি এক একটী স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র রূপ বলিলেও অত্যাশ্চর্য্য হয় না। সেইরূপ এক “সত্যের” নানাবস্থা! সূর্য্যাকিরণ নিশ্চয় ইহা সত্য, এবং উহা “উগ্র” ইহাও সত্য। মদ খাইয়া লোকে স্বাধীন

নষ্ট করিতেছে, ইহা সত্য ; আবার মদের দ্বারা মানুষের জীবন রক্ষা হইতেছে, ইহাও সত্য ! এখানে বেশ বোধ হইতেছে যে, এই অবস্থার দুইটা পৃথক পৃথক সত্য ! বিকারে বোগীকে মদের দ্বারা নাড়ী রক্ষা কবান হয়,—অতএব তখন সে মদের উপর নির্ভর করিয়াই জীবিত থাকে ; ইহা সত্য ! আবার মদে নির্ভর কবিয়া, অনেকে দরিদ্র হয়, ইহাও সত্য । কিন্তু এই দ্বিবিধ সত্যের ব্যবহার শিক্ষা করাই আমাদের কর্তব্য, তাহা হইলে, আমবা সত্য দ্বিবিধ হউক, আব দশবিধ হউক, আমরা তখন এক অদ্বিতীয় সত্যে উপনীত হইব ।

চিন্তাব বুকিলাম কি ? কিছুই না । নদীর হইদিকে কূল মধ্যে জল । কিন্তু চিন্তাব মধ্যে একটু বৃল,—আব হুইদিক ফাঁকা, কূল নাই,—অকূল । চিন্তা করিতে কবিতে যে স্থানে একটু দাঁড়াই, একটু বিশ্রাম কবি, সেই টুকুৰ চিন্তার কূল,—সেই টুকুৰ নাম বিশ্বাস !

পদার্থ কি ? ইহা লইয়া যদি আমবা চিন্তা কবি, তাহা হইলে, কেহ বলিবে, “শব্দবাচ্য” যাহা, তাহাকেই পদার্থ বলে ; অচ্ছা, অশ্রুতি তাহা হইলে কোন পদার্থ ? পাশ্চাত্য বিজ্ঞান বলিল, তাহা নহে, যাহা ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য তাহাই পদার্থ । আব এক জন বলিল “তাহা হইলে মনটা কোন পদার্থ ? উহাকে ত ইন্দ্রিয়ের উপলব্ধি কবিতে পাবে না । অথবা যে উপলব্ধি করে সে তাহা হইলে কি ?” আব একজন বলিল “পদের অর্থকে” পদার্থ বলে । তাহা হইলে, “আকাশ কুসুম” পদের অর্থ কি ? কিছুই না । অতএব উহা “কিছুই না” পদার্থ ! এইরূপ বাব কতক ঘুবিয়া ফিবিয়া, বাব কতক “তা’রপর” “তা’বপর” কবিয়া চিন্তা এমন স্থানে গিয়া দাঁড়াইল, যে সে কূল ছাড়িয়া অকূলে মিশাইল ; মানুষও চূপ কবিল । কিন্তু ঐকপ কূলহীন মীমাংসা করিলে, বোধ হয় জগতের বিষয় আমরা কিছুই জানিতে পারিতাম না । বিশ্বাস কবিয়া, পদার্থ লইয়া তাহাব গুণধর্ম ইত্যাদি

দেখিয়া, মানুষ তাহা দ্বাৰা অভাবনীয় উপকার প্রাপ্ত হইতেছে। চিন্তা খানিক দূর তোমাকে সঙ্গে কবিতা লইয়া গিয়া, এমন স্থানে তোমাকে ফেলিয়া দিবে যে, সে স্থানে সে আব নিজে ঘাইবে না। “তুমি তখন আত্মা! আব তিনি তখন গোকুলে!” ঠাকুরের কাণ্ডই এটা। সঙ্গে কবিতা সংসারে আনিয়া, এইরূপ ছেড়ে দিয়ে চলে যান।

জগতেব ভিতর ঘাবি। জগতকে চিনিতে পারি নাই। চিন্তার ক্রোড়ে মানুষ হইয়াও চিন্তাকে বুঝিতে পারি নাই। আব, মনের সঙ্গে থাকিয়াও, মনকে পাই নাই। জগতে ইহাপেক্ষা আশ্চর্য আর কি আছে?

চিন্তা, সুখ হুঃখের মাতা! সুখ হুঃখ আব কিছুই নহে; চিন্তাব একদিগেব নাম সুখ, অপরদিকের নাম হুঃখ। যেমন সময়েব একপৃষ্ঠা আলোক বা দিবা এবং অপর পৃষ্ঠা অঁধার বা রাত্রি। সেইরূপ চিন্তাব এক পৃষ্ঠাব নাম সুখ! পব পৃষ্ঠাব নাম হুঃখ। বাহাব যেমন চিন্তা, তাহাব সেইরূপ সুখ হুঃখ! চিন্তাকে ভাল রাখ, সুখে হুঃখে ভাল থাকিবে। দয়াময় বানরুথ। আমা-
দেব চিন্তাকে ভাল কব। “গুহচিন্তা” দাও। প্রভো! এই প্রার্থনা আমবা কবিতৈছি;

শ্রীবাজকৃষ্ণ পাল।

ললনা-মহিমা।

[পূর্ক প্রকাশিতের পব]

২৫

রস্তোক রমণী মবি গুণ নিতম্বিনী!	নাতিদেশে নাতিপদ্য আহা কি সুন্দব!
কনক মেখল'মালা,	ছডায়ে পাপ্ড়ি গুলি,
কটিদেশে কবে খেলা,	যেন ফোটে ফুলকলি,
নড়ে চড়ে ঝলসিছে যেন সৌদামিনী!	অলিছোটে ভ্রমে পড়ে মরি মনোহব।

২৭

পৃষ্ঠদেশে লক্ষ্যমান কাল-ভুজঙ্গিনী,
ধাইছে লম্বিত বেণী,
চুম্বিতে চরণ ধনি,
অথবা বিবর খোঁজে ভূমেতে ফণিনী।

২৮

যমুনীর হৃদিভাব হৃদে না কুলায়,
বুক খানা ফুলে ওঠে,
যেন যুগ্ম তুবড়ি ফোটে,
ঋণশীব হৃদিমাঝে যেন হিমালয় !

২৯

ঝন্ ঝন্ নির্ঝাবিলী অনন্ত ধারায়,
ঢালিতেছে পরোধাবা,
জীবনাম্বু, জীবধাবা,
পরিতৃপ্ত জীবগণ যাহে গো তৃষায়।

৩০

অথবা পূর্ণিমা দিনে অনন্ত জলধি,
ফেঁপে ওঠে অম্বুবাশি,
ছুটে যায় দশদিশি,
উর্ঝরা কবিছে ধবা বিপুলাবাধি !

৩১

মরি মরি হে বমণি ! এত জীবরাশি,
কোথায় পাইলে তুমি,
পবিত্রপ্ত বিশ্বভূমি,
মূঢ় আমি গুণগান কেমনে প্রকাশি ?

৩২

কে ঢালিল ক্ষীরধারা তব হৃদিমাঝে,
বুঝেছি বুঝেছি বালা,
কা'র এই মহাখেলা,
ক্ষীর-সিঁদু-শায়ী যিনি অনন্তেবিরাজে !

৩৩

দাও হে বরুণাসিঁদু ! ক্ষমতা আমায়,
বর্ণিতে সুন্দর সৃষ্টি,
থাকে যেন তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,
পারি যেন সাজাইতে লাবণ্য-বালায়।

৩৪ [পাশে ?

বমণি বে ! কেনা বন্ধ তো'র বাহু
স্বকোমল বাহুলতা,
হবে নর হৃদি ব্যথা,
ধরায় সকলি ব্যগ্র তো'র পাণিআশে।

৩৫

যখন বিবাহে নর ধবে পাণিতল,
পবশে অঙ্গুলিগুলি,
ছোট বড় চাপাকলি,
তুচ্ছ তা'ব এ সংসার যা'ক রসাতল।

৩৬

কিবা কন্মুকণ্ঠে মবিদোলে মণিমালা !
হৃদি ফল ঢল ঢল,
তা'য় শোভে মুক্তাফল,
বিশ্ববিমোহিনী মরি যৌবনের খেলা।

৩৭ [আলিঙ্গিতে,

কা'র না আছে গো সাধ তো'রে
তো'রে যদি হৃদে পায়,
স্বর্গ-সুখ ভুলে যায়,
যুড়া'বার তুই মাত্র স্থল অবনীতে ।

৩৮ [ছবি?

কেমনে চিত্রিব আমি তো'র মুখ
জগৎ ব্রহ্মাণ্ড মাঝে,
সে উপমা কোথা' রাজে ?
ছুমিই উপমা তব এ জগতে দেবি !

৩৯

কবির কবিতা তব খুঁতি মনোহর,
তদুপবি ওষ্ঠাধর,
লালে লাল সে অধর,
বক্তিম তাবুল বাগে ভুলে আছে নব !

৪০ [ধবে,

ফুল কপোলের আভা বাক্যে নাহি
লাবণ্য উথলে যায়,
ফুল গোলাপের প্রায়,
অথবা ললিনী ঘেন কবি হৃদি সরে !

৪১

সুন্দর নাসায় দোলে শুভ্র মুক্তাফল,
আরক্ত হয়েছে হাশ্ব,
কপোলের স্ত-আভার,
গোলাপ কলিকা ঘেন করে ঢলঢল !

৪২

দোছল অলকা' চুল সমীরণ ভবে,
থেকে থেকে ঠোনা মাঝে,
রাজাগালা রাজাক'রে,
মুহুহাসি গন্ধবহে কটু ব্যঙ্গ করে ।

৪৩ [আকব,

সুন্দরি লো ! তোরা অঁখি সৌন্দর্য-
যা' কিছু সুন্দর আছে,
ধাতার এ বিশ্বমাঝে,
সকলি অঁখিতে তোব প্রাণ-মন-হব ।

৪৪

হৃদয়-বারতা তব নয়নেতে লেখা,
কামিনি কটাক্ষ তোর,
ভেঙ্গেছে কলিজা মোব,
অঁখি তোব কথা কয় আছে মোন

৪৫ দেখা ।

নানাকবি নানামতে দেয়লো উপমা,
তোমাবে মৃগাক্ষী কয়,
কিন্তু মৃগ ভুলে যায়,
মোহিনি বে ! হেরে তবনয়ন সুধমা ।

৪৬

কুসুম কুসুম ফোটে কাণে শুনাছিল,
বিকসিত মুখপদ্ম,
অঁখিঘর নীলপদ্ম,
হেরিয়ে নয়ন পথে স্নকবি হাসিল ।

৪৭

কামিনীর কমনীয় কটাক্ষ-কশায়,
 করে না শাসিতে পাবে,
 হেন আছে কে সংসাবে,
 কেনা যুদ্ধ অঙ্গনার অঁথির আভায় ?

৪৮

মদনেব ফুলশর মর্ন্ত্যে যদি থাকে,
 ভুরু-চাপে আছে তোব,
 সে কটাক্ষ প্রাণ চোব,
 যে শর প্রহারে নর পড়েছে বিপাকে ।

৪৯

তুমি যদি অঁথিমুদওলো কুহকিনি !
 অন্ধকার হৃদাকাব,
 ধবা যেন ছাবখান,
 প্রাণেতে ঝটিকা বহে ভবেব ভাবিনি !

৫০

মদালস অঁথি জোর প্রেমে ঢলঢল,
 সে অঁথি দেখিলে পরে,
 ভুলে নর এ সংসারে,
 সুরাপানে মত্ত যেন দেহ টল টল !

৫১ [লোভা,

ললাটে লোহিত-লেখা অতি মনো-
 বালার্ক সিন্ধুর ফাঁটা,
 যেন গো করেছে ঘটী,
 পূরব গগনভালে মরি কিবা শোভা !

৫২

অঁকিমু যুবতী ছবি সাধা অঙ্গসারে,
 যা কিছু বহিল বাকি,
 নিজে পড়িয়াছি ফাঁকি,
 কেমনে চিত্রিবয়ানাহিক অন্তরে ।

বঙ্কিম চন্দ্রের ধর্ম ।

প্রাতঃস্বপ্নীয় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের প্রতিভা সর্কদিকপ্রসারিণী ছিল,—ভাষাসংস্কার কাব্যবচনা উপন্যাসপ্রণয়ন সমাজসংস্কার ধর্ম্মা-লোচনা প্রভৃতি সর্কবিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্র ধীশক্তিসম্পন্ন ছিলেন। পার্শ্ববজীবন সংগ্রামের পর যখন তিনি সর্কদিক হইতে লাফল্যের জয়পতাকা মন্তকে বন্ধন করিয়া জাতীয় কেন্দ্রক্ষেত্রে প্রত্য্যাগমন করিলেন,—তখন তাঁহার সেই অপূর্ব বলবীর্ঘ্য দর্শন করিয়া বিমুগ্ধচিত্ত স্বদেশবাসী, তাঁহার কোন কার্যের প্রশংসা করিবে, তাহা স্থির করিয়া উঠিতে পারিল না। কেহ তাহাকে ভাষা-সংস্কার-কার্য্যে অদ্বিতীয় বলিয়া ঘোষণা করিল,—উপন্যাসরচনার

অপূর্ব কৌশলবিৎ বলিয়া স্বীকার করিল,—কেহ বা তাঁহার ধর্মসম্বন্ধীয় পুস্তকের প্রশংসা করিল! বঙ্কিমচন্দ্র অসামান্য অটলতা হৃদয়ে ধারণ করিয়া স্বদেশের উন্নতির জন্ত—যে নানা উন্নতিসাধন করিবার জন্ত—প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া গিয়াছেন,—ইহা হইতেই তাহা প্রমাণিত হইল। যাহা হউক, অন্তান্ত বিষয় পরিত্যাগ করিয়া বঙ্কিমবাবুর ধর্মমতই বর্তমান প্রবন্ধের উপপাদ্য প্রস্তাব।

আলোচ্য বিষয়ের অবতারণার পূর্বেই প্রশ্ন হইতে পারে,—‘ধর্ম’ শব্দের অর্থ কি? বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টিকর্ত্তা সর্বশক্তিমান সৃষ্টির অতীত কিম্বা জ্ঞানের অন্তর্ভূত যে মহাপুরুষ বিদ্যমান আছেন এবং যাহাকে জগদীশ্বর বলা যায়, তাঁহারই উদ্দেশ্য ভক্তি এবং শ্রদ্ধাকেই “ধর্ম” বলা যায়। এই ধর্মকে দুইভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।—প্রথমতঃ স্বাভাবিক বা মানবীয় ধর্ম। দ্বিতীয়তঃ প্রত্যাাদিষ্ট বা ঐশ্বরীয় ধর্ম। প্রথম ধর্মেবদ্বারা মানব স্বকীয় বুদ্ধি-বৃত্তির সাহায্যে পরস্পরবেব উপকাবসাধনে এবং সামাজিক উন্নতির নিমিত্ত সচেষ্ট হয়,—মানবের উন্নতিব দ্বারা সমাজের উন্নতি, সামাজিক উন্নতি দ্বারা দেশের উন্নতি সাধিত হইয়া থাকে; স্তত্রাং নিষম এবং শৃঙ্খলাস্থাপিত হইয়া, পবিশেষে জগৎপাতাব মহান উদ্দেশ্য সাধিত হইয়া ধর্মকার্য্য নামে অভিহিত হইয়া থাকে। অপব পক্ষে কোনও মহাপুরুষ ধরাতলে অবতীর্ণ হইয়া আপনাকে ঈশ্বরের অবতাব বলিয়া প্রচাব কবতঃ যে সমস্ত উপদেশ দান করেন, সেই উপদেশ সমূহই ঈশ্বরের প্রত্যাদেশ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সেগুলি পুস্তকে স্থায়ীভাবে স্থান প্রাপ্ত হইয়া শাস্ত্র-গ্রন্থ নামে সম্মানিত হয়। প্রায় সকল স্মৃত্যজ্ঞাতিবই মধ্যে এই উভয় প্রকার ধর্ম বর্তমান আছে। দেখিতে পাওয়া যায় আমাদিগের আৰ্য্য-হিন্দুধর্মও সে নিষমেব বহিভূত নহে।

বেদ এবং হিন্দুজাতি অনন্তকাল হইতে জগতে বিদ্যমান ছিল। হিন্দু বলিলেই দেবোক্তনিয়মাবলম্বী ভারতবর্ষীয়গণকে বুঝাইত—এবং একমাত্র বেদই তাহাদিগের শাস্ত্রগ্রন্থ বলিয়া পরিগণিত হইত!

কিন্তু কালমাহাত্ম্যে অধুনা আর তদ্রূপ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না। যিনি বেদকে ব্রহ্মার মুখনিঃসৃত অমোঘবাক্য বিবেচনা করিয়া ভক্তিসহকারে পূজা কবেন, তিনিও হিন্দু—এবং যিনি নবপ্রণালী স্বজন করিয়া হিন্দুসমাজকে আমূল পরিবর্তিত করিয়া ব্রাহ্মণ শূদ্রের ভেদাভেদ বাধিতে চাহেন না, তিনিও হিন্দু। স্মরণ্য শাস্ত্রমতে এক্ষণে কে হিন্দু, কে অহিন্দু, তাহা স্থির করা অসম্ভব।

যাহা হউক, প্রাচীন হিন্দুধর্মপ্রণালী বর্তমান সময়ে আচরিত ধর্মপ্রণালীতে পর্য্যবসিত হইয়া ধীরে ধীরে যে বহু পরিবর্তিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। বৌদ্ধ ও মুসলমান ধর্মের সংঘর্ষে শঙ্কবাচার্য্য প্রভৃতি সংস্কারকদিগের অভ্যাসে এবং অন্ত্যস্ত নানাকারণবশতঃ হিন্দুধর্মের পৌরাণিক উদারতা অনেক সঙ্কীর্ণতালাভ করিয়াছিল।

আলোচ্য প্রস্তাবের অন্তর্গত নহে বলিয়া, হিন্দুধর্মের এবং সমাজের ক্রমিক অধঃপতন বর্ণনা কবিতে প্রবৃত্ত হইলাম না। অষ্টাদশ খ্রীষ্টাব্দির প্রাবল্যে যখন সপ্তসমুদ্র ত্রয়োদশ নদী উত্তীর্ণ হইয়া বণিকবেশী ইংবাজগণ ভারতবর্ষে পদার্পণ করেন, তখন লোকে বেদোক্ত ধর্মপ্রণালী বহুকাল বিস্মৃত হইয়াছিল এবং সামাজিক ব্যাভিচারীতাব পঙ্কিলহুদে নিমগ্ন হইয়া পারম্পরিক শত্রুতায় কালক্ষেপ কবিতেছিল।

বঙ্গসমাজের যখন এইকপ ধর্মসম্বন্ধীয় এবং সামাজিক বিশৃঙ্খলতা পূর্ণরূপে বিবাজমান, তখন সুকোশলী ইংবাজ-মিশনারীগণ বিনাযুদ্ধে স্বদেশকে জয় কবিবাব জন্ত ধর্মের স্তম্ভ জাল নির্মাণ কবিতেন, এতদেশে ইংরাজশিক্ষার প্রচলনের সহিত ধীরে ধীরে সকলের অজ্ঞাতভাবে খ্রীষ্টধর্মের মূলমন্ত্র সূকুমারমতি বঙ্গবালকদিগের কর্ণে প্রদত্ত হইতে লাগিল। ইংরাজদিগের বাহ্যভাষ্যে বিমুগ্ধ হইয়া অনেক ইংবাজশিক্ষিত আচার ভ্রষ্ট বঙ্গীয়যুবক সমাজের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া পিতামাতার নিষেধে ক্রক্ষেপ না কবিয়া দলে দলে খ্রীষ্টধর্ম পরিগ্রহণ করিতে লাগিল।

হিন্দুসমাজের এই শোচনীয় অবস্থার সময়, কীর্ত্তিমান মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়, স্বকীয় বৃহৎ সঙ্কল্প এবং অপরিমেয় অধ্যবসায় লইয়া স্বদেশকে বিদেশীয়ধর্মের জলপ্রাবন হইতে রক্ষা করিবার জন্ত সচেষ্ট হইলেন। হিন্দুসমাজ তখন বৈচিত্র্যময়ী বাহ্য-সৌন্দর্য্যশালী ইংরাজি আচার ব্যবহারদর্শনে বিমুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল,—তখন হিতাহিত জ্ঞান কবিবার ক্ষমতা ছিল না—এবং দূরস্থ ছাত্রপুত্রকেই সত্যের অমর-অট্টালিকা করনা করিয়া তাহার দিকে দাবিত হইয়াছিল।

এই বৈদেশিক জলস্রোতেব বিপুল প্রবাহ হইতে জীর্ণদেশকে রক্ষা করিবার জন্ত তিনি স্বদেশীয় শাস্ত্রের স্মৃদুৎ বাধ নির্মাণ করাকেই প্রশস্ত উপায় বলিয়া বিবেচনা করিলেন। রামমোহন বৃষ্টিতে রাছিলেন যে, হিন্দুশাস্ত্রের প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হওয়াই মাজিক অধঃপতনেব প্রধান কারণ। ইহাতে দেশীয় ব্যক্তিবঃ কান দোষ পবিলক্ষিত হয় না। সে সময়ে সাধারণের বে কোনও শাস্ত্রগ্রন্থ ছিল না এবং শাস্ত্রেব যথার্থতা হইতে তা গের জ্ঞান বহদুরে পড়িয়াছিল। স্বকীয় স্মৃতীক্ ধ্যানদৃষ্টির সা য়ে রামমোহন সে অভাব উপলব্ধি করিলেন,—হিন্দুসমাজ এবং ধর্ম্মকে আশুবিনাশ হইতে উদ্ধার করিতে ক্লত-সংকল্প হইলেন। তিনি তৎকালপ্রচলিত জড়সংস্কারাপন্ন হিন্দুধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া প্রাচীন আর্ধ্যগণের সনাতন বৈদিকমত সাধারণের সম্মুখে স্থাপন করিবার জন্ত অকাতর পরিশ্রম করিতে লাগিলেন! বহুস্তে বাঙ্গালা পণ্ডের স্বজন করিয়া সেগুলি অনুবাদিত করিতে লাগিলেন,—ইহান্ন সহিত খ্রীষ্টীয়ধর্ম্মেব অসারতা প্রতিপন্ন করিবার দ্রষ্টও সচেষ্ট হইলেন। এই স্মৃচেষ্টার সহিত তিনি স্বপ্রবর্ত্তিত উনার হিন্দুধর্ম্মপ্রণালীকে ব্রাহ্মধর্ম্ম নামে অভিহিত করিয়া প্রচলন করিতে লাগিলেন। অনেকে এই নবপ্রচলিত উদাব উপাসনা প্রণালী অবলম্বন করিলেন,—সমাজ খ্রীষ্টধর্ম্মের অত্যাচার হইতে পাপ্ত হইল।

কিন্তু হতাগ্যক্রমে রামমোহনের উদ্দেশ্য পূর্ণরূপে সফলতালভ করিতে পাবিল না। রামমোহনের অকালমৃত্যুর সহিত অনুপস্থিত হস্তে ভাবপ্রদত্ত হওয়াতে অনেক আভ্যন্তরীণ কলহ উপস্থিত হইয়া ব্রাহ্মধর্মকে নানা সাম্প্রদায়িকতায় বিভক্ত করিয়া ফেলিল।

রামমোহনের পর মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর ৬ অক্ষয়কুমার দত্ত এবং ৬ কেশবচন্দ্র সেনের উপর ব্রাহ্মসমাজ পবিচালনার ভার অর্পিত হইল। অক্ষয়কুমার সংস্কারকার্যের পক্ষপাতী না থাকিলেও ইংরাজি রীতিনীতিব প্রশংসা করিতেন এবং কেশবচন্দ্র খ্রীষ্টধর্মের উপর নবধর্ম স্থাপন করিতে এবং পাশ্চাত্যপ্রথা অনুযায়ী স্বদেশীয় সমাজ সংগঠন কবিবার নিমিত্ত চেষ্টিত ছিলেন। সুতরাং ইহা-দিগের হস্তে রামমোহনের উদাব বেদান্তধর্ম যে পরিবর্তিত হইয়া য়োর সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবে তাহাতে আর কি ? খ্রীষ্টধর্ম প্রকাশ্যভাবে হিন্দুধর্ম এবং সমাজের ৭ অপকার কবিত্তে পারিল না বটে, কিন্তু এই কলুষিত পরিবর্তিত একমাত্র ব্রাহ্মধর্মই হিন্দুসমাজের যথেষ্ট অপকার কবি গিল। সেই কারণবশতঃ প্রথমাবস্থায় যে কয়জন ব্যক্তি রামমোহ উদাবধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কালক্রমে তাঁহারা ইহাব অধঃপ ন দর্শন কবিয়া উক্ত ধর্ম এবং সমাজের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হইয়া ঙিলেন। আবার সমস্তদেশে ব্রাহ্মসমাজের বিকক্ষে চীৎকারধ্বনি শ্রুত হইতে লাগিল।

ইহার ফলে অকস্মাৎ গ্রামে গ্রামে নগরে নগরে হবিসভা হিন্দুধর্মের বিজয়নিশান উড্ডীন কবিয়া বক্তৃতাশ্রোতে এবং সংকী নে শাস্তিপ্রিয়-ব্যক্তিবর্গের কণবধিবপ্রায় কবিয়া তুলিল, কিন্তু তাহাতে বাহ্যিক সৌষ্ঠব ভিন্ন মানসিক ধর্মপ্রবৃত্তি আদৌ উন্নত হইল না! সামাজিক কলঙ্ক-শ্রোত পূর্বের ত্রায়ই সবেগে প্রবাহিত হইতে লাগিল এবং ধর্মের নামে অধর্মচরণ হইতে লাগিল।

[ক্রমশঃ]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু ।

স্বরলিপি ।

পাহাড়ী পিনু—দাদ্রা ।

কথা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বোষ ।

স্বর—শ্রীযুক্ত রামতারণ সাত্তাল ।

অলি ব্যাকুল কঁদি'ছে গুঞ্জরি' লো ।

নাহি হেবি' কুসুম মুঞ্জরল ॥

চিত চঞ্চল ধাই'ছে সবোবরে,

গুণ গুণ স্বরে মনবাথা কহে সকাঁতবে,—

শূন্ত সরোণীর নেহাবি' লো ॥

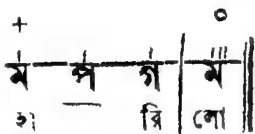
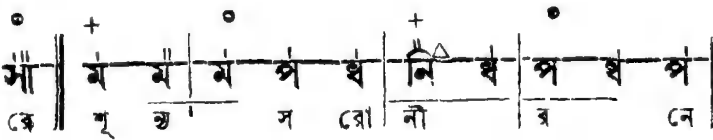
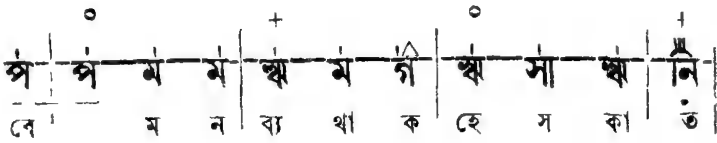
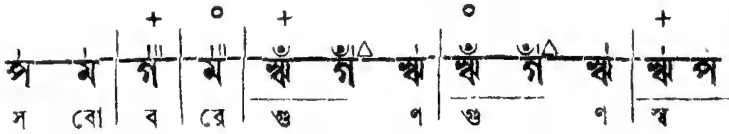
আশ্রয়ী ।

+	°	°	+	°
সা	সা	নি	সা	স্বা
অ	লি	বা	কু	ল'

+	°	+	°	+	°
স্বা	স্বা	স্বা	স্বা	সা	স্বা
কা	দি	ছে	গু	জ	বি

+	°	+	°	+	°
স্বা	স্বা	স্বা	স্বা	স্বা	স্বা
বি	কু	স্ব	ম	স্ব	জ

অন্তরা ।



বীণাপাণি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণা-পুস্তক-বজ্রিত হস্তে । ভগবতি, ভারতি, দেবি নমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । { বৈশাখ, ১৩০৪ সাল । } ৪র্থ সংখ্যা ।

মহামায়া ।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর্ব ।]

(৬)

এক নিমন্ত্রণ উপলক্ষে কৃষ্ণধন কলিকাতায় আসিলেন । শ্রাম
সুন্দরও পিতার সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতায় আসিল । মহামায়া বাড়ীতে
একেলা পড়িল । বহুদিন পরে মহামায়া ক্লপণতাব ফল বুঝিতে পারিল ।
বুঝিতে পারিল—স্বামী পুত্র গৃহে না থাকিলে, তার গৃহে ও অরণ্যে
পার্থক্য থাকে না । পূর্বে তাহার গৃহ সর্বদাই জন-কলকলে পূর্ণ
থাকিত । মহামায়ার গৃহে নিত্য ভোজের আরোজন হইত, মহামায়াব
অন্ন, প্রতি আগন্তুককে যথেষ্ট বিতরণ করিয়া প্রতিবেশিনীগণ কেহ
সাবিজী, কেহ অন্নপূর্ণা, কেহ দ্রোপদী, কেহ বা লক্ষ্মী,—বিবিধ
উপাধি-ভূষণে ভূষিত হইয়া, নারী জন্মের সৌভাগ্যে আপনাদিগকে
কৃতার্থজ্ঞান করিত । কৃষ্ণধন কোথাও যাইলে, তাহাদের সঙ্গে
আলাপে আমোদে, মহামায়া স্বামীর অদর্শন বড় একটা অনুভব

করিতে পারিত না। আজি কালি আর তাহারা কেহই আসে না। কাজেই একেলা 'শ্রীকাকাটা মহামায়ার' বড় কষ্টকর হইয়া পড়িল। মহামায়া 'তখন বুঝিল,—'একবারে হাত বন্ধ করিয়া বড় কষ্ট করিয়া করিয়াছি।'

'স্বামী গৃহে আসিলে আশাব তাহার কাছে মুক্ত হইবার অনুভূতি নাই'—ভাবিয়া, মহামায়া কোনরূপে কষ্টটা দিন কাটাইবাব জন্য হৃদয় বাঁধিতে চেষ্টা করিল। কিন্তু হৃদয় বাঁধা পড়িল না। মহামায়া মনে মনে ভাবিল, মানুষই লক্ষ্মী; আগে সেই মানুষকে গৃহে স্থান দিতাম, আদব যত দেখাইতাম, নিজের সুখের জন্য। তাহাদের কি? তাহারা যে আপ্যায়িত হইত, তাহার আদব গ্রহণ করিত, এটা তাহাদের অনুগ্রহ; আব মহামায়ার সৌভাগ্য। মহামায়া ঘরে তিষ্ঠিতে পারিল না। সে পান্থী কবিয়া ননদীর গৃহে চলিয়া গেল। ননদীব নাম শারদামুন্দরী, মহামায়াব বাল্য সখী। তাহার সম্বন্ধে এই স্থানে দুই একটি কথা বলিব।

কৃষ্ণধনের তিনকুলে কেহই ছিল না। তবে কোথা দাঁড়াইত মহামায়াব ননদী আসিল? মহামায়াব পিতা, জামাতাব দেশে গৃহ নির্মাণের পূর্বে, কৃষ্ণধনেব কোন সম্পর্কের কেহ আছে কি না জানিতে চাহিয়াছিলেন। গৃহ ত নির্মাণ করিবেন, কেন না, কল্যাব শ্বশুর-গৃহ-বাসিনী হইবার বড় মাধ। স্বামীর গৃহ নাহি গুনিলে, আদরের কল্যা মর্শাহত হইবে; কাজেই কৃষ্ণধনেব গ্রামে একটি ঘর বাঁধিতেই হইবে। কিন্তু সেখানে কাহার কাছে কল্যা কে পাঠাইবেন? কে বালিকা কল্যার অভিভাবকত্ব করিবে? তিনি গ্রামস্থ ব্যক্তিগণের মধ্যে আত্মীয়তার সন্ধান কবেন। কৃষ্ণধন বাল্যকালেই পিতামাতৃহীন। শ্বশুরকে এ বিষয়ে নিজে কোনও সন্ধান দিতে পারেন নাই। তবে তাহার মনে ছিল, বাল্যে মাতৃ বিরোধে পর, একটি রমণী তাঁহাকে কিছুকাল স্তম্ভপান করাইয়াছিল। কিন্তু সেও অন্ধকারে ডুবিয়া গিয়াছে। কোন্‌দিক আছে, আছে কি না আছে, কৃষ্ণধন তাহাব সন্ধান বলিতে পারিলেন না। কৃষ্ণধনের

খণ্ডর একজন আত্মীয়ের সন্ধানে ফিরিলেন। কিন্তু গ্রামস্থ কেহই আত্মীয় হইতে চাহিল না। কেহ গৰ্জবশে, কেহ অভিমানে, কেহ বা আশঙ্কায় ঘরজামাইয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখিল না। বহু দিন পরিশ্রম, মহাভাষার পিতা সেই আত্মীয়ের সন্ধান পান। তখন তাহার বড়ই দুঃখ। স্বামী-পুত্র বিরোগিনী, দরিদ্রা ব্রাহ্মণী, একটীয়া কন্ডা লইয়া গঙ্গার তীরবর্তী একটা গ্রামে পিতৃশ্রমে বাস করিতেছিলেন। মহাভাষার পিতা সন্ধান কবিয়া তাঁহাব কাছে উপস্থিত হইলেন।

তৎপূর্বে, সেদিনকার আত্মাবের কথা লইয়া, কন্ডা ও মাতায় কলহ চলিতেছিল। কন্ডা শারদাসুন্দরী তখন দ্বাদশ বর্ষীয়া বালিকা। দরিদ্রতার শিক্ষা সেই অল্পবয়সেই তাহাব বিজ্ঞার জ্ঞান জন্মিয়াছিল। তাহার জামাহবেব জন্ম মাকে প্রতিবেশিনীগণেব কাছে প্রায়ই হাত পাতিতে হইত। কন্ডাব সেটা ভাল লাগিত না। সে মায়ের এই অভ্যাস কন্ডাবাসবতার জন্ম প্রাঘট্যে তিবদ্ধাব করিত। এবং নিজে চরকা কাটিয়া পৈতা বিক্রয় করিয়া পুবেব গৃহের ধান কানিয়া, মাও নিজের অন্ত্র সংস্থানেব আভাষ দিত। মা কিন্তু লোকলজ্জা ভয়ে ও আশঙ্কায় এই যৌবনোন্মুখী, অবিবাহিতা স্তন্যবা কন্ডাকে বাটীর বাহির হইতে দিত না। নিজে কাষ কবিয়া পাড়ায় পাড়ায় ঘুরিত, কখন বা অপমান সহিত, তথাপি কন্ডাব ইচ্ছা পূর্ণ করিত না। সেদিনও মারে কাষে কলহ চলিতেছিল। বালিকা মাকে ধরিয়া বসিয়াছিল। আজ তাহাকে কোথায়ও রাখিতে দিবে না। মা বলিল—‘যদি কোথাও যাইতেই না দিবি, তবে থাইবি কি?’

বালিকা বলিল,—‘থাইতে না পাইলেই কি ভিক্ষা করিতে হইবে?’

মা। তবে কি করিব?

বালিকা। পায়ের উপর পা দিয়া বসিয়া থাক।

মা। সে কতকণের জন্ম? কালকে অল্প উপবাস। আজ কিছু থাইতে না পাইলে যে, চলিয়া পড়িবি।

বালিকা। না খাইয়া মরিব, তবু তোকে ভিক্ষা করিতে দিব না।

মা। আমার সব মরিয়াছে, তুই মরিলি না কেন?

বালিকা। বেশ, তবে ঘরে বসিয়া থাক্। মৃত্যু আপনি আসিয়া আমাদের সকল যন্ত্রণার অবসান করিবে। মরিতেই কখন হইবে, তখন ভিক্ষায় খাইয়া আত্মহত্যা করিব কেন? মরিব ত ভগবানের উপর অভিমান করিয়া মরিব। এত লোকে আহার পায়, আর আমাদের কখন আধপেটা খাইয়া, কখন পূবা উপবাস দিয়া থাকিতে হয় কেন? এ কথা মনে হইলেও রাগ হয়। কিন্তু সে রাগ কাহাব উপর করিব মা! আজ আমি স্থির করিয়াছি, যে আমাদের পৃথিবীতে পাঠাইয়াছে, তাঁহার উপর রাগ করিয়া বসিয়া থাকিব। যদি পাঠাইবার উদ্দেশ্য থাকে ত সে আপনি আসিয়া আত্মাব যোগাইবে। নহিলে উদ্দেশ্য হীন জীবন রাখিয়া লাভ কি? যত শীঘ্র যাইতে পারি, ততই মঙ্গল। আজ আমি তোকে কোথাও যাইতে দিব না।

শারদা মাতাব হাত ধরিয়া রহিল। মাতা কন্ডার হাত ছাড়াইবার চেষ্টা করিল, আর বলিল—“হাত ছাড়িয়া দে। ঘরে বসিয়া থাকিব, পবিত্রম করিব না—কে আমাদের আহার যোগাইবে? —সেই অদৃষ্টই যদি আমার হইবে, তাহা হইলে একঘর সম্ভান থাকিতে, আমি একা তোর চিন্তা লইয়া মরিব কেন?”

শারদা বলিল—“তবে খাইতে পরিতে পাই, এমন ঘরে আমাকে দেনা কেন—অনাহারে মরিতে চলিলাম, কোলিঙ্গ লইয়া কি করিব?”

বালিকার মুখে একথা শুনিতে অনেকেরই বাধ বাধ ঠেকিতে পাবে, কিন্তু উদরের যন্ত্রণা যে অমুভব করিয়াছে, সেই জানে, অন্নকষ্টে লজ্জা-সরম রক্ষা করা কত কঠিন। ছুঁতক্কে লোকে ছেলে বেচিয়া খায়। কোথাও আহার পাইলে পুত্রকে ঠেলিয়া

নিজের উদর পূরণ করিতে বসিয়া যায়। শারদা দারিদ্র্যের নিত্য-পেষণে কতকটা লজ্জাহীন হইয়া পড়িয়াছিল। ছুটা শাকের জন্ত সে গাছে উঠিত, মৎস্যের জন্ত জলে নামিত। কখন বা বালক বালিকাদের সঙ্গে কোন্দল করিত। নিজেদেব কোন-কৃতি দেখিলে গালাগালি দিতেও কুণ্ঠিত হইত না। মা তাহাকে অতি অল্পদিন হইল আটক করিয়াছে। কাজেই বালিকা মুখরা হইয়া মায়ের সঙ্গে কোন্দল করিতেছিল।

এমনই সময়ে মহামায়ার পিতা, তাহাদের বাটীর বহির্দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হন। বাটীর ভিতরের কলহ তাহার কর্ণগোচর হইল। তাহারা কি বলিতেছে শুনিতে তাহার কোতুল হইল। তিনি কাণ বাড়াইয়া তাহাদের কলহেব আত্মোপাস্ত শুনিলেন। শুনিয়া তাহার হৃদয় গলিয়া গেল। তারপর বালিকাব শেষ প্রশ্নে মা যখন দৃঢ়তার সহিত বলিয়া উঠিল—‘তা কখন পারিব না—তবে বসিয়া বসিয়া অনাহারে শুকাইয়া মব, আমি তোমার জন্ত বংশ-মর্যাদা-লোপ করিতে পারিব না।’ তখন সেই অপরিচিতার উপরে আপনা আপনি শ্রদ্ধা আসিয়া পড়িল। পূর্বে তিনি অতিশয় হইয়া তাহাদের গৃহে প্রবিষ্ট হইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। কিন্তু এখন আর রহস্ত করিয়া তাহাদিগকে মনোবেদনা দিতে সাহসী হইলেন না। তিনি ধীবে ধীবে কবাট ঠেলিয়া বাটীর উঠানে যাইয়া উপস্থিত হইলেন। বালিকা তখনও পর্যাস্ত হাত জুখানি দিয়া মায়ের ছুটা হাত ধরিয়া রাখিয়াছিল। শেষের কথাগুলি বলিতে বলিতে মায়ের চক্ষু হইতে গলগল করিয়া জল বাহির হইয়া গেল। এতক্ষণ প্রকৃতিস্থ ছিল, যে কোন প্রকায়ে হৃদয় বাধিয়া কতাকে বুঝাইতে ছিল, কিন্তু কত্থার শেষ কথায় একটা ভবিষ্যতের ছবি তাহার মনে জাগিয়া উঠিল। সে যেন মাতৃহীনা কুমারী কত্থার বিবাদের ছায়ায় ঘেরা যৌবনশ্রীটি দেখিতে পাইল। সেই অদৃষ্টপূর্ব্ব কালনিক মূর্ত্তি তাহার হৃদয়ের সমস্ত বাধন ছিড়িয়া দিল। চক্ষু সহজ চেষ্টায় হৃদয়ের উচ্ছ্বাস চাপিয়া রাখিতে

পাবিল না। হাত কণ্ঠার হাতে বদ্ধ, মুছিবাব অবকাশ হইল না। অশ্রু দেখিতে দেখিতে গও বাহিয়া ছুটিয়া গেল। শারদা মাঘের এবস্থি অবস্থা দেখিয়া অপ্রতিভ হইয়া হাত ছাড়িয়া দিল।

তাবপব ?—তাবপব এই নবাগত অতিথির আগমনে তাহাদের জীবনমৃত্যু প্রশ্ন মুহূর্ত্তমধ্যে মীমাংসিত হইয়া গেল। ব্রাহ্মণ অধিক ক্ষণ তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের পরিচয় লইলেন, নিজের পরিচয় দিলেন। আব কৃষ্ণধন ও তাহাব কণ্ঠাব কথা তুলিয়া, তাহাদের গৃহেব অস্থির রক্ষা ও নবসংসার প্রতিষ্ঠাকপ মহদ্রুদেস্তেব জন্ত যে ঈশ্বর তাহাদিগকে মর্ত্তে পাঠাইয়াছেন, এ কথাও শুনাইয়া দিলেন।

বালিকা ঈশ্ববে নির্ভব করিয়াছিল, ঈশ্বর তাহার ভার লইলেন। ব্রাহ্মণ আহাবসামগ্রী আনাইয়া, সেই স্থানেই সে বেলাব মত বহিলেন। অপবাহু মা ও মেয়েকে কৃষ্ণধনের নবনির্ম্মিত গৃহে আনিয়া উপস্থিত কবিলেন।

কোথাকাব ভাব কোথায় মিলিয়া এই নবমুষ্টি আত্মীয়-তায় একটা সোণাব সংসার প্রতিষ্ঠিত হইয়া গেল। মহামায়া শ্বশুর-গৃহে আসিয়া দেখিল, তাহার মমতাময়ী স্বশ্রু আছে, আনন্দময়ী ননন্দা আছে। আর তাহাকে ঘেরিয়া হান্ত পবিহাসে আমোদ বঞ্চে দিবসেব দীর্ঘতা নাশিকা সঙ্গিনী আছে।

মহামায়াব পিতা বহু অর্থ ব্যয় কবিয়া শাবদাসুন্দরীকে সংপাত্রে হস্তান্তর করেন। তাহাব স্বামী রমাশ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় তখন ডাক্তারী পড়িতেছিলেন। অল্পদিন পবে শাবদাসুন্দরীব মাতা পবলোক গতা হন। মহাসমাবোহে মহামায়াব পিতা তাহাব শ্রাদ্ধাদি কার্য্য সম্পন্ন কবাইয়াছিলেন।

এখন রমাশ্রসাদ গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকুরী কবিতেছেন। হাঁসপাতালের ভাব লইয়া তাহাকেও জেলায় জেলায় ঘূবিতে হয়। শাবদাসুন্দরীও খামীর সঙ্গে জেলায় জেলায় ঘুরিয়া বেড়ায়। মহা-

মায়ী দেশে আসিলে, শারদাসুন্দরীও দেশে আসে। কিন্তু এবারে আজিও পর্য্যন্ত আসিতে পারে নাই। রমাপ্রসাদ নিজেও বহুদিন কৃষ্ণধনকে দেখেন নাই বলিয়া, ছুটির দরখাস্ত করিয়াছেন, ছুটি মঞ্জুর হইলেই নিজে শারদাকে লইয়া আসিবেন সংকল্প।

মহামায়া কিন্তু তাব আগমনের অপেক্ষা কবিতে পারিল না। শারদাসুন্দরীর দেশে আসিবার পূর্বেই সে তাব স্বাণ্ডীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে তার বাড়ী বাইয়া উপস্থিত হইল।

(৭)

পাক্ষি হইতে নামিয়া মহামায়া বাটীব উঠানে হুই-একপদ অগ্রসর হইয়াছে, এমন সময়ে পাছু হইতে মা বলিয়া কে তারে জড়াইয়া ধরিল। মহামায়া মুখ ফিরাইয়া দেখিল, সে একটা স্নবর্ণলতায় বিজড়িতা হইয়াছে। বালিকার মুখ দেখিয়াই তাহার বুকটা ছাঁৎ কবিয়া উঠিল। মুহূর্ত্তমধ্যে একখানি অন্ধ বিস্তৃত মুখ-চ্ছবি দ্বিগুণ সৌন্দর্য্যে তাহার চোখেব উপর ভাসিয়া উঠিল; আব মুহূর্ত্তমধ্যে সমস্ত হৃদয়টাকে নিপীড়িত করিয়া, সমস্ত ধমনীগুলোতে শোণিত তরঙ্গ প্রবাহিত কবিয়া, কি একটা অজ্ঞাত কারণ তড়ি-চ্ছক্তি তাহার বিশাল লোচন হুটী জলে ভরাইয়া দিল। ব্যাপার কি বুঝিতে না বুঝিতেই মহামায়ার উপর দিয়া যেন একটা ঝড় চলিয়া গেল। যখন আশ্রয় সংযতা হইল, তখন বুঝিল, মেদিনীপুরের সেই মেয়েটার সহিত এই মেয়েটাব আকৃতিগত একটা সাদৃশ্য আছে। মহামায়া সাদৃশ্যই স্থির বুঝিল, মেদিনীপুর হইতে সে বালিকা এতদূরে কেমন করিয়া আসিবে বুঝিতে পারিল না।

বালিকা বম্মাপ্রসাদের বাটীব উঠানে খেলাইতেছিল। মহামায়া বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিবামাত্রই মাতৃভ্রমে তাকে মা বলিয়া, পাছু হইতে জড়াইয়া ধরিল। এখন মা নয় দেখিয়া লজ্জিতা,

তাহাকে ছাড়িয়া পলাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু মহামায়া তাহাকে ছাড়িল না। কোলে জোর করিয়া তুলিয়া লইল, এবং বার বার তার মুখ চুম্বন করিল। বালিকার বয়স আন্দাজ বার বৎসর। ছাদশ বর্ষীয়া বালিকার ফুটনোমুখী যৌবনকান্তি মহামায়াকে বিমুগ্ধা করিল। এমন মেয়ে যাবে ‘মা’ বলে সে কত ভাগ্যবতী। মহামায়ার ঈর্ষা হইল। রমণী জীবন বৃক্ষেব রসাল ফল—সুন্দরী রসময়ী দয়াবতী মায়াকপিনী। কিন্তু সেই সৌন্দর্য্য সেই রস, সেই দয়ামায়া আবরণে কখন কখন কেমন করিয়া যে এই কীটটি প্রবেশ কবে, দয়াময়ীবা নিজেই তাহার উপলব্ধি করিতে পাবেন না। তাহার প্রবেশ পথ মানব দৃষ্টিত অগোচর। তুমি অনুসন্ধান করিতে যাও, সেটা তোমার চোখের উপর দিয়া উড়িয়া যাইবে। একটু মধুর শব্দে তাহার অন্তিহেব শ্রমাণ দিবে, ধরা দিবে না। সখী সখীর হুংথে কাঁদিয়া মরিবে, তবু তাব সুখ দেখিয়া দীর্ঘ নিশ্বাসে বাধা দিতে পারিবে না। পুত্রবৎসলা জননী, স্বামীনিগৃহীতা পুত্রবধুব জন্ত পুত্রের সহিত বিবাদ করিয়া অন্নজল ত্যাগ করিলেন, তবু তাব স্বামীব ভালবাসা হৃৎক্ষে দেখিতে পারিবে না। ইতিহাস, বিজ্ঞানে, কাব্যদর্শনে সহস্র সহস্র নীতিশিক্ষায়ও ঈর্ষা ঠাকুরাণী সেই কোমল সিংহাসনেব দখল ছাড়েন না। তবে মূর্খার কঠোর ঈর্ষা, মুক্তকণ্ঠে বিধাতাকে গালি দেয়, বিদুষীর মার্জিত কচি ঈর্ষার অঙ্গে কবিতারসেব আবরণ দিয়া মধুব করিয়া তুলে। তোমাব সিবিলসার্কিশ পাশ করা স্বামী দেখিয়া তোমার মূর্খা সখী স্বামীর সহিত কলহ কবে, তোমার বিদুষী সখী বিবাহ করিব না বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া বসেন।

বালিকার মুখের ‘মা’ কথা শুনিয়া তার মুখ দেখিয়া, কোলে করিয়া স্পর্শ সুখানুভাবিনী মহামায়া ঈর্ষায় গলিয়া গেল। এই চাঁদমুখ হইতে অজস্র নিঃসৃত ‘মা মা’ সুধা শুধু যে তার জননীর হৃদয় রাজ্যেই অবিরাম রবিয়া আসিবে, এটা তার সহ্য হইল না। ঈর্ষান্বিতা মহামায়া তার কিয়দংশ আত্মসাৎ করিবার।

কত বালিকাকে জোর করিয়া বকে চাপিয়া ধরিলেন । এসতো-
কত বালিকা ক্রূর বলটুকু হই একবার মহামারার এই শাধীনতা
হরণরূপ ছর্কোধ্য আচরণের বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিল, কিন্তু কিছুই
করিতে পারিল না ।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকীর্ত্তদেবপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

প'রবে না যোর সাধের মালা ?

প'রবে না যোর সাধের মালা ?

আমি—সারাটি দিন যুরে যুরে,

নাড়িয়েছি যে সোণার থালা,

তুমি—প'রবে না যোর সাধের মালা ?

আমি—একলা মাহুৰ অগৎ যুরে,

বেড়াই থালি তোমার তরে,

দেখবো থালি হাসিমুখ

জ'য় বিমল চাঁদের খেলা,

তুমি—প'রবে না যোর সাধের মালা ?

বেড়িয়ে আমি কুশুম বনে,

তুলেছি তুল কত বতনে,

থালি তোমার দিব বলে

আমি—এদেছি এ সাঁকের বেলা,

তুমি—নেবে না যোর সাধের মালা ?

আমি দিন গুণেছি বলে বলে,

কবে তোমার দেখবো এসে,

দেবো তোমার হাতে তুলে

আমার এ সোহাগের ডালা,

তুমি—প'রবেনা যোর সাধের মালা ?

তোমার ভালবাসি যে প্রাণের চেয়ে,

দাঁড়িয়ে আমি তাইত নিরে,

আমার এ বতনের ছাঁর

আমি—গেঁথেছি দিগে গোলাপ বেলা,

তুমি—প'রবেনা যোর ফুলের মালা ?

তুমি—নাও না তুলে একটু হেসে,

গুধু একটু খানি ভালবেসে,

আর কিছুত চাই না আমি

আমার—ডেকে ডেকে ভালো গলা,

তুমি—প'রবেনা যোর সাধের মালা ?

শ্রীগণেশচন্দ্র লেন ।

বঙ্কিমচন্দ্রের ধর্ম ।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

এই মহা অবনতির সময় বঙ্কিমচন্দ্র আপনাব হৃদয়ের সমস্ত উদ্যাবতা লইয়া সামাজিক কোলাহলের মধ্যে আসিয়া দণ্ডায়মান হইলেন । তিনি বামমোহনের মহাশিক্ষার দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া ভাষাসংস্কারের সহিত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকার্যেও মনোযোগ প্রদান করিয়াছিলেন । তিনি জ্ঞানচক্ষু উন্মেষিত করিয়া স্পষ্ট দেখিতে পাইলেন যে, সে সময় বাঙ্গালা সমাজ প্রকৃতপক্ষে শাস্ত্রোক্ত বিবি-নিষেধ আদৌ পালন করিয়া চলিতেছে না এবং প্রাচীন মহা-মুনিদিগের শাস্ত্রোক্ত উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করিবার ক্ষমতা এবং সুযোগ অনেকেরই ছিল না । কোনও ব্যক্তিবিশেষের ইচ্ছাকৃত্যায়ী আচাৰকে দেশাচাৰ বলিয়া গণনা করা হইত এবং তাহা ভালই হউক বা মন্দই হউক, সমস্ত সমাজ তদনুসারে কার্য্য করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না । এই প্রকাৰে ধীরে ধীরে বাঙ্গালা সামাজিক আচাৰ-ব্যবহারের মধ্যে অনেক অশাস্ত্রীয় নিয়মাদি প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং সেগুলির অসাবতা এবং অপ-কারিতাব প্রতি আদৌ দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া সকলে তাহা অবলম্বন করিত ।

যখন হিন্দুসমাজে এমন বিশৃঙ্খলতার প্রাক্তর্ভাব ও যখন অসং-সারশৃঙ্খল বাহ্যিক আড়ম্বরকেই ধর্মের নিদর্শন বলিয়া বিবেচনা করা হইত এবং যখন ইংবাজীশিক্ষাপ্রাপ্ত নব্যযুবকবৃন্দ প্রকৃত হিন্দুধর্ম-পিপাসায় কাতর হইয়া কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়িয়াছিল, তখন বঙ্কিমচন্দ্র জ্ঞানযোগ কর্মযোগ এবং ভক্তিবোগের সংমিশ্রণসাধন করিয়া অতি উপাদেয় “ধর্মতত্ত্ব” নামক স্বকীয় সুপ্রসিদ্ধ প্রাঞ্জল অথচ দার্শনিক পুস্তক প্রকাশিত করিলেন ।

ধর্মসংস্কারই হউক, ভাষাসংস্কারই হউক, সমাজসংস্কারই হউক

বা বাজনীতিসংস্কারই হউক—সকল প্রকার সংস্কারকার্যেই হৃদ-
দৃষ্টিশক্তি এবং অসাম্প্রদায়িক মনোভাব এই দুইটি গুণ থাকা
অত্যাবশ্যক। কোনও বিষয়ের দোষ গুণ—তাহা ক্ষুণ্ণ হউক
বা বৃহৎই হউক, দেখিবার জন্ত যেমন একপক্ষে হৃদদৃষ্টির প্রয়ো-
জন, সেই প্রকার সকল প্রকার বিষয় হইতেই গুণাংশ সংগ্রহ
করিয়া লইতে হইলে মানসিক উদারতাব আবশ্যক। কি উপন্যাস-
রচনা বা কি ধর্মবিষয়ালোচনা—সকল বিষয়েই বঙ্কিমচন্দ্র এই দুইটি
মহৎ গুণের পূর্ণ পরিচয় প্রদান করিয়াছেন—সেই কারণবশতঃ
তিনি এমন সর্বলোক-পূজ্য নিবপেক্ষ এবং বলসম্পন্ন ভাষা ও
ধর্মসংস্কারক বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

বঙ্কিমচন্দ্রের অভ্যুদয়কালীন যে প্রকার সামাজিক দলাদলি
চলিতেছিল, তাহাতে কাহাবও পক্ষে নিবপেক্ষ এবং স্বাধীনভাবে
অবস্থান করা সম্ভবপন ছিল না। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্র কোনও পক্ষ
অবলম্বন না করিয়া নিজে স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে কালযাপন করিয়া
গিয়াছেন। তাঁহার রচিত “কৃষ্ণচরিত্র” এবং “ধর্মতত্ত্ব” আমবা এই
অসাম্প্রদায়িকতার সুস্পষ্ট চিত্র প্রতিকলিত দেখিতে পাই। কোথায়ও
‘অভিমান বা আত্মগরিমার লেশমাত্র নাই—সরলভাবে নিজে
ভ্রমাদি স্বীকার করিয়া এবং একাগ্রতার সহিত সত্যকে উচ্চ আসনে
সংবক্ষণ করিয়া গিয়াছেন।

যে সমস্ত হিন্দুধর্মদ্বৈতী ব্যক্তিগণ শ্রীকৃষ্ণের অবতাব বাদে
অবিস্বাস কবিতেন—কৃষ্ণচরিত্রে সুস্পষ্টভাবে তাঁহাদিগের ভ্রম দেখা-
ইয়া দিয়াছেন—কিন্তু অপবপক্ষে তিনি যে আধুনিক মুণ্ডিতমস্তক
ছাপাক্তিদেহী বৈষ্ণবদ্বিগেব আচ্যাব-ব্যবহাবেব পক্ষপাতী ছিলেন
তাহা নহে; তিনি তাহাদিগকেও দেখাইয়া গিয়াছেন যে, কেবল
ভণ্ডামী এবং অনাচারের অনুষ্ঠানের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে লাভ কবিতে
পাওয়া যায় না।

এতদ্ভিন্ন বঙ্কিমচন্দ্র দেশাচার এবং শাস্ত্রীয়ধর্ম এতদূতয়েব যে
পার্থক্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে তাহার প্রকৃত ধর্মমত অবগত

হওয়া যায়। তিনি বলিয়া গিয়াছেন—“প্রথমতঃ শাস্ত্রের দোহাই দিয়া কোন প্রকার সমাজসংস্কার যে সম্পন্ন হইতে পাবে, অথবা সম্পন্ন উচিত এমন আমি বিশ্বাস করি না। * * * আমরা একপ বিবেচনা করিবার দুইটি কারণ আছে। প্রথম এই যে বাঙ্গালী-সমাজ শাস্ত্রের বশীভূত নহে—দেশাচার বা লোকাচার বশীভূত। সত্যবটে লোকাচার অনেক সময়ে শাস্ত্রানুযায়ী, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, লোকাচার শাস্ত্রবিরুদ্ধ—যেখানে লোকাচার এবং শাস্ত্রে বিরোধ সেইখানেই লোকাচার প্রবল। উপরোক্ত বিশ্বাসের দ্বিতীয় কারণ যে, সমাজ সর্বত্র শাস্ত্রের বিধানানুসারে চলিলে সামাজিক মঙ্গল ঘটবে কি না সন্দেহ। * * * আমার নিজের বিশ্বাস যে ধর্মসম্বন্ধে এবং নীতিসম্বন্ধে সামাজিক উন্নতি (Religions and moral Regeneration) না ঘটিলে কেবল শাস্ত্রের বা গ্রন্থবিশেষের দোহাই দিয়া সামাজিক প্রথাবিশেষ পরিবর্তন করান যায় না।” *

বস্তুতঃ বহুকাল হইতে হিন্দুসমাজে শাস্ত্রের নামে যে অপকর্ষ অনুষ্ঠিত হইয়া আসিতেছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। স্বার্থান্বেষী ব্যক্তি স্ব স্ব স্বার্থসিদ্ধির জন্য নানা কৌশলজাল বিস্তার করিয়া সময় সময় শাস্ত্রের নামে অজ্ঞব্যক্তিগণকে কদাচার পালন করিতে শিক্ষাদান করিয়া গিয়াছে। সেগুলির বিষয় অপকারীশূণ্য থাকা সত্ত্বেও, কালক্রমে তাহারা হিন্দুধর্মচারণের এবং সমাজের যেহেতুতে স্বার্থী আলন প্রাপ্ত হইয়াছে এবং এক্ষণে তাহাদিগের অশৌচিকতা বা অশাস্ত্রীয়তা দেখাইয়া দিলেও লোকে তাহাদিগকে ধর্ম্মানুষ্ঠানের অঙ্গ বলিয়া কল্পনা করিয়া পরিত্যাগ করিতে চাহেনা।

হিন্দুসমাজে এখনও এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সংকার্য্যে বাধা দিবার জন্য কথায় কথায় শাস্ত্রের মত উল্লেখ করে

* প্রিন্স রাজা বিনয়কুমারদেবের নিকট প্রেরিত ৬বছরমত্রেয় পত্র—নবম্বারত, বৈশাখ ১৩০১।

—কিন্তু হয়ত যাহাতে তাহাদিগের নিজের বিশেষত্ব বর্তমান সে প্রকাব প্রাত্যহিক আচারানুষ্ঠানের প্রতি ক্রম্বেপও করে না। কয়েক বৎসর পূর্বে যখন কলিকাতায় সমুদ্রযাত্রার প্রস্তাব উত্থিত হয়, তখন এই সমস্ত ভণ্ডিগের বাহ্যভূষণ স্বল্পভাবে পবিত্র লক্ষিত হইয়াছিল। সমুদ্রযাত্রা করা হিন্দুর পক্ষে শাস্ত্রমতে নিষিদ্ধ, তাহাই প্রমাণ করিবার জন্ত ইহার বহুল্লোকেব বাধা কবিতো লাগিল। কিন্তু যাহারা ‘শাস্ত্র শাস্ত্র’ করিয়া চীৎকার করিয়া এই সদৃষ্টোকে বাধাপ্রদান করিতে লাগিল, তাহাদিগের অধিকাংশই হয়ত অখাদ্য ভোজন এবং অপের পান করিয়া উদরপুষ্টি করিতে কুণ্ঠিত ছিল না, এবং অধিক নহে—শাস্ত্রমতে যে শূদ্র, ব্রাহ্মণেব দাসরূপে নিযুক্ত হওয়া উচিত—এই সমস্ত নৈষ্ঠিক (?) ব্রাহ্মণগণ সেই সমস্ত শূদ্রের পদানত হইয়া তাহাদিগের পদলেহন কবিতো কিছুমাত্র লজ্জাবোধ করিত না। প্রায় সকলেই হয়ত ইহাব উত্তরে বলিবেন যে,—ইহা ব্রাহ্মণের দোষ নহে—কালের দোষ। কিন্তু এই “কালের দোষের” অর্থ দেশাচার ভিন্ন আব কিছুই নহে। স্মৃতবাং যদি একপক্ষে একটা ভয়ানক অশাস্ত্রীয় কার্য্য কবিয়া দেশাচারের দোহাই দেওয়া হয়, তবে একটা সংকার্য্যেব অনুষ্ঠানের সময় শাস্ত্রেব কথা তুলিয়া তাহাতে আপত্তি করা কেন?

বঙ্কিমবাবু এতদসম্বন্ধে বলিতেছেন,—“আমার বক্তব্য এই যে—সমুদ্রযাত্রা হিন্দুদিগের ধর্মশাস্ত্রানুমোদিত কি না, তাহা বিচার কবিবার আগে—দেখিতে হয়, ইহা ধর্ম্মানুমোদিত কি না? যাহা ধর্ম্মানুমোদিত কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ, তাহা কি ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ বলিয়া পরিহার্য্য? অনেকে বলিবেন সে, যাহা ধর্ম্মশাস্ত্রসম্মত তাহাই ধর্ম্ম, যাহা হিন্দুদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র বিরুদ্ধ তাহাই অধর্ম্ম;—একথা আমি স্বীকার করিতে প্রস্তুত নহি। হিন্দুদিগের প্রাচীন-গ্রন্থে একরূপ কথা পাই না। মহাত্মারতে কৃষ্ণোক্তি একরূপ আছে;—

“ধারণাকর্ম নিত্যাহুর্কর্মোধারণয়তি প্রজাঃ ।

যৎ স্রাক্ষারণ প্রযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥”

ধর্ম লোক সকলে ধারণ (রক্ষা) করেন, এই জন্ত ধর্ম বলে । যাহা হইতে লোকের রক্ষা হয়, ইহাই ধর্ম নিশ্চিত জানিবে । যদি মহাভারতকার মিথ্যা না বলিয়া থাকেন, যদি হিন্দুধর্মের আবাধ্য ঈশ্বাবতীর বলিয়া সমাজে পূজিত কৃষ্ণ মিথ্যাবাদী না হইেন, তবে যাহা লোকহিতকর তাহাই ধর্ম ।

প্রকৃত এবং “সত্যধর্ম” সম্বন্ধে বন্ধিমবাবুর কি মত ছিল, ইহা হইতেই তাহা বোধগম্য হইতেছে । তিনি প্রাচীন হিন্দুধর্মকে অতি উদারচক্ষে দেখিতেন । তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, “স্মার্ত ঋষিদিগের হাতে—বিশেষতঃ আধুনিক স্মার্ত রঘুনন্দনাদির হাতে—ইহা অতিশয় সঙ্কীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে । স্মার্ত ঋষিগণ হিন্দুধর্মের স্রষ্টা নহেন—হিন্দুধর্ম সনাতন—ঊর্ধ্বাদিগের পূর্ক হইতেই আছে, অতএব সনাতন ধর্মে এবং এই ধর্মশাস্ত্রে বিবোধ অসম্ভব নহে । যেখানে একপ বিবোধ দেখিব, সেখানে সনাতন ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত । ধর্মে এবং হিন্দুধর্মে কোন বিরোধ আমি সীকাব করিতে পারি না । ধর্মের সঙ্গে হিন্দুধর্মের যদি কোনও বিরোধ থাকে, তবে হিন্দুধর্মের গোবব কি ? উহাকে সনাতন ধর্ম বলিব কেন ? এরূপ বিরোধ নাই ।”

এই প্রকারে সমুদয় লৌকিক অসঙ্কীর্ণতা হইতে আপনাকে বহুদূরে স্থাপন করিয়া বন্ধিমচন্দ্র সমগ্র হিন্দুসমাজে আগ্রহদৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন ; তিনি দেখিলেন, যেভাবে হিন্দুসমাজ প্রামাণ্যপূর্ণ ধর্মস্রষ্টান করিতেছে, তাহাতে ইহা শঠৈঃ শঠৈঃ অবনতির পক্ষেই অগ্রসর হইতেছে । হীরকজন্মে কাচগ্রহণ করিয়া চন্দনতরুজন্মে বিবৃক্ষেই আশ্রয় লইয়া যে হিন্দুসমাজ আজ এমন চীৎকার ও উল্লম্বন করিতেছে—এই কষ্টাশ্রিত উৎসাহ বহুকাল থাকিবে না—এবং অবিলম্বে মানসিক জড়তা আসিয়া সমস্তদেশকে অকস্মাৎ অবসাদগ্রস্ত করিয়া ফেলিবে । তিনি প্রকৃত মহাপুরুষ এবং

হইতেই হইলেন, সেই জন্ত দেশের শোচনীয় দুরবস্থা দর্শন করিয়া তাঁহার প্রাণ ব্যাকুল হইয়া উঠিল। স্বদেশবাসীকে প্রমাদেবশত হইতে ক্রবসন্তোর অমন্ত রাজ্যমার্গে আনয়ন করিবার জন্ত রিকর হইলেন। এতদ্বিমিত্ত তিনি যে পন্থা অবলম্বন করিলেন, তাহাতে তাঁহার চিন্তাশীলতা এবং সুবুদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।

উচ্চ বেদীভক্তের উপর দণ্ডায়মান হইয়া নীরস বক্তৃতা প্রদান করিয়া ধর্ম বা নীতির উপদেশ মানবমানে স্থায়ীভাবে মুদ্রিত করিতে চেষ্টা পাওয়া বিড়ম্বনামাত্র—অধিকাংশস্থলেই ক্লমিক উৎসাহ ভিন্ন ইহা হইতে অল্প কোনও সফল প্রসূত হয় না। প্রোতা হরত বক্তৃতা বসানোর পথ উচ্চ কবতালিধ্বনি করিয়া সত্যক্ষেত্রেব বাহিরে যাইতে না যাইতে সমুদয় বিস্মৃত হইয়া যায়; এবং বক্তৃতায় যদি নীবসতাব অংশ অধিক থাকে, তবে বক্তারভাগ্যে নীরব গালিভক্ষণ ভিন্ন অল্প কোনও সুবিষয় লাভ ঘটে না।

এই দোষ পবিহার করিবার জন্ত বঙ্কিমচন্দ্র সবস উপন্যাসেব আশ্রয় গ্রহণ কবিলেন। তিনি হিন্দুর পরম সমাদরের দ্রব্য ত্রীমঙ্গলবলীতার কঠিন উপদেশসমূহ সকলেব অজ্ঞাতে ধীবে ধীবে স্বরচিত উপন্যাসে প্রবিষ্ট কবাইতে লাগিলেন। কি চন্দ্রশেখর, কি দুর্গেশনন্দিনী, কি দেবীচৌধুরাণী, কি আনন্দমঠ, কি বিবরুক্ষ, কি কপালকুণ্ডলা প্রত্যেক উপন্যাসেব পত্রে পত্রে গীতার মহান ও নিগূঢ় ভবসমূহ উদঘাটিত হইল। লোকে একাগ্রচিত্তে তাঁহার উপন্যাস পাঠ করিতে লাগিল, তাহার সহিত গীতাব উদার মতসমূহ তাহারিগেব মনে স্থায়ী চিত্র বাধিয়া গেল। অত্যাচ্ছ উপন্যাসের কথা পরিত্যাগ করিয়া উদাহরণস্বরূপে কেবলমাত্র চন্দ্রশেখরের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। তিনি গ্রন্থের শেষভাগে প্রতাপের উক্তিধারা বুঝাইয়া গিয়াছেন যে, নিঃস্বার্থ পবোপকার এবং নিকাম আত্মত্যাগই মানবেব এবং সমাজের উন্নতিব একমাত্র উপায়। কিন্তু গ্রন্থেব মেরুদণ্ডস্বরূপ এই অমোঘ উপদেশ

বঙ্কিমচন্দ্র শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হঠতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহার সমুদয় উপন্যাসের প্রত্যেক পরিচ্ছেদে যে সমস্ত শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে—তাহা গীতা হইতে গৃহীত এবং এতদ্বারা তিনি দেখাইয়া গিয়াছেন যে, একমাত্র গীতার অনুশীলন দ্বারা ইন্দ্রিয়প্রসূতি হিন্দুজাতির উন্নতি এবং সাম্প্রদায়িক হিন্দুধর্ম এবং ঐদার্য্যশৃংখল সম্পন্ন হইতে পারে।

যে শিক্ষাপ্রণালী উপন্যাসে আরক্ত হইয়াছিল, বঙ্কিমচন্দ্র কিছুকালপরে তাহার সমষ্টিসাধন করিয়া “ধর্মতত্ত্ব” মূললিত-ভাষায় প্রকাশিত করিলেন। এই ধর্মতত্ত্বের দ্বারা বঙ্কিমচন্দ্র অদ্বৈতমতাদ্বয় দরিদ্রদেশে উদাবতাব প্রভাতসূর্য্য আনয়ন করিলেন। সাম্প্রদায়িকতা এবং কুসংস্কারের কঠিন মোহজালে কি শিক্ষিত কি অশিক্ষিত প্রত্যেক ব্যক্তিরই মনোবৃত্তিসমূহ আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিল—প্রমাদপূর্ণ লৌকিক আচাবাছুঠান ব্যতীত কাহাবও স্বাধীন ভাবে কার্য্য করিবার ক্ষমতা ছিল না। বঙ্কিমচন্দ্র নির্ভীকতাব সহিত সেই সঙ্কীর্ণতার মায়াজাল ছিন্ন করিয়া দেখাইলেন যে, অন্ধের ন্যায় কদাচাব পালন করিলে সামাজিক এবং পাবলৌকিক উন্নতি হইতে পাবে না—হিন্দু প্রাচীন ও সনাতন শাস্ত্রানুযায়ী কার্য্য কবিলে নিশ্চয়ই এই হতভাগ্যদেশে সৌভাগ্যের দীপ্তসূর্য্য উদ্ভিত হইবে—এবং আত্মোন্নতি এবং নিকামকর্ম্মই সে উন্নতিলাভের প্রধানতম উপায়—সেই জন্য গীতাব আশ্রয় লইয়া জলদগম্ভীরস্ববে স্বদেশবাসীগণকে আহ্বান করিয়া একাগ্রতার সহিত বলিতেছেন ;—

কাম্যানাং কর্ম্মনাং ন্যাসং সন্ন্যাসং কবয়ো বিঃ ।

সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাচ্ছন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥

“যেদিন ইয়ুবোপীয় বিজ্ঞান ও শিল্প এবং ভারতবর্ষের এই নিষাম ধর্ম্ম একত্রিত হইবে, সেই দিন মনুষ্য দেবতা হইবে। তখন ঐ বিজ্ঞান এবং শিল্পের নিকাম প্রয়োগ ভিন্ন সকাম প্রয়োগ হইবে না—ইহা অসম্ভব নহে। তোমরা ভারতবাসী, তোমরা

কবিলেই হইবে। হুইই তোমাদের হাতে, এখন ইচ্ছা কবিলেই তোমরাই পৃথিবীর কর্তা ও নেতা হইতে পাব। সে আশা যদি তোমাদের না থাকে, তবে বুথায় আমি বকিয়া মরিতেছি।”

এই প্রকার বঙ্কিমচন্দ্র স্বদেশের উন্নতির জন্য অসাম্প্রদায়িকতার সহিত এবং আবেগভাবে সমস্তদেশকে কার্যকর উপদেশদান কবিয়া গিয়াছেন। অতি ছিদ্রাধেয়ীব্যক্তিও বিশেষ মনোযোগ-সহকারে অন্তর্দ্রষ্ট কবিলেও তাঁহার বচিত গ্রন্থাদির মধ্যে বিশেষতঃ ধর্মতত্ত্ব এবং কৃষ্ণচরিত্রে একদেশদর্শিতা বা বাহ্যভ্রমের চিহ্ন দেখিতে পাইবেন না। বঙ্কিম যাহা লিখিয়া গিয়াছেন—তাহা তাহার প্রাণের রচনা এবং স্বকীয় জীবনেও তাহা অবিচলিতভাবে পালন কবিয়া গিয়াছেন। বঙ্কিম যে কেবল উপদেষ্টা ছিলেন, তাহা নহে, তিনি শিষ্যও ছিলেন—তাঁহার উপদেশ এবং কার্য্যে কখনও বিভিন্নতা পরিলক্ষিত হয় নাই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীযতীন্দ্রনাথ বসু।

ললনা-মহিমা।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর]

৫৩	৫৪
কিঞ্চিৎ আভাষ মাত্র দিবেছি কপের,	হিতাহিত জ্ঞানশূন্য যৌবনের ভরে,
গুণ-পাশে রূপ ভুজ্জ,	কা'রে না অবজ্ঞা কবে?
কীপ এই হংস-পুচ্ছ,	কা'বে যুবা ভয় করে?
কেমনে গণিবে উষ্ম গুণ অর্ণবের?	একমাত্র ভীত তব ইন্দিবর ডরে।

৫৫ [মাঝারে,

ভূমি না থাকিলে দেবি! সংসার
হটকারী যুবাদল,
যাইত গো রসাতল,
কে তা'দের প্রলোভনে বাঁধিত

৫৬ সংসাবে ?

যৌবন তরঙ্গ রঞ্জে হ'য়ে উদ্বেলিত,
হারা'ত সংসার জ্ঞান,
ভুচ্ছ ক'বে ধন মান,
উচ্ছিষ্ট রূপের দাস হইত নিশ্চিত ।

৫৭

কৰ্মক্ষেত্রে জীবগণ কবে পরিশ্রম,
যখন গৃহেতে আসে,
কে ব'সে তাহাব পাশে,
সহতনে করিবে গো ক্লান্তি উপশম ?

৫৮

সংসাবের নানা কক্ষে হইয়ে বিব্রত,
কোথায় জুড়ায় নরে ?
কেবা তা'ব ব্যথা হরে ?
কেতাবেক্ষণিকরে আনন্দে তেরত ?

৫৯

নানা উপাদেয় ভোজ্য করিয়া বন্ধন
সহাস্ত্রে বীজনী করে,
সন্তোষে ভুঞ্জায় নবে,
নানামতে কেবা করে ভুষ্টি সম্পাদন ?

৬০

পুষ্পনিভ পবিপাটী শয্যা মনোহর,
কেবা কবে বিচরণ ?
কা'র হেন আচরণ ?
সর্বদাই সশঙ্কিতা তব তরে নর ।

৬১

যখন মানব কোন ব্যথায় ব্যথিত,
কে তাহারে মিষ্টভাবে,
প্রাণ দিয়ে সদা তোষে ?
কে তাহাব হৃদি-বাথা কবে গো

৬২ দূরিত ?

অশান্তি পূরিত এ মরুভূ সংসাবে,
তব প্রেম সুধা পানে,
জীবগণ বাঁচে প্রাণে,
শান্তিপ্রদাযিনীভূমিআহাবেবিহাবে ।

৬৩

ভূমি ফুটাও আঁখি অন্ধ মানবেব,
জ্ঞান চক্ষু খুলে দাও,
সৎপথে নিয়ে যাও,
সহধর্মিনী ভূমি বিমুগ্ধ জীবের ।

৬৪ [তা'বে ।

নিম্নুক সে মিথ্যাবাদী নাহি স্পর্শি
যা'র আঁখি না ফুটিল,
প্রেম তব না বুকিল,
সেজন পাপের ভরা বলিবেতোমারে

৬৫

কতশত উপকাব পায় তব পাশে,
সেই সবে ভুলে যায়,
অকৃতজ্ঞ পশু প্রায়,
নূতন নরক তাব হৃদয় ঘমাঝাসে।

৬৬

নিষার্থ প্রণয় নামে যদি কিছু থাকে,
বমবীৰ হৃদি থাকে,
সে ত্রিদিব দ্রব্য রাজ্যে,
নাথ হয় দিবানিশিপূজিলো তোমাকে।

৬৭ [আশে,

লো স্তম্ভবি। কি কহিব তোর প্রেম
অমব দেবতাগণ,
তাজি স্বর্গ নিকেতন,
মানব মুরতি ধরি ধরাধামে আসে।

৬৮

অনন্ত ধাবায় প্রেম-উৎস মধুবিমা,
বহে যায় অবিরাম,
মন্দাকিনী স্বর্গধাম,
পবিত্র কবিছে যেন কি ক'ব মহিমা।

৬৯

প্রেম সঞ্জীবনী লতা সুবতি সাকার্য,
পিয়ে তব প্রেম স্রুধা,
ঘুচে গেল হৃদি ব্যথা,
নূতন নূতন প্রাণ পেয়েছি আমবা।

৭০

মানবের কটকিত হৃদয় কাননে,
তুমি লো পুষ্পিত লতা,
জগতের হিতে রতা,
ভুলে আছে নব তব সুবতি আননে

৭১

বীণা-বিনিমিত তব কণ্ঠের স্বরব,
পরাস্ত সে পিকরাজ,
বনে গেছে পেয়ে লাজ,

ঢালিছে অমিষ ধাবা কর্ণে সবাকাব

৭২ [সার।

এ সংসারে আছে দুটী সৌন্দর্য্যের
শিশু মুখে স্রুধাহাস,
আর যুবতীর ভাষ,
না থাকিলে মানিতাম সংসার
অসাব।

[ক্রমশঃ]

ত্রিকিরণচন্দ্র দত্ত।

“চোখ গেল।”

কে তুমি বিহগবর। বালার্ক-কিরণে হান্তময়ী উষার সুবতি
নিখাসেব শনশন শকে স্বীয় স্বর মিশাইয়া—সপ্তমে স্বর চড়াইয়া
সকরণ কাতব-কণ্ঠে কূজন করিতেছ,—“চোখ গেল।” মধ্যাহ্নমর্ত্তণ্ড

তাপে তাপিত ভূমি যখন পাদপের পত্রান্তরালে নুঙ্কায়িত হইয়া স্নানীতল সমীর সেবন কর, তখনও ত তোমার ওই কাতরোক্তি শুনিতে পাই ; আবার স্নানীতল সাক্ষ্যসমীর সেবিত তরঙ্গাকুলিত তটিনী-বক্ষেও তোমার ওই “চোখ গেল” স্বর প্রতিধ্বনিত হয় । বল, পাখি ! কি হুঃসহ দাবায়ি তোমার অন্তর্দাহ করিতেছে, কি বিভীষিকাময়ী ভীষণ দৃশ্য দর্শনে তোমার স্নানীল-নলিনাত-নয়ন “গেল গেল” হইতেছে, তাই তুমি মর্শ্মভেদী স্বরে ডাকিতেছ, “চোখ গেল” “চোখ গেল” ?

নিদাকরণ দারিদ্র্য-হুঃখ নিপীড়িত, জালা-যন্ত্রণার কেক্সীভূত এই সংসার আশানে, মানবের মর্শ্মভেদী মরম-যাতনা—মোহের মায়াময়ী মৃগতৃষ্ণিকাবৎ মারাত্মিকামূর্তি নিরন্তর দর্শন করিয়া আমাদের অন্ত-স্থল বিদীর্ণ হয়, মর্শ্মগ্রস্তী ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়—সে দৃষ্টে আমাদের পাষণ হৃদয় ফাটিয়া যায়, আমাদের চক্ষু আর সহিতে পাবে না, অন্তরের প্রবল উচ্ছ্বাসে চক্ষু দৃষ্টিহীন হইয়া পড়ে, কিন্তু বনের পাখি ! তাহাতে তোমাব কি ? তুমি কেন সকালে সন্ধ্যায়, পর্বতে প্রান্তবে, পাহাড়ে পুলিনে, আশানে সৈকতে, নিরন্তর গাহিয়া বেড়াও, “চোখ গেল” “চোখ গেল” ।

তুমি স্বাধীনতার সুধাধবলিত সুষমায়ম্ম সৌখে আজন্ম প্রতি-পালিত হইয়া প্রকৃতির ক্রোড়ে—স্নানীল অনন্ত নীলচন্দ্রাতপেব নিয়ে বিচরণ করিয়া থাক, এই শোকাকুলিত সংসারের ভীষণ সংগ্রাম হইতে সুদূবে অরণ্য সুপক ফলে উদরপূর্তি করিয়া গিরি নির্ঝিনিয়ার কাচস্বচ্ছ স্নানীতল সলিলে পিপাসা মিটাইয়া আপন কাকলীতে আপনি বিভোর হইয়া অপাব আনন্দে অনন্ত আকাশে উড়িয়া বেড়াও । এই পাপ তাপদগ্ধ ধরার বিকৃত ধাবা সকল দেখিয়া তোমার চক্ষু যাইবে কেন ? বল বিহঙ্গম ! তোমার এ কুজনের কাণ কি ?

মানবজীবনের অভিনয়ে কালের পটপরিবর্তনে যে কত ভীষণ দৃশ্য আমাদের দৃষ্টিপথে পতিত হইতেছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া

আমরা কত কাঁদিয়াছি, কত কাঁদিতেছি; আর অন্তরের জ্বালায় কতবার বলিয়াছি,—আর দেখিতে পারি না “চোখ গেল”! ওইযে সৌধমালামণ্ডিত শোণার সহরখানি মহামারির মহানলে তন্দ্রীভূত হইতেছে, ওই যে অনশনে মৃতপ্রায় কঙ্কালসাব প্রেতমূর্ত্তি জঠর জ্বালায় বিকট আর্তনাদ করিতেছে; ওই যে পতি বিরোগ বিধুবালা সহকারচ্যুত মাধবীর জ্বার ধূলাবলুষ্ঠিতা হইতেছে, ওই যে অনাহারে মৃতপ্রায় সন্তান কক্ষে উদ্ভক্তাজননী বিকট চীৎকাবে দিগন্ত প্রতিধ্বনিত করিতেছে, ওই যে পাপীর বড়বন্ধে পড়িয়া ধার্মিককে অশেষ লাঞ্ছনা-ভোগ করিতে হইতেছে—এ সকল মর্শ্বেভী দৃশ্য দেখিয়া আমরা অনেকবার বলিয়াছি,—“চোখ গেল”; কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমাদের চোখ একবারে গিয়াছে, তাই আর আমবা অরণ্যে রোদন করিয়া বলি না,—“চোখ গেল” “চোখ গেল”। নিরন্তর কাঁদিয়া যাহাদের চক্ষু গিয়াছে তাহাদের আর “চোখ গেল” বলিবার প্রয়োজন কি? আর বলিলেই বা শুনিবে কে? তুমি বনের পাখী বনে রোদন করিলে, তোমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠজীব মানবের কর্ণকূহরে তাহা প্রবেশ করিল; কিন্তু আমরা যাহা-দিগকে শ্রেষ্ঠজীব—দেবতা—বলি তাঁহারাও আমাদের এই কাতব উক্তি শুনিলেন না, তাই আমরা মনের হৃৎখে আর তোমার মত অরণ্যে “চোখ গেল” বলিয়া চীৎকার করি না।

গগনবিহারি গায়ক! তোমার কল কঠের কূজনে যে কত রস আছে, তাহা অবোধ আমরা কেমন করিয়া বুঝিব? তুমি শাখীর শাখায় লুকাইয়া লুকাইয়া কাতর কলকণ্ঠে আমাদের হৃৎখে হৃৎখিত হইয়া—আমাদের হৃৎখস্থিতি জাগাইবার জন্য ঐরূপ কূজন কর অথবা আমাদের পরশ্রী কাতরতা দেখিয়া বিজ্ঞপাত্মক শ্বেষপূর্ণধরে আমাদেরিগকে সুনীতি-শিক্ষা দাও, তাহা কেমন করিয়া বলিব?

আমরা মানব, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠজীব; আমাদের কার্যকলাপ সমা-লোচনা, ক্ষুদ্র তুমি, বনের পাখী তুমি, তোমার মুখে শোভা

পার না। আমাদের তর্জনী হেলনে কত প্রবল বলশালীকেও
তীনবল, অবনত-মস্তক হইতে হয়, তাহা দেখিতে পাও ত ?
জানিতে পার ত ? তবে কোন সাহসে আমরা দিগকে শ্বেষপূর্ণস্বরে
শিকা দিতে আগ্রসর হও ? জান পাখি ! দশচক্রে আমরা ভগ-
বানকেও ভূত করিয়া রাখি, তোমার ক্ষুদ্র মুখের ক্ষুদ্র জিহ্বাটুকু
বন্ধ করা আমাদের কতক্ষণের কার্য্য ?

অবোধ পাখি ! বীর আমরা, এই মরজগতে জয়গ্রহণ করিয়া
নিরত জীবনলংগ্ৰামে লিপ্ত, তাই আমরা প্রতিযোগীর প্রতিহিংসা-
সাধনে নিরত তৎপর। কাব্যজগতে কাহাকেও জরলাভ করিতে
দেখিলে আমরা তৎক্ষণাৎ সশস্ত্রে সাজিয়া তাহার সম্মুখীন হই, ভগবৎ-
প্রেমে কেই প্রেমানন্দলাভ কবিলে আমরা তৎক্ষণাৎ তাহাকে
নিরানন্দ করিয়া আনন্দলাভ কবিতে চেষ্টা পাঠি, আর মায়েব
মায়ায় একচটিয়া ক্ষমতা লাভ কবিবাব জন্তই মায়েব অন্ত সন্তানকে
মায়ের কোলে স্থান লাভ করিতে দেখিলে আমাদের “চক্ষু যার”
সেই জন্তই ভূমি শ্বেষপূর্ণস্বরে আমাদের গুনাইয়া গুনাইয়া
সর্বদা গাহিয়া বেড়াও “চোখ গেল” “চোখ গেল”। পরশ্রীকান্তরতা
মহাপাপ,—তাহা আমরা অনেক পুস্তকে অধ্যয়ন করিয়াছি, অনেক
সভায় উচ্চকণ্ঠে বক্তৃতা করিয়াছি। তোমাব ছোটমুখে ওসকল
বড় উপদেশ আর আমাদের সম্বন্ধ হয় না, তাই বলি বনেব
পাখি ! অব আমাদের কাণেব কাছে কুজন করিয়া বলিও না,
“চোখ গেল”। যদি নিতান্ত না ডাকিয়া থাকিতে পার, তবে যাও
হিমাচলের উচ্চশৃঙ্গে,—দেবলোকের শৈলাবাসে গিয়া উচ্চকলকণ্ঠে
কাতব কণ্ঠে দিগন্ত প্রতিক্রান্ত করিয়া গাহিতে থাক “চোখ
গেল” ভারতের হৃদশা দেখিয়া “চোখ গেল”।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায় ।

স্বরলিপি ।

বেহাগ—কাওয়ালী ।

কথা—শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র ঘোষ । সুর—শ্রীযুক্ত রামভারণ সান্যাল ।

কেমনে মন নিবাবি ।

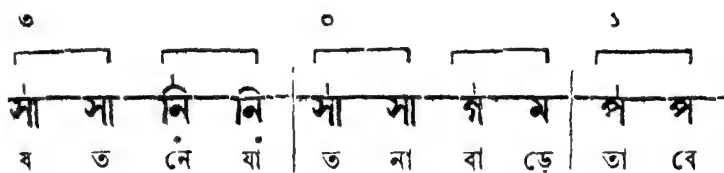
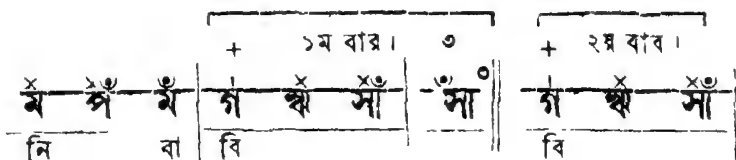
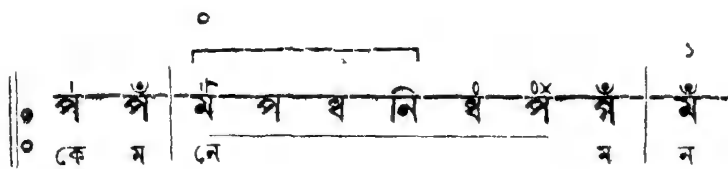
যতনে যতনা বাড়ে, তা বে কি ভুলিতে পারি।

বাসনা বারি-বিবাগে, মলিন বদন মনে জাগে,

অনুরাগে গলি সোহাগে—

হিঁড়িতে নারিছু ডুরি, কি করি মন যে তা'রি ।

আশ্রয়ী ।



বীণাপানি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে । ভগবতি, ভাবতি দেবিনমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । } জ্যৈষ্ঠ, ১৩০৪ সাল । } ৫ম সংখ্যা ।

হিন্দু-সূর্য্য ।

এই ভীষণ তরঙ্গাকুলিত তবার্ণবেব বিষম ভয়াবহ ব্যাথায ব্যথিত হইয়া, বিবিধ ঘটনা-বৈচিত্রের বিচিত্র আবর্তনে আন্দোলিত ও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া, যখন আমরা তটান্তে মিলিত হই, তখনও চাবিদিকে নিবাশার নিরবচ্ছিন্ন সৈকত-রাশি ভিন্ন আর কিছুই আমাদের নেত্র-পথে পতিত হয় না। এই নির্জন নিরবচ্ছিন্ন সৈকত-বাশির মধ্যে পড়িয়া আমরা দেখিতে পাই,—উর্কে অনন্ত শূন্য দিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে; .আব অস্তবে নিদারুণ শূন্য ধু ধু করিতেছে। এই নিরবচ্ছিন্ন জীব-শূন্য সৈকতে কোন মহাপুরুষের পদাঙ্ক দেখিয়াই আমরা আশ্রস্ত হইয়া আশাব কুহকিনী শক্তিতে যেন আবার নব জীবন লাভ করি—সেই স্কুল পদাঙ্কের অঙ্কসরণে আবার জীবন-সংগ্রামে অগ্রসব হইতে পারি। মহাপুরুষগণেব বিচিত্র চরিত-কাহিনী আমাদের শূন্য-প্রাণেব এক-

মাত্র ঋবতাবা, তাঁহাদের অদ্ভুত কীর্তি-কলাপ আমাদের নিহাবাচ্ছন্ন অন্তরের একমাত্র আশা প্রদীপ, আর তাঁহাদের সুধাময় উপদেশাবলীই আমাদের মৃত-সঞ্জীবনী সুধা ।

বর্তমানপুৰুষের আলোচ্য হিন্দুকুল তিলক “হিন্দু-সূর্য্য” বাণাধিপতি । এই বনাম-খ্যাত মহাপুরুষ প্রতিকূল ঘটনা-প্রবর্তনের বিবর্তনে কিরূপে সংঘর্ষিত হইয়া স্বকীয় সহিষ্ণুতায় ও অলৌকিক শক্তি-বলে ভাব্যতব তদানীন্তন শক্তি-পুঞ্জকে সম্ভ্রান্ত ও শক্তিত করিয়া রাজস্থানে সগর্বে রাজ্যস্থাপন ও রাজ্যশাসন করিয়া গিয়াছেন, তাহাব কিঞ্চিৎ আভাস প্রদানই এই প্রস্তাবের উদ্দেশ্য ।

যখন ধর্ম্ম-মদে উন্মত্ত যবনগণ রক্তাক্ত অসিহস্তে ‘কাফের’-কুল নিশ্চূর্ণ করিতে চতুর্দিকে ধাবিত, যখন দোর্দণ্ড প্রতাপাধিত খলিফাওবালীদের অদম্য উত্তমে সূদূরে স্পেন রাজ্য পর্য্যন্ত কম্পমান, যখন মহাবীর মহম্মদ-বিন্‌কাসিম-প্রমুখ মুসলমান বীর-কেশরিগণের অত্যাচাবে সিদ্ধুবাজ জাহির সিংহাসনচ্যুত ও নিহত, যখন নিম্ন-বঙ্গের মগধাধিপ নবপতিগণ প্রতিমুহূর্ত্তে ইসলাম আক্রমণের অপেক্ষায় নিয়ত ভীত ও সম্ভ্রান্ত, তখন শিশু বাপ্পাবাও পৈত্রিক রাজ্যে বঞ্চিত হইয়া গভীর অবণ্যে অসভ্য ভীল জাতির আশ্রয়ে প্রতিপালিত হইতেছেন—চিতোবের মহাবাণা-বংশের আদিপুরুষ, সমগ্র মীবাবেশ্বর তখন ভীল-বালকগণের সহিত অরণ্যে গোচারণে কালাতিপাত করিতেছেন ।

চিতোব-সিংহাসন বাপ্পাবাওএব পৈত্রিক সম্পত্তি নহে, এবং ইহাব প্রকৃত নামও বাপ্পাবাও নহে । অতি প্রাচীনকালে রাজপুতানাব পশ্চিমে সিদ্ধ-বাজ্যের নিকট বল্লভীপুৰ রাজ্য ছিল । এই বল্লভীপুৰ, আদিত্য উপাধিধারী সূর্য্য-বংশীয় বাজগণের রাজধানী ছিল । সুপ্রসিদ্ধ কলিক্সেন এই স্থানের রাজা ছিলেন, তাঁহার পব ক্রমে মহামদনসেন, সূদন্তসেন, বিজয়সেন, পদ্মাদিত্য, হরাদিত্য, সূর্য্যাদিত্য, সোমাদিত্য, শীলাদিত্য প্রভৃতি নরপতিগণ এই বল্লভীপুৰে রাজত্ব করিয়া বিগত জীবন হইলে পর

এই বংশে নগাদিত্য নামক এক নরপতি সিংহাসনে অরোহণ কবেন। ইনি অসভ্য “হুন”-জাতি-কৰ্জুক রাজ্যচ্যুত ও নিহত হন। বাপ্পাৱাও এই নগাদিত্যেব একমাত্র পুত্র। অসভ্য বৰ্ষব জাতি কৰ্জুক স্বরাজ্যে বঞ্চিত হইয়া শিশু “শৈল” বা “শৈলাধীশ” মাতার সহিত গভীৰ অরণ্যে ভীল-রাজ্যেব নিকট আশ্রয়প্রাপ্ত হইলেন। ভীলগণ এই শিশুৰ বাজলক্ষণ ও অনামান্ত্র সৌন্দৰ্য্য দেখিয়া তাহাকে ও তদীয় জননীকে পবন সমাদ্ৰবে বক্ষা কৰিতে লাগিল। ভীলগণ শৈশবে “শৈলকে” আদর করিয়া “বাপা” (বাবা) বলিয়া ডাকিত, সম্ভবতঃ এই কাৰণেই ইহাব নাম “বাপ্পা” হইয়াছে।

অসভ্য বৰ্ষব-জাতি-কৰ্জুক হতসৰ্ষস্ব বালক বাপ্পা, মাতাব সহিত ভীলবাজের নিকট প্রতিপালিত হইতে লাগিলেন। গোচারণ তাঁহাব কাৰ্য্য। ভীল-বালকগণে পরিবৃত হইয়া বাজ-লক্ষণাক্রান্ত বালক গোষ্ঠ-লীলায় কালাতিপাত করেন। একদিন মধ্যাহ্নে তিনি দেখিতে পাইলেন, তাঁহাব রক্ষণীয় যুগেব একটা পয়স্বিনী গাভী দলভ্ৰষ্ট হইয়া একাকী গভীৰ অরণ্যে প্রবেশ কবিল, (পূৰ্বে আব কয়দিন তিনি ঐ গাভীটাকে ঐরূপে যাইতে দেখিয়াছিলেন।) অল্প গাভী-টাকে বনমধ্যে প্রবিষ্ট হইতে দেখিয়া তাঁহাব মনে অত্যন্ত কৌতূহল উপস্থিত হইল, এবং কোন সঙ্গীকে না বলিয়া একাকী গাভীৰ অনুসন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। কিয়দূৰ গিয়া তিনি যাহা দেখিলেন, তাহাতে ভয়ে ও বিস্ময়ে তাঁহাব সৰ্ব্বাঙ্গ বোম্বাঙ্কিত হইল। তিনি দেখিলেন,—অবণ্য-মধ্যে আশ্রম সদৃশ একটা দিব্যস্থান, তথায় একস্থানে তাঁহাব পয়স্বিনী গাভী দণ্ডায়মানা, আব তাহাব স্তন হইতে ক্ষীৰধারা স্বতঃ নিঃসৃত হইয়া, তন্নিম্নস্থ একটা ক্ষুদ্র শিবলিঙ্গ যুষ্টিৰ উপৰ পড়িতেছে; আব অদূৰে এক জটাজুটধাবী স্বৰ্গীয় মহাপুরুষ অজিনাসনে আসীন হইয়া, ধ্যান-স্তিমিত-নয়নে উপবিষ্ট আছেন। বাপ্পা নিকটবৰ্ত্তী হইবামাত্র যোগীৰ যোগভঙ্গ হইল, তিনি হস্ত-সঙ্কেতে বালককে নিকটে উপবেশন কৰিতে আদেশ

কবিলেন। বাগ্মার শরীরে বাজ-চক্রবর্তী সমুদায় লক্ষণ বিজ্ঞমান দেখিয়া, সন্ন্যাসী সাদর সম্ভাষণে তাঁহার পরিচয় গ্রহণ করতঃ, তাঁহাকে বহুবিধ শাস্ত্রীয় উপদেশ প্রদান করিয়া বিদায় দিলেন, এবং প্রতিদিন সেই সময়ে তথায় তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে বলিবার দিলেন। বালক গাভী লইয়া বাটী আসিল; কিন্তু সন্ন্যাসীর আদেশানুসারে এ কথা কাহাবও নিকট প্রকাশ করিল না।

মহাপুরুষের আদেশানুসারে বালক প্রত্যহ যথাসময়ে বিবিধ বস্ত্রকল পুষ্প ও দুগ্ধাদি লইয়া সন্ন্যাসিসমীপে গমনপূর্বক ভক্তিভাবে সেই “একলিঙ্গ” মহাদেবের ও সন্ন্যাসীর পূজা করিয়া নানাবিধ শাস্ত্রীয় উপদেশ-শ্রবণান্তর সন্ধ্যাকালে গো-সমূহ লইয়া গৃহে প্রতিনিবৃত্ত হইল। কিয়দ্বিবস এইরূপে অতিবাহিত হইলে একদিন সেই স্বর্গীয় মহাপুরুষ বাগ্মাকে কহিলেন,—“আমাব আব এখানে থাকিবাব প্রয়োজন নাই, আমাব কার্য সম্পন্ন হইয়াছে।” তিনি চিত্তোত্তর দিকে অঙ্গুলী-নির্দেশ-পূর্বক কহিলেন,—“তুমি এই বিস্তৃত প্রদেশের বাজ-চক্রবর্তী হইয়া ওই স্থানে রাজ্যস্থাপন করিবে; এই মধুস্বর “একলিঙ্গ”ই প্রকৃত প্রস্তাবে রাজা হইবেন, তুমি ইহাব নামে—ইহার ‘দিগবান’ হইয়া, রাজ্যশাসন ও ইহাব সেবা করিবে; আব তোমার উপাধি “রাণা” হইবে। অস্ত্র বিদ্যায় লও, কল্যা অতি প্রভূত্বে এখানে আসিও, আমি যাইবার সময় তোমাকে আশীর্বাদ করিবা যাইব।”

প্রাতঃ-সমীপণের প্রসাদে ক্লান্ত শ্রান্ত বালক বাপ্পা প্রদোষে শয্যা-পবিত্যাগ করিতে পাবিল না। অকণোদবে আশ্রমে উপস্থিত হইয়া দেখিল, সেই মহাপুরুষ দিব্য পুষ্পকবিমানে আবোহণ করিয়া উৰ্দ্ধপথে উখিত হইতেছেন। বাগ্মাকে দেখিবামাত্র বথ হইতে উঠে-স্বরে কহিলেন,—“আব সময় নাই, সম্ভব মুখব্যাদান কব।” বালক ইতস্তস্তি হইয়া উৰ্দ্ধমুখে যেমন মুখব্যাদান করিল, অমনি সন্ন্যাসী স্বীয় নিম্নবন তদীয় মুখে অর্পণ কবিলেন; কিন্তু বালক স্বর্ণা-প্রবৃত্ত তৎক্ষণাৎ তাহা মুখ হইতে ফেলিয়া দিল। তখন সেই

স্বর্গীয় মল্ল্যাসী সখেদে বলিয়া গেলেন,—“এই মুখামুখ উদবহু হইলেই তুমি অমরত্ব লাভ করিতে ; কিন্তু নিজের দোষে তাহাতে বঞ্চিত হইলে। তবে যে অস্ত্রের অভেদ হইবে, ইহা স্থির-নিশ্চয়।”

বাপ্পা স্বপ্নোখিতের ভাষা এই সকল অনামাত্ত ব্যাপাব প্রত্যক্ষ করতঃ কিষংকর্ণ কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া রহিলেন। পবে বিবিধ বস্ত্র-ফলপুষ্পাদি আহরণ কবিয়া, তক্তিভয়ে ভগবান্ একলিঙ্গের পূজা-প্রদক্ষিণ সমাপনান্তে দেখিতে পাইলেন, এক অলোকসুন্দরী রমণী তাঁহার সম্মুখে দণ্ডায়মানা ; তিনি সহাস্ত্রে বাপ্পাকে সম্বোধন কবিয়া কহিলেন,—“বৎস ! এই অক্ষয় কবচ ও তববারি গ্রহণ কব, অবিলম্বে চিতোবে গমন কবিয়া তত্রত্য বাজসিংহাসন গ্রহণ কব, রাজা হইয়া এই একলিঙ্গের মন্দিরের পার্শ্বে “সিংহবাহিনী মূর্ত্তি” প্রতিষ্ঠা করিও—তিনিই চিতোবের অধিষ্ঠাত্রী হইবেন।” এই কথা বলিয়া রমণী অন্তর্হিতা হইলেন।

গৃহে প্রত্যাগত হইয়া, বাপ্পা কথা প্রসঙ্গে মাতার নিকট চিতোবের কথা উত্থাপন কবিয়া জানিতে পারিলেন, চিতোবের রাজা তাঁহার মাতুল।

পরদিবস প্রাতে তিনি মাতা ও কতিপয় ভীল বালকের সহিত চিতোব যাত্রা কবিলেন। চিতোব-রাজ বাপ্পাব মাতার মুখে সমস্ত পরিচয় অবগত হইয়া ও বাপ্পাব অসাধাবণ বাজসৌন্দর্য্য দেখিয়া বাপ্পাকে একটী ক্ষুদ্র প্রদেশের সামন্তপদে নিযুক্ত কবিলেন।

কিষংকাল পরেই বর্ষের জাতি চিতোব আক্রমণ কবিল, রাজা এই যুদ্ধে প্রাণ হাবাইলেন। বাপ্পা এই সংবাদ শ্রবণে কতিপয় অল্পচববর্গের সহিত অনায়াসে শত্রু-কুল নিশ্চূল কবিয়া চিতোবের সিংহাসনে আবোহণ করিলেন, এবং একলিঙ্গ ও সিংহবাহিনীর মন্দির নির্মাণ কবাইয়া, মহাসমাবোহে দেব দেবীর সেবা চালাইতে লাগিলেন। এই সকল দেবমূর্ত্তি ও তদীয় গিবি-তুর্গ আক্ৰিও “হিন্দু-সূর্য্য ‘মহারাজা বাপ্পারাজ্য’এব” নাম ঘোষণা কবিতোছে। ইনি ৭২৮ খ্রীষ্টাব্দে চিতোবে রাজ্যস্থাপন করেন।

রাজপুত কবি ও ঐতিহাসিকগণ রাণার বংশকে “অযোধ্যাধিপ মহারাজ রামচন্দ্রের বংশ বলিয়া পরিচয় দেন; তাঁহাদের গণনানুসারে “বাপ্পারাও” রামচন্দ্রের অশীতি পুরুষ অধঃস্তন ।

কিষংকাল দৌর্দ্দিওপ্রতাপে সমস্ত মিবার রাজ্য শাসন করিয়া, মহাবাণা দিগ্বিজয়ে নির্গত হন এবং তদানীন্তন প্রবল ইরান, তুবান্ কাবুলীস্থান, জেবুলীস্থান প্রভৃতি প্রদেশে স্বীয় জয়পতাকা উড্ডীন করেন । কথিত আছে,—তিনি হিন্দু হইয়াও উক্ত পবাজিত স্নেচ্ছ বাজগণের কতাব পাণিগ্রহণ করিয়া ছিলেন । পবাজিত নরপতির কতাব পাণিগ্রহণ-প্রথা, প্রাচীন ইতিহাসেব কোন কোন স্থলে দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় তৎকালে “জীরদ্ধং হুঙ্কুলাদপি” চাণক্য পণ্ডিতের এই নীতিই সম্যক প্রবল ছিল ।

যাহাই হউক বাপ্পারাও কিয়দ্বিবস পইবাণ দেশে যখন জাতির সহিত সঙ্গীক বাস করিয়াছিলেন, এবং সেই স্নেচ্ছ দেশেই তাঁহার মৃত্যু হয় । কথিত আছে, দেশপ্রথানুসাবে স্নেচ্ছেরা তদীর শবদেহ দগ্ধ না করিয়া সমাধিস্থ করিয়াছিল ।

মিবারেব রাজপুত বমণীও তাঁহার মহিষী ছিলেন । তাঁহার মৃত্যুর পর এই মহিষীর গর্ভজাত সন্তানেবাই তাঁহার উত্তরাধিকারী হইয়াছিলেন ।

সমবসিংহ, ভীমসিংহ, প্রতাপসিংহ প্রভৃতি মহাবলপবাক্রান্ত নরপতিগণ এই মহাবাণা বাপ্পারাওএব বংশে জন্ম গ্রহণ করিয়া চিত্তোবেব সিংহাসন অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন । এই সকল মহাবীরের বীরত্বকাহিনী ভাবত ইতিহাসে সুবর্ণ অক্ষরে লিখিত বহিষাছে । মোগল সম্রাটের অভ্যুদয়ে যখন অনেক রাজপুত যবনেব সহিত বৈবাহিক সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, তখন কেবল এই মহাবাণা বাপ্পারাওএব বংশধরগণ মুসলমান সংস্পর্শে আপনাদিগেব বংশ কলঙ্কিত করেন নাই । এই জন্যই বাণার বংশ সমগ্র রাজপুতদিগেব মধ্যে অত্যন্ত উচ্চ ও সম্মানার্থ ।

ত্রিবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায় ।

মোহ।

যা'বে যদি যা'ক্ তবে, সবই চ'লে যা'ক্।

এ জীবন ধরা হ'তে,

যা'ক্ মরণের পাথে,

জদয় হ'উক দগ্ধ,—সৃষ্টি শূন্য ফাঁক্।

ভালবেসে অবশেষে এই হ'ল স্মৃতি,—

শিবে শিবে হলাহল,

মবমেতে অশ্রুজল,

মৃত্যু-হীন অন্তর্জলি, বজ্রে ভাঙা বুব।

ভূকায় ফাটি'ছে ছাতি, আঁধার ধরণী ;

সমুখে সবসী জল,

অতি স্নিগ্ধ স্নানীতল,

পরশে গবল তাহে উঠিবে অমনি !

নয়নের আগে কোলে আকাজ্জক ফল ,

উছল অমিয়-মধু,

দূর হ'তে দেখি শুধু.

ছুঁইতে যাইলে কাছে জলন্ত অনল !

বুগ্ মৃগাস্তব ধ'বে ব'বে একটাই

চোখোচোখি তরলতা,

বুকে বাসনার ব্যথা,—

আলিঙ্গনে দাবানলে পুড়ে হ'বে ছাই !

যুগপৎ স্মৃতি আর নয়নের দেশে
কে তুই দাঁড়ালি বল ?
চোখে তো'র অশ্রুজল !—
ওকি বালা ! কেঁদে তুই কাঁদাবি কি শেষে ?

আবাব আবাব কিবে আলিবি অনল ?
পবশনে—আলিঙ্গনে,
পোড়া'বি কি ছুইজনে ?
অধব-অমৃতে পুনঃ পিষাবি গবল ?

থাক্ দূবে, আব নাবে, ভাঙ্ এ স্বপন,—
আজি এ উন্মত্ত মোহে,
ছাড়াছাড়ি হ'ক্ দৌছে,
সে বহু-কথা আব তুলো না কখন ।

সে গানের ছত্র যদি পড়ে কতু মনে ;
ভেবো কোন সন্ধ্যাকালে,
কে গেয়ে গিয়েছে চ'লে,
তা'রি ভাঙা ভাঙা স্রব বয়েছে স্ববণে ।

এ জনমে সে বাদনা পূরিবে কি আব ?
যে বিনা চলে না দিন,
সে হ'বে বিস্মৃতি-লীন,
জীবন হাবা'য়ে হ'বে জীবন-ব্যাপাব ?

যাই হ'ক্, প্রিয়ে ! তুই দাঁড়া একবার ;
ওই মুখ চিবতবে,
দেখে ল'ব অঁখি ভ'বে,
যে মুখে হাসিত বিশ্ব, হাসিত সংসার ।

দেখেনিয়ে প্রেম-কাব্য করি সমাপন ;
একে একে স্মৃতিদলে,
ফেলে দি' জাহ্নবী জলে,
মরণে জীবন-ব্রত করি উদ্ধাপন!

চাহি না ভুলিতে, তব্ ভুলিবারে চ'বে।
আপনি আপন প্রাণ,
দিতে হ'বে বলিদান,—
হায় হায়! ভালবেসে কে ভুলেছে কবে?

জীবন্ত সে' প্রেম, সখি! নহে ভুলিবার ;
তথাপি সংশয় যদি,
স্পর্শে ক'ভু তব কনি,
আম্রাব গাশানে তুমি য়েও একবার।

চূর্ণ এক অস্তি-খণ্ড তুলে ল'য়ে, হায়!
অতীত স্বপন-স্মৃতি,
একবার ধোবো বুকে,—
প'ড়ে দেখো, ওই নাম লেখা আছে তা'র!

দোকানদারী ।

সাংসাৰ একটা প্রকাণ্ড বাজার ; নর নারী সব ক্রেতা বিক্রেতা ।
তুমি সেই বাজাবে ঘব বাঁবিবাছ, কেনা-বেচা তোমাকে কবিতাই
হইবে । দোকান-পাট না বসাইলে, হাঁক-ডাক গলাবাজী করিতে
না পাবিলে, এখানে তোমায় কেহ চিনিবে না, আদব কবিবে না ।
যেখানে ষোল আনা দোকানদারী, সেখানে তুমি এবাকী কোন
উচ্চতর উদ্দেশে চালিত হইয়া তাহার প্রতিবাদী হইলে, তোমাকে
গলাধাক্কা খাইয়া, সাশ্রনয়নে ফিবিয়া আসিতে হইবে ; ইহা ভাবিয়া
তুমি বিস্মিত হও কেন ?

বাজাবে যখন আসিয়াছ, তখন তুমি ক্রেতাই হও, আর
বিক্রেতাই হও, দোকানদারী তোমায় শিখিতে ত হইবে ! ইহাতে
ভালকণ অভ্যস্ত হইতে না পার, এখানে তোমাব আদর অভ্যর্থনা
হইল না । যে যত পাকা দোকানদার, তাহার তত পসার প্রতি-
পত্তি । পাকা দোকানদার হইতে হইলে, চক্ষের পরদা ছ'খানি
তুলিয়া রাখিতে হইবে, ঝুটা মালের আমদানী কবিতো হইবে ;
সেই হিসাবে গলা শানাইবা হাঁক-ডাকের স্রব চড়াইতে হইবে ।
অগ্রথা তুমি দোকানদারী করিতে পারিবে না । দোকানে ভাল
মাল থাক, আর নাই থাক, মাল কাটতির দ্বারা উদর-পূতির জন্ত
তোমাকে শতমুখে বিক্রেত মালের গুণ-কীর্তন করিতে হইবে । এক
কণায়, নিজমুখে আশ্র-ঘোষণা কবিতো হইবে ; তিলকে তাল করিয়া
তুলিতে হইবে । না পাব, তুমি আর দশজনের বিষ-নয়নে পড়িবে,
উপহাসের পাত্র হইবে । স্রুতবাং এ সংসাবে তোমাব স্থান হইবে না ।

খাটী জিনিষ বিক্রয়ের নিমিত্ত বাজাবে দোকান বসাইবার
আবশ্যকতা হয় না, ক্রেতার দৃষ্টি আকর্ষণের জন্ত গলাবাজী
হাঁকাহাঁকিবও প্রয়োজন হয় না । যাহা খাটী—তাহা—সাধারণের
নীচ-স্বার্থ-প্রণোদিত উন্নত-আবেগ-আকাজক-সজ্জাত প্রবল কোলাহলের

কেন্দ্রস্থল—বাজারে—দোকানে মিলে না, তাহা—সংসার-বাজারের বহুদূরে—সাধারণ দৃষ্টির নিভৃত অন্তবালে—অতল-জলধি-রূদয়ে লুপ্ত-গিত শুক্তি-কোটবহু বস্ত্রের জ্বায় বিবাজ কবে; বহু আয়াস ও কষ্ট স্বীকার কবিশা তবে লাভ করিতে পাবা যায়।

সূর্যোদয় হইতে সূর্যাস্ত পর্য্যন্ত এই যে মানব-সমূহ ছুটাছুটি কবিশা কেনা-বেচা কবিতেছে, ইহার ভিতবে খাঁটি মাল চিনে কয় জন? দেখিতেছি—সকলেই নকল-প্রিয়, কুটা মালের খবিদার। কিন্তু কেহ কখনও চিনিলেও, দোকান সাজানোর পরিপাটো, জিনিসের বাহু চটকে এবং দোকানীর হাঁক-ডাকের চোটে দিশে-হাবা হইয়া প্রাণান্ত পণ কবিশাও সেই ছাইমূঠা সোণামূঠা বলিয়া গ্রহণ কবিতেছে; এক কিনিতে আসিয়া, আব কিনিয়া লইয়া যাইতেছে; পদে পদে প্রভাবিত হইতেছে।

এই প্রকাণ্ড বাজারের যে পটীতেই যাইবে, সেই খানেই দেখিতে পাইবে, খাঁটি মালের নাম গন্ধও নাই, কেবল কুটা মালের আমদানী—ছড়াছড়ি; দোকানদারীর বাড়াবাড়ি, ছড়াছড়ি। প্রেমের পটীতে যাও, দেখিবে কত নব নাবী প্রেম-পদবা মস্তকে লইয়া দ্বাবে দ্বাবে কিবি কবিশা বেড়াইতেছে। আব তাহারাই কিন্তু স্নেহে স্বচ্ছন্দে, আমোদে প্রমোদে, হাসিয়া খেলিয়া দিনপাত কবিতেছে। যে সেকপ কবিতে পারিতেছে না, সে কুন্দনন্দিনী কিশা কর্ভেলিয়া, অষ্টেভিয়া কিশা এবেলার্ভের জ্বায় এককোণে নীরবে কাঁদিয়া কবিশা যাইতেছে; তাঁহাদের খোঁজ-খবর কেহই লইতেছে না।

ঘোজের ভিতবে—যেখানে লোক-সমাগম বিরল,—সেখানে দোকান বসাইলে ব্যবসায় ভাল চলে কি? কখনই না। সেই জন্ত বহুগোকেব দৃষ্টিপথে—সদব—বড় রাস্তার উপর দোকান খুলিবার জন্ত সকল দোকানীই ব্যস্ত। অধিকন্তু যদি ঘানীতে যুক্ত ভ্রাম্যমাণ বলদের কণ্ঠসংলগ্ন অবিশ্রান্তশব্দকরী ঘণ্টার ন্যায় একটা ঘণ্টার বাবস্থা করিতে পার, তাহা হইলে, তোমার

দোকানে খরিদাবের কখনই জ্ঞান হইবে না। স্ত্রীরাং এখানে নীরবভাবে আড়ালে কোন কার্য করিতে যাওয়া বাতুলের বাতুলতা-মাত্র। হৃদয়ের অপরিসীম দুঃখ বস্ত্রগায় ঘরের কোণে চুপে চুপে অঞ্চলে মুছিয়া ফেলা হই বিন্দু চক্ষের জলেব মর্ম্ম, এখানে কেহ বুঝিবে না। স্বর সপ্তমে চড়াইয়া গগনভেদী আর্দ্রনাদে - যদি সংসারটা সস্তানিত—বিকশিত করিতে পার, তবেই তোমার দুঃখ-বস্ত্রগার গুরুত্ব কতকটা উপলব্ধি হইবে। বস্ত্রতঃ, প্রাণে দরদ হউক বা না হউক, চক্ষে জল না আনিলে, তেল দিয়াই হউক, বিনাইয়া বিনাইয়া নানা ছাঁদে ক্রন্দনেব ছলে খানিকক্ষণ টেঁচাইতে পারিলেই, তোমার কাজ হইল। দেখিবে, কতজনে কতভাবে চিরাভাস্ত ‘আহা’ ‘হুহু’ বোলে তোমাকে সাস্থনা করিতে অগ্রদব হইবে। মোদা কথা, নিছক দোকানদারী চাই।

বিজ্ঞাবুদ্ধি পটাতে দেখিবে, যে সব ব্যবসায়ী বগুদামে কিছু নাই, তাহাদেবই সাজসবজাম, হাঁক-ডাক বেশী বেশী। আশ্রমেধ ঘোড়ার কপালস্থিত জয়পত্রবৎ স্ব-লিখিত আশ্রমবোধনা-প্রচারিণী বিজ্ঞাপনী আঁটিয়া সকলকে উত্কট ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছে। তাহাদেব অঙ্কুরদৃষ্ট উদ্ধত আশ্রমালন উল্লম্বন দেখিয়া, যাহাদেব গুদামে বা ঘটে কিছু আছে, তাহা বা শাস্ত্রবাক্যের সার্থকতা করিবার জন্তই বোধ হয়, শত হস্ত দূবে সবিধা গিয়া একটু হাঁফ ছাতিয়া বাঁচিতেছেন।

সুনারের পটাতে দেখিবে, যাহার ঘবে সুনাম-অর্জনেব জন্ত বিনিময় করিবার মত কোন জিনিষই নাই, সেই আপন নামেব জয়ঢাকটা অপব একজনেব স্বন্ধে চাপাইয়া দিয়া আপনই তাহাতে সজোবে কাটি মাঝিতেছে, আব তালে তালে নৃত্য করিতেছে, অশবে বাহবা না দিলেও, নিজেই বাহবা দিয়া আসব মাত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। প্রকৃত দোকানদারী ইহাকেই বলে।

ধর্ম্মহাটায় গিয়া দেখ, স্ত্রী ব্যবসায়ী, স্ত্রী যে পরিমাণে মাল মজুত আছে, তাহাব দ্বিগুণেব বায়না করিয়া, অপরা সকলকে

সুস্থিত করিয়া বাহাহুৱী লইতেছে। আর সেই ছিটা-কোঁটা মালের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপাদনোদ্দেশে গলাবাজীর চোটে আব লেখনীব ঠেলায় বিধাতার সৃষ্টি যেন উন্টাইয়া ফেলিবার প্রয়াস পাইতেছে। সৃষ্টির গাঁথুনী বা বনিয়াদ বড় শক্ত, তাই সে চেষ্টা আক্সিও সফল হইতেছে না।

ভাই! এইরূপ সকল বিষয়েই। তাই বলি, যদি সংসাবে সংসারী সাজিতে ইচ্ছা থাকে, তবে এই দোকানদাবীতে নিপুণতা লাভ কব। সহজ-সাধ্য না হইলেও, চেষ্টা কর। বক্তৃতাথানা তাস চেনাষ বড় কিছু বাহাহুৱী নাই, যা কিছু বাহাহুৱী ঠিক হিসাব বাখিয়া খেলাতে জয়লাভ কবা। অনেক বকম যোগ, বিযোগ, ভাগ, পূরণ এবং কৌশলচাতুরীতে অভ্যস্ত হইতে পাবিলে, তবে লোকে সুদক্ষ সূনিপুণ দোকানদাব হইতে পাবে। দোকানদাবীর কোড্ (Code) সম্পূর্ণ আলা-হিদা। এই কোডেব যে ভাল কবিয়া অভ্যাস-আলোচনা কবিবে, তাহাবই এই সংসার-বাজারে জয়লাভ ঐব-নিশ্চিতই। যে তাহা না পাবিবে, তাহাব সংসার-পবিত্যাগ করিয়া বনে জঙ্গলে যাওয়াই শ্রেয়ঃ। অত-এব, যখন দোকান খুলিয়া বসিয়াছ, তখন পেশাদারী কবাই স্মৃদ্ধি-সম্মত এবং তাহাই কর, না পাব, পাততাজী গুটাইয়া এ ক্ষেত্র হইতে ঝটিতি প্রস্থান কব, সময় থাকিতে হুকুল বজায় বাখিবাব চেষ্টা কব।

স্মৃতি ।

দূবে দূরে—তুমি আমি কতদিন হাব !
হ'বে কি না এ জনমে দেখা পুনবায় !
তবু সেই ভালবাসা হৃদয়ে জাগায়—
অযুত মধুব আশা—দীপ্ত কল্পনাষ !
পাষণ কঠিন চির—নির্ম্মম—নির্দয়—
সংসাব আঘাতে যবে বিক্লিপ্ত হৃদয় ;

একটু করুণ দৃষ্টি, একটা সন্দেহ
 সম্মুখে বাক্যের তরে চারিদিকে চায় ;
 গত স্বপনের মত চির মধুময়
 তোমারি সে চারুমুখ—ভালবাসা স্থতি
 জীবনে বিশ্বাস আনে ; কি এক আশা
 ভাবে দেয় আমার নৈরাশ্র-ক্লান্ত-হৃদি ।
 তুমি সহ—আছে তব ভালবাসা স্থতি
 বাণের চিত্তাসম—কঠোর অবিধি !

শ্রীচারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

মহামায়া ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর ।]

(৮)

সাবদাসুন্দরী ব সেই দিন দেশে আসিবাব কথা । রমাপ্রসাদ
 নিভেব আসিতে বিলম্ব দেখিয়া, সাবদাসুন্দরী জেদে তাহাকে
 আগে হইতেই বাটী পাঠাইলেন । তাহার আসিবাব সংবাদ হুই
 স্থানেই প্রেবিত হইলেও, কিন্তু মহামায়া সংবাদ পাইবাব পূর্বেই
 বাটী হইতে বাহির হইয়াছিল । বাড়ীর দাস-দাসী সাবদাসুন্দরীকে
 আনিতে ষ্টেশনে গিয়াছিল । রমাপ্রসাদের মা বৃদ্ধা বড় একটা
 বাহিরে আসিতেন না । কাজেই মহামায়া এই অগ্রায় আদব-
 পীড়নে বাধা দিতে শীঘ্রই সে স্থানে আসিবাব বড় একটা বেহ
 ছিল না ।

উপায়ান্তর না দেখিয়া, বালিকা মহামায়া চুপে তবঙ্গে সলজ্জ
 মুখখানি ভাসাইয়া চুপ কবিয়া বসিয়া বহিল । বিশ্বাস ছিল, শীঘ্রই
 মা আসিয়া তাহাকে এই অপরিচিতার অঙ্ক-কারাগার হইতে মুক্তি-
 প্রদান করিবে ।

বহুক্ষণ অপেক্ষা কবিল, মা আসিল না। আর মহামায়াও নিজে কি কবিত্তে আসিয়াছিল, ভুলিয়া গিয়াছিল। ‘ন যযৌ ন তন্তৌ’—কেবল বালিকাকে মা বলিবার জেদ কবিত্তে লাগিল। বালিকা চাবিদিকে বাববাব চাহিল—মা আসিবার কোন নিদর্শন দেখিল না। তখন মুক্তির অন্ত উপায় না দেখিয়া, অগত্যা মহামায়াকে মাতৃসম্বোধনরূপ উৎকোচ প্রদান কবিল।

এমন সময় বালিকার মাতা তথাব আসিয়া পড়িল। মা দেখিল, কত্কা এক অপবিচিত্রাব কোণে উঠিয়া তাহাকে মা বলিয়া ডাকিতেছে। আব দেখিল, তা’ব ছুটি পদ্মপল্লবে জল ঢল ঢল করিতেছে।

বালিকার মাতাও সাবদাসুন্দরীৰ গৃহে নবাগতা। সেও কখন সাবদাসুন্দরীকে দেখে নাই। বাজেই মমতামবী মহামায়াকে সে একেবাবে সাবদাসুন্দরী স্থিৰ কবিতা ফেলিল। বলিল—বতক্ষণ আসিলে বউ ?

মহামায়াৰ কুটুৰিনী সম্বন্ধে নূতন পুৰাতনত্ব ছিল না, পৰিচয় অপৰিচয় ছিল না। যেখানে তৃপ্তি পাইত, সেই থানেই পৰিচিত্রাব মত ব্যবহাব কবিত,—পৰিচয় হইতে হয়, পৰে হইবে। মহামায়া বালিকার মাতাব প্ৰশ্নে উত্তৰ না দিতা বলিল,—“এটি কি ভাই তোমাবই মেবে ?”

বালিকার মাতাব মুখে সহসা বিষাদেব ছাবা পড়িল, চক্ষু ছল ছল কবিতা আনিল, আধ জডান সবে বলিল,—

“কেমন কবিতা বলিব ?”

মহামায়া তা’ব মুখেব দিকে বেশীক্ষণ চক্ষু বাণিবাব অবকাশ পায় নাই। সে বালিকার মুখেব সৌন্দৰ্য্য ব্যববাব দেখিতাও তৃপ্তি পাইতে ছিল না, তা’ই বালিকার মাতাকে প্ৰশ্ন কবিতাই মুখ ফিৰাইবা, বালিকার মুখ আবাব চুৰ্চিত কবিল। তাহাব প্ৰশ্নে মুখ না ভুলিতাই বলিল,—“বলিতে পাব আব না পাব, এখন হইতে এই ছুটী মেঘেটাব “মা” বলাব অন্ধক ভাগ আমায় দিতে হইবে।”

এই কথা বলিবার পূর্বে সৰ্কানানী মহামায়া কত চিন্তাই করিয়া লইল। মুহূর্ত্তমধ্যে রাশি রাশি চিন্তাব আবরণে পড়িয়া আত্মহার হইয়া পড়িল। উত্তর দিবার পূর্বে এবারেও বালিকার পরিচয় লইবার অবকাশ পাইল না।

বালিকার মাতা তাহার হাত ধরিয়া বাড়ীতে লইয়া চলিল। ঘাইতে ঘাইতে মহামায়া বালিকার নাম জিজ্ঞাসা করিল। শুনিল ‘নলিনী’। মহামায়ার সৰ্কান্ন আবার শিহরিল। বালিকার মাতাব ললাটেব দিকে দৃষ্টি পড়িল, সেখানে সিন্দূর দেখিল না। বাম-হস্তেব দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল, দেখিল হাতে লোহা নাই। জিজ্ঞাসা করিল,—“তোমার এ অবস্থা কতদিন হইয়াছে?”

“দুই মাস।”

“স্বামীব কি হইয়াছিল?”

“কি হইয়াছিল?”

মহামায়া দেখিল, অপবিচিত্তা যুবতীর স্তন্যর মুখশ্রী সহসা রক্ত-বাগ-বজ্জিতা হইয়া গেল।

“কি হইয়াছিল? কি বলিব ভাই?—বলিলে বিশ্বাস করিবে কি? একটা কালসৰ্প আব কালনাগিনী, আমার স্বামীর মস্তকে দংশন করিয়াছিল। ঘবে চল বসিয়া বসিয়া সমস্ত দুঃখ-কাহিনী বলিব।” বলিতে বলিতে যুবতী কাঁদিয়া ফেলিল।

মহামায়াৰ পা টলিতে লাগিল। তা’বপর যুবতী একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিতে আরম্ভ করিল;—“আমার স্বামী মেদিনী-পুরেব কাছারিতে কাজ করিতেন—”

মহামায়া দাঁড়াইল—বালিকাটীকে কোল হইতে নামাইল। তাব পব বলিল,—“একটা কাষ আছে, সাবিয়া ফিৰিয়া আসিতেছি; আসিয়া সমস্ত কথা শুনিব।”

প্রয়োজনব কথা শুনিয়া যুবতী মহামায়াব হাত ছাড়িয়া দিল। মহামায়া ববাবব বাটীর বাহিরে আসিল—আবার পাকীতে উঠিয়া বাটী ফিৰিয়া গেল।

মহামায়া চলিয়া গেলে, বালিকা মাকে জিজ্ঞাসা কবিল,—

“হাঁ মা ! ও কে গা ?”

মা বলিল,—“তোয় আব এক মা ।”

বালিকা বলিল,—“তবে এতকাল দেখি নাই কেন ?”

মা বলিল,—“আমাদের অদৃষ্ট ।”

তাহাবা সেই স্থানে দাঁড়াইয়া বহিল—দাঁড়াইয়া অপবিচিত্রাব ফিবিবাব আশায় বহুক্ষণ অপেক্ষা কবিল—অপবিচিত্রা ফিবিল না । তখন মা মেঘেকে ঘরে যাইতে অন্ত্রবোধ কবিয়া, আপনি বাটাব বাহিবে গেল । সেখানেও অপবিচিত্রাকে দেখিল না । বহুক্ষণ দাঁড়াইয়া বহিল, পলিগ্রামের পথ, দুই একজন কচিং আসিল—চলিয়া গেল অপবিচিত্রাব আসিবাব কোনও নিদর্শন দেখা গেল না । যুবতী বিস্মিতা হইল । বিশ্বয় ক্রমে উৎকণ্ঠায় পবিণত হইল । বাড়ীতে পা দিবাট, কোথায় ফিবিল ? গৃহ-প্রবেশোন্মুখী ‘আদি’ বলিয়াই চলিয়া গেল, এখনও ফিবিল না কেন ? সে কি সাবদা-সুন্দরী ! যুবতীর সন্দেহ আনিল । মহামায়াকে যেন কোথায় দেখিয়াছি, মনে কবিল । মনকে—সেই কোথায়—ফিবাটবাব বহু চেষ্টা কবিল—পানিল না ।

বহুক্ষণ অপেক্ষা কবিয়াও যখন অপবিচিত্রাকে ফিবিতে দেখিল না, তখন যুবতী বাটী ফিবিতে মনঃস্ত কবিল । দুই একপদ অগ্রসব হইয়াছে, এমন সময় দূবে পাকীবাহকের কণ্ঠশব্দ তাহাব শ্রুতি-গোচর হইল । যুবতী বুঝিল অপবিচিত্রা আবাব ফিবিতেছে । সে আবাব অগ্রসব হইল । বহির্ক্সাটীতে পা দিয়াই দেখিল, বাটাব দাস-দাসী পাকীব সহিত ছুটিয়া আসিতেছে ।

বাটীর উঠানে আসিয়া পাকী থামিল । দাসী যুবতীকে দেখিয়া মায়ের গুভাগমনের সংবাদ দিল । যুবতী আগুবাডাইয়া আনিতে গিয়া দেখিল—একি ! এই যে সাবদাসুন্দরী ।

[ক্রমশঃ]

শ্রীমদ্বৈবোদগ্রসাদ তট্টাচার্য্য ।

ললনা-মহিমা ।

[পূৰ্ণ প্রকাশিতের পর]

৭৩

তুমি গো প্রসন্নমবী কুল পাবিজাত,
নর-পশু নাহি চিনে,
দলে তাই অঘতনে,
তবুও বিলাও জীবের সৌভ সজাত ।

৭৪

মধুব চবিত্র তব পবিত্র সবল,
মধুব তোমাব কেশ,
মধুব তোমাব বেশ,
মধুব মাধুবী হেন ধবায় বিবল ।

৭৫

বাননে কুসুম ফোটে, কুস্তল কববী
সাজাইতে সঘতনে,
কবে চেষ্টা প্রাণপণে,
ঘোব নিশাকালে যেন তাবকা সুন্দরী ।

৭৬

অস্ত্রবা চাষেছে ছায় কুসুমের মালা ।
বলে “মাথে নাহি ব’ব,
গলা ধরে ছলে যা’ব,
মুখপানে চেয়ে র’ব যেন মুগ্ধবালা ।”

৭৭

ছিঁড়িল কুসুম দাম পড়িল চবণে,
কহিছে কুসুম কলি,
‘পেয়েছি সুধাব স্থলি,
এ চবণ ধ্যান মম শয়নে স্বপনে’ ।

৭৮

যামিনীতে জাগে ষত তারকা-সুন্দরী,
হেবিত্তে তোমার হাদি,
নীলাকাশে হাসে শরী,
প্রমত্ত সবাই তা’রা অন্ত বিভাববী ।

৭৯

পাখী গায় শাখী পবে কাকলী লহবী,
কহিছে—কুজন তাব,
এ সংসারে হবে দাব,
পশে যদি শ্রুতিমূলে তোমাব সুন্দরী ।

৮০

মকরন্দ মধুপানে মধুপ মোহিত,
বলে ফুল “কোথা গেলি, ?
একা ফেলে পলাইলি,
গুঞ্জে গুঞ্জে পড়ে পদে কবগো বিহিত ।

৮১

কতকপে বিবাজিতা মহিলা সংসারে,
তুমি গো দযাব নদী,
তুমি না থাকিতে যদি,
অতিথি ফিরিত গৃহে বিষ্ময় অন্তরে ।

৮২

মবি মবি পেতে তব দয়া ভালবাসা!
বিহঙ্গম ভাজে বন,
আদে তব নিকেতন,
প্রেমের শৃঙ্খল পবে নাহি ভয় বাসা ।

[ক্রমশঃ]

শ্রীকিরণচন্দ্র দত্ত ।

ভেক।

ভেথ নথ—ভেক। ভেথের কথা আব এক সময় বলিব ; আজ ভেকেব কথাই বলিয়া যাই। বোধ হয়, ভেক যত ক্ষুদ্র-জীব, কথাটা তত ক্ষুদ্র হইবে না।

পল্লীগামে একটা প্রকাণ্ড ছোট-বড় আম-জাম কাঁঠালের বাগানেব এক পার্শ্বে আমার বাড়ী, বাড়ীর সদবে পাড়াব বোসেদেব প্রকাণ্ড পুষ্পবিশী, পূর্বে সেই পুকুবে অনেক জল ছিল, জকেবও দান ছিল, আবাব জটেবুড়ীভ ভয়ে গাঁয়ের ছোট ছোট ছেলে মেয়েবা ভয়ে ভলে নামিয়া স্নান কবিতে পারিত না। এখন বোসেদেবও দশা যেমন, পুকুরেব দশাও তেমনি ; জক বা জটে-বুড়ী থাকুক বা না থাকুক, জল কিন্তু নাই বলিলেই হয়। পাটা সেওলাষ পুকুবে ভবিয়া গিয়াছে, পাকও বড় কম নয়।

আমাব ঘবেব জানালা হইতে পুকুৰটী বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে আমি বাড়ী আসিয়া সেই জানালাব নিকট বসিয়া থাকি। এবাব বড় গ্রীষ্ম, জানালাব পার্শ্বে আম গাছেব ডালে বসিয়া “ফটি-ঈ-ক জল” পাখীগুলি মধ্যাহ্নে মনেব সাধে আকাশেব আবাধনা কবিতেছে, কতকগুলি ব্যাং বোসেদেব সেই পচা পুকুরেব পাঁকে ও পাটা-সেওলাব মধ্যে লাফালাফি, আব গ্যা—ওঁ গ্যা গো—ওঁ কবিয়া চাবিদিক নিনাদিত কবিতেছে, আমি দেশেব দাকণ জলকণ্ঠেব কথা বাঙ্গালা কাগজেব সম্পাদক ভাষা-দিগের নিকট লিখিয়া পাঠাইব ভাবিয়া মহা আড়ম্বর কবিয়া কাগজ কলম লইয়া লিখিতে বসিতেছিলাম ; এমন সময় ব্যাংএব ঐ ডাক শুনিয়া হাঁ-কবিয়া আকাশ পানে চাহিয়া রহিলাম, ভাবিলাম আব ভয় নাই ; কিন্তু ঘন ঘন আকাশেব দিকে চাহিয়াও কোথাও বিন্দুমাত্র নবঘনের সন্ধান দেখিতে পাইলাম না। ব্যাংগুলি কিন্তু বিকট চীৎকাব কবিতেছে, আমি একপ্রকাব বিরক্ত হইবা উঠিলাম, মনে মনে নিরীহ ভেক জাতিব উপর অবিরাম গালি পাড়িতে

লাগিলাম, এমন সময় আমার গদ্য পদ্য বিধাঙ্গিনী লক্ষ্মী-সবস্বতী-স্বকপিনী নয়ন-মন-বিমোহিনী শ্রীমতী পূণ্যপ্রভা গৌদ অলঙ্কার ধ্বনিত গৃহ-মন প্রকম্পিত কবিতা কিঞ্চিৎ মিঠে হাসি হাসিয়া ও সেই সঙ্গে প্রেম-মদানলিত-নয়নে অপাঙ্গে চাহিয়া নির্জন কক্ষ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। মুহূর্ত্তে আমার সকল স্বপ্ন ভাঙ্গিয়া গেল, ভাবিব না দেখিব,—কিছুই স্থির কবিত্তে পাবিলাম না, যেমন হাঁ কবিতা বসিয়া ছিলাম, তেমনই স্থাপুৰং বসিয়া বহিলাম। তত্বক্ষী তখন নিকটে আসিয়া হাসিয়া হাসিয়া বলিলেন,—“শ্রীযুত কি এখন রাজস্ব কমিসনে সুবেঙ্কনাথের সাক্ষ্যের ভাবনা ভাবিতেছেন—আমরা কি কেও নই?”

আমি শশব্যস্তে বলিলাম,—“না গো না, ঐ বোসেদেব পুকুরে ব্যাংগুলা ডাকছে, তাই শুনিছি।”

সুমধ্যমা তখন কিঞ্চিৎ ক্রোধ প্রকাশ কবিতা বলিলেন,—“পোডাবমুখো ব্যাংগুলো কেবল ডেকে ডেকেই মব্ছে, জল বোখাষ তাব ঠিক নাই। সেকালে ব্যাং ডাকলেই জল হ'ত, আব আজ-কাল দেখ না—মূলে মেঘেবই নাম নাই।”

এই বলিতে বলিতে সুহাদিনী আমার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। তাঁহাব এই কথাষ আমার মনটায় ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের কত কথা উদ্ভিত হইল, কি যেন ভাবোচ্ছ্বাসে হৃদয় ভবিষ্যৎ গেল। নিষ্পন্দনয়নে প্রিয়তমাব মুখ পানে চাহিয়া বহিলাম, আমার ভাব দেখিয়া একটু চোখ টিপিয়া সুন্দরী বলিলেন,—“আবাব কি পদ্য মনে পড়িল নাকি?”

আমি হাসিয়া বলিলাম,—“ও গো না। তুমি ঠাট্টা ব'ব কেন? ব্যাং ডাকলে এখনও জল হয়, তবে তেমন ডাকে কই?”

সুন্দরী অপেক্ষাকৃত উচ্চ হাসি হাসিয়া বলিলেন,—“কি বকম?”

আমি গম্ভীর ভাবে বলিলাম,—“হাঁ ভুলিয়াছে, অবশ্য ভুলিয়াছে, ব্যাংগুলা স্বব হাবাইয়াছে ঠিক স্ববে ডাকিতে পাবে না। মল্লাব বাগে মেঘ হয়, জলও হয়; সেকালের ব্যাংগুলা মল্লারের আলাপ জানিত,

মন্দির গাহিত, তাই মেঘ হইত, জলও হইত ; এখন উহারা তাহা নিশ্চয় ভুলিয়া গিয়াছে। আমরা যেমন সকলই হারাইয়াছি, সকলই বিসর্জন দিয়াছি, আমাদের ধর্ম নাই, কর্ম নাই, শিক্ষা নাই, সাধনা নাই, হৃদয় নাই, ভক্তি নাই, বিশ্বাস নাই, প্রাণ ভরিয়া দেবতাকে ডাকিতে পারি না, দেবতাবাও দেখা দেন না, দ্বংসও ঘূর হয় না। আমরা বলি—দেবতাদের দোষ, তাহারা দেখেন না—দেখা দেন না—কিন্তু তা নয়—বুঝিয়াছ কি ? আমরা বাহ্য-দৃষ্টবে ভুলিয়া বীজ-মন্ত্র ভুলিয়াছি, সন্দেহবাদী হইয়া ঈশ্বর বিশ্বাস হারাইয়াছি—সার ভুলিয়া অদারে মজিয়াছি, কেবল লোক দেখান উপাসনায় চটক দেখাইয়া বেড়াই, তাই দেবতার রূপ-লাভ করিতে পারি না। আমরা যেমন অধঃপতিত হইয়াছি, ঐ হততাগা ভেকগুলাও তেমনি অধঃপতিত হইয়াছে ; উহারা কেবল জঙ্ঘা আলাপে মত্ত, হয় ত তাল-লয়-মান সকলই ভুলিয়া গিয়াছে, সে জঙ্ঘা আলাপও বিগুপ্তরূপে গাহিতে পারে না ; মন্দির ত আদৌ অবগত নহে, এখন বুঝিলে কেন দিনরাত ভেকগুলা ডাকিয়া মরিলেও জল হয় না ?

শ্রীশ্রীমলাল মজুমদার।

স্বরলিপি।

ঝিঝিট খান্ধাজ—একতাল।

কথা—শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ।

সুর—শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ।

এস এস সবে সখীগণ মিলি' ভ্রমিব কুসুম-কাননে ;

ভ্রমিব কুসুম-কাননে, তুলিব কুসুম যতনে।

মল্লিকা মালতী, বেল যুঁতি যাঁতি, ফুটিয়াছে ফুল আব নানাজাতি,

হেলিছে, ছলিছে, মাতিছে, মহিছে, সুমন্দ মলয়-পবনে ,

মলয় মৃদল বহনে।

কুহু কুহু কুহু কোকিল কুজন, হানি'ছে মবমে যেন পঞ্চবাণ,

বিনা প্রাণপতি বাঁচে কিলো সতী, ছবস্ত মদন-তাড়নে ;

বাঁচে কি অবলা জীবনে।

প্রথম অন্তরা।

০ ১ +
 ষ্ণ ন ণ্ণ ষ্ণ ঞ্ ঞ্ ষ্ ঞ্ ষ্ ণ্
 ম লি কা মা ল তী বে ল

১
 ণ্ ণ্ ণ্ ষ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্
 য় তি জী তি

০ ১ +
 ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্
 কু টি যা ছে কু ল আ

১ ০
 ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্
 ব না না জা তি হে লি ছে

১
 ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্
 হ লি ছে মা তি ছে য়ো

০ ১ +
 ষ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্
 হি ছে হ ম ন ম ল য় প

১ ০
 ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্ ণ্
 ব নে ম ল

১ + ১
 ষ্ ঞ্ ঞ্ ষ্ ঞ্ ম ঞ্ গ ম
 য় য় হ ল ব হ নে

দ্বিতীয় অন্তরা ।

০ ১ +
 ষ নি নি ষ ঞ ঞ ষ ষ নি নি সা
 ক হ ক হ ক হ কো কি ল

১
 ষ নি সা ষ সা সা নি নি নি
 ক জ ন

০ ১ +
 সা নি সা নি সা নি সা ষ গ ষ সা
 হা নি ছে ম ব মে যে

১ ০
 সা নি নি নি নি নি সা সা সা গ
 ন প ক বা গ বি না প্রা

১ +
 ষ ম গ ষ সা সা ষ সা নি ষ
 গ প তি বা চে কি লো স

০ ১ +
 সা ঞ ঞ ঞ ষ ষ ষ নি নি সা
 তী হ র জ ম দ ন তা ড

১ ০
 ষ সা নি সা নি ষ ষ নি ষ ঞ
 নে বা চে কি অ

১ +
 ঞ ষ ঞ ম ঞ গ ম
 ব লা জী ব নে

ত্রিভঙ্গক বোষ ।

বীণাপানি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে । ভগবতি, ভারতি দেবি নমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । } আষাঢ়, ১৩০৪ সাল । } ৬ষ্ঠ সংখ্যা ।

মহামায়া ।

[পূৰ্ণ-প্রকাশিতের পর ।]

(২)

মেদিনীপুরেব সেই ব্রাহ্মণেব কিঞ্চিৎ বায়ুবোগ ছিল । কৃষ্ণ-ধনেব পুত্রেব সহিত কন্তাব বিবাহ হইবে, এই বিশ্বাসে তাহাব আনন্দ এতই বৃদ্ধি পাইয়াছিল যে, সে সেই কথা প্রতিবেশিগণেব সকলকেই শুনাইয়া দিয়াছিল । বাঙ্গালা পল্লীগামেব প্রতিবেশী, সেই কথা শুনিয়া যে বড় তৃপ্ত হইবে না, অন্নবুদ্ধি ব্রাহ্মণ তাহা ভাল বুঝিতে পারে নাই । যদি কেহ এই কথা শুনিয়া আত্ম-তৃপ্তিব জ্ঞাত এইরূপ সম্বন্ধ-বৈষম্যেব অসম্ভাবিতাব উল্লেখ কবতঃ তাহাকে নিকৃৎসাহ করিবার চেষ্টা কবিত, তাহা হইলে ব্রাহ্মণ তাহার সহিত কলহ বাধাইত । তা'রপৰ যখন সম্বন্ধ ভাঙিয়া গেল, তখন ব্রাহ্মণেব মনকোত্তেব লীমা রহিল না । তাহার উপর তুষ্ট প্রতিবেশিগণ তাহাকে দেখিলেই যখন রহস্ত করিতে লাগিল,—তখন ব্রাহ্মণের

মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া গেল;—ব্রাহ্মণ, সম্বন্ধের কথা কেহ তুলিলেই তাহাকে গাফিলত আরম্ভ করিল। কেহ যদি একটা ইঙ্গিত কবিত, তাহাও বিকৃত মস্তিষ্ক ব্রাহ্মণের সহ্য হইত না। ব্রাহ্মণ বাহিরের লোককে গালি দিয়া নিবৃত্ত হইত না। বালিকা কত্কা ও অভাগিনী পত্নীকেও নিত্য তিরস্কার কবিত। তাহাব বিশ্বাস হইয়াছিল, কত্কা বাটার বাহিব না হইলে তাহাকে বান্ধসী মহামায়া দেখিতে পাইত না, আব স্ত্রী নিমন্ত্ৰণ না বাইলে কত্কা শ্রামসুন্দরকে ফেলিয়া দিত না।

ব্রাহ্মণেব এ অবস্থা অধিক দিন বহিল না। ব্রাহ্মণ শীঘ্রই মাঝা গেল। ব্রাহ্মণী কত্কাকে লইয়া ছুঃখের ভাব বহন কবিতে রহিল। ব্রাহ্মণেব বোগের চিকিৎসায় বহু অর্থ ব্যয় কবায় ব্রাহ্মণী গহনাপত্র সব নষ্ট কবিয়াছিল। আট বৎসব অতি কষ্টে কত্কাটাকে পালন কবিতে তাহাব ধুলাগুঁড়া যা' ছিল, সব ফুবাইল। আট বৎসবেব পব দেবিল, আব কোনমতে চলে না। তখন আত্মীয়ের ব সন্ধান তাহাব একান্ত প্রয়োজনীয় হইয়া পড়িল। আত্মীয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের মাতুলবংশ নিম্ন, ব্রাহ্মণীব পিতৃকুল নিম্ন। কুলীনদিগের অধিকাংশেরই মাতামহ মাতুলাদি লইয়াই পবিচয়—ব্রাহ্মণী কোথায যাইবে—কি কবিবে? আশ্রয় পাইবাব জন্ত অভাগিনী নিত্য ভগবানের কাছে কাঁদিতে লাগিল।

অল্পদিন হইল যোগ উপলক্ষে ব্রাহ্মণী কতকগুলি প্রতিবেশিনীর সঙ্গে কলিকাতায় আসিয়াছিল। যাহাব কিছু নাই, সে কেমন কবিয়া মেদিনীপুর হইতে এতদূরে আসিতে পাবিল?—এ প্রশ্ন কবিবাব পাঠকের অধিবার আছে। কিন্তু ধর্ম্মেব জন্ম হিন্দু-নাথী কত কষ্ট সহিতে পাবে, আজও পর্যন্ত সমালোচনা, গবেষণা, গণিত, দর্শনে নিণয় কবিতে পারে নাই। নিত্য-অনাহার-পীড়িতা কেমন কবিয়া অর্থ-ব্যয়ে অল্পে ব্রত নিয়মাদি পালন কবে—এ স্মরণ তহু আজও পর্যন্ত আমাদের জ্ঞান-বুদ্ধিব অগোচরে, গুপ্তভাবে লুকাইত বহিবাছে।

কলিকাতার আসিয়া গঙ্গাতীরে বমাপ্রসাদের মা'র সহিত তাহার পরিচয় হয়। পরিচয়ে বৃদ্ধা একটা নিধি হাতে পাইল। এত আপনার জন এতকাল কোন অন্ধকারে লুকাইয়াছিল? বৃদ্ধা নিধিটাকে জোর করিয়া ধরিল, আর হাত ছাড়া কবিল না। মা ও মেয়েকে চক্ষুজলে সিক্ত করিয়া আপন আলয়ে ধরিয়া আনিল, আব মেদিনীপুরে ঘাইতে দিল না।

কুলীন যখন স্বকৃত ভঙ্গ হয়, তখন প্রায়ই বহু বিবাহ করিয়া বসে। মেদিনীপুরেব ব্রাহ্মণেব পিতা নিজে ভঙ্গ হইয়াছিল, আব সেই উপলক্ষে বিশ-পঁচিশটা বিবাহ করিয়াছিল। তাহার হিসাব তাহারই কাছে ছিল—সে আয়-ব্যয়েব তালিকা অত্রের জানা দূবে থাকুগ, সপত্নীগণ আপনারাই তাহা জানিত না।

তাহাদেব একটাব গর্ভে বমাপ্রসাদের মাতা, আব একটাব গর্ভে মেদিনীপুরেব ব্রাহ্মণ। মেদিনীপুরে ও বৃদ্ধাব পিত্রালায়ে বিংশকোশ ব্যবধান। ভ্রাতা ভগ্নী কেহ-কাতাবও অস্তিত্বও জানিত না। মাতৃকুলে বৃদ্ধাব কেহ ছিল না। পিতৃকুলেও কেহ নাই জানিয়া বৃদ্ধা পবকে আপন কবিয়া সংসার করিত। পুত্র, পুত্র-বধূ চিবদিনই প্রায় বিদেশে থাকিত, বৃদ্ধা কোন গঙ্গাহীন দেশেব আঘাটায় মবণের ভয়ে তাহাদেব সঙ্গে ঘাইত না। কাজেই হুই একটা প্রতিবেশিনীর ভাব বৃদ্ধা স্বেচ্ছায় আপন স্বন্ধে লইয়াছিল।

গঙ্গান্নান উপলক্ষে কালীঘাটে আসিয়া বৃদ্ধা তাহার শুবতী লাভুজারা ও বালিকা ভাতুক্ষণাবে পাইল। মেয়েকে কোলে তুলিয়া সহস্রবার মুখচুষন কবিল, মাও কথাব অপূর্বলাভে একটু-আধটু ভাগ বসাইল,—বৃদ্ধা অত্যাধিক হৃদরোচ্ছ্বাসে মায়েবও মুখ-চুষন করিতে ছাড়িল না। তা'রপব ভাইএর অকালমৃত্যুর কথা শুনিয়া যত পারিল কাঁদিল—জন্মাবধি তাহার সহিত অপরিচিতা রহিল বলিয়া যত পারিল 'হায় হায়' কবিল। তাহার পব এই অভাবনীয় ধন-প্রাপ্তির আনন্দের প্রতিদান স্বরূপ ষোড়শোপচারে মা কালীর পূজা প্রদানান্তর মা ও মেয়েকে ঘবে লইয়া আসিল।

বাটাতে আসিলামই বৃদ্ধা এই আত্মীয়্যার শুভাগমনের সংবাদ পূত্র বমাপ্রসাদকে প্রেরণ করিলেন । সারদাসুন্দরী, একে মহামায়া তাহার উপর আবার নূতন কুটুম্বিনী বাটাতে আসিয়াছে, এজন্ত স্বামীকে দেশে ফিরিতে বড়ই পীড়াপীড়ি করিল । রমাপ্রসাদ নিজের এখনও ঘাইতে বিলম্ব দেখিয়া অগত্যা স্ত্রীকে পাঠাইলেন । সারদাসুন্দরী বাড়ী আসিয়াই একটা সুন্দরী যুবতীকে প্রত্যক্ষগমন ববিতে দেখিল ।
বুকিল—এইটাই তাহাব নবাগতা মাতুলানী ।

মাতুলানী কিন্তু সারদাসুন্দরীকে দেখিয়াই দ্বানমুখী হইয়া গেল । সে যে তখন নলিনীর নূতন মায়ের অস্তিত্ব মহামায়াতেই অর্পণ করিয়াছিল ।

সারদাসুন্দরী অপবিচিতাকে দেখিয়াই বলিল,—“তুমিই কি আমার মামী?” মাতুলানী বিস্ময় বিমুগ্ধা, কথা কহিল না । সারদাসুন্দরী তাহার সকল কথাই শুনিয়াছিল । সুতরাং তা’ব নীরবতাও বিস্মিত হইল না । আব দ্বিতীয় প্রশ্ন না করিয়া, অপবিচিতাকে একটা প্রশ্নাম কবতঃ তাহাব হাত ধরিয়া ঘরে লইয়া চলিল ।

(১০)

মহামায়া হুইখানি পত্র পাইল । একখানা খুলিয়া পড়িল—
দেখিল স্বামীব পত্র ।

“আমি একটা হাজামাব পড়িয়াছি । বাটী ঘাইতে আরও দুই একদিন বিলম্ব হইবে । হাজামাব কথাটা বাটী ঘাইলেই শুনিতে পাইবে । তবে এইমাত্র বলিবা রাখি, ঘাইতে দুই চারি দিন বিলম্ব হইলে, অনাহারে শয্যায় চলিবা পড়িও না । বাবাজীউ সুস্থ আছে, এক বছর বাড়ীতে পুত্রাধিক আদবে রহিয়াছে । তাহাব কলিকাতায় থাকিয়া পড়িবাব জন্ত সেই বাসাই স্থিৰ কবিলাম । রমাপ্রসাদকে এই স্থান হইতে পত্র লিখিয়াছিলাম, উত্তর পাইবাছি । সারদা বাটী আসিতেছে । হরিপূবের বাটীতে আসিলেই

তাহাকে লইয়া আসিবে। তাহার আসিবার বিশেষ প্রবোধজন আছে। আঁবুই মাকেও সেই সঙ্গে আনিতে পারিলে ভাল হয়।”

দ্বিতীয় পত্র সারদাসুন্দরীর, হরিপুর হইতে প্রেরিত।

“আমি মুন্সের হইতে এত শীঘ্র চলিয়া আসিয়াছি যে, তোমাকেও পত্র লিখিতে সময় পাই নাই। বাড়ীতে আসিয়া তোমাব ওখানে যাইব মনে কবিয়াছিলাম। কিন্তু মা অসুস্থ হইয়াছেন বলিয়া, ফেলিয়া যাইতে পারিতেছি না। সেখানে শুনিয়াছি দাদা কলিকাতায়। আসিলেই শ্রামসুন্দরকে লইয়া এখানে চলিয়া আসিবে। যদিই যাইতে দুইদিন বিলম্ব হয়। ভাল কথা, তোমাকে আসিতেই হইবে। মা বলিলেন, তোমাকে অনেক দিন দেখেন নাই। কেন, আমি না আসিলে কি তোমাব এখানে আসিতে নাই? আব এক কথা—বাড়ীতে আসিয়া একটা মামীশাওড়ী ও একটা ননদী পাইয়াছি। তাহাদেব দেখিয়া দেখিয়াও তৃপ্তি পাইতেছি না—তাহাবা এত সুন্দর! তোমাকে না দেখাইতে পারিলে ত তৃপ্তি নাই। তুমি যতশীঘ্র পার আসিবে।

‘আসিবার এত জেদ কবিতেছি কেন?—এমন ধারা অন্নভাষিণী লজ্জাশীলা মামীশাওড়ী বুঝি কোন ব’উ কোন জন্মে দেখে নাই। আমি কোথায় তাহাকে লজ্জা করিব, না তা’ব লজ্জা দেখিয়া আমাকে বিরত হইতে হইয়াছে। তুমিই তা’র যোগ্যা সঙ্গিনী। দুইজনে মনে মনে কথাবার্তা কহিবে, আব ইঙ্গিতে পবম্পবেব ভাবের আদান প্রদানে দুইটা উপভাসেব সখী কেবল আলেখ্য শোভাকরী হইয়া আমাব চক্ষু সার্থক কবিবে। আমি তাহাকে প্রথম দিন কোনও প্রকাবে মাথা চুলকাইয়া ঢোক গিলিয়া মামী বলিয়া ডাকিয়াছিলাম। পরদিন হইতে ‘ভাই’ বলা ধবিয়াছি। সে এত মুছ—এত ছোট—এত মিষ্ট। দেহবষ্টি স্পর্শভরে অবনত হইয়া যায়। আমার পক্ষে তাহাকে দূরে দূবে রাখিয়া দেখাই ভাল, সঙ্গী করা বড় সুবিধা হইবে না। জানই ত বারবৎসর পর্যন্ত আমি প্রাচীরে প্রাচীরে গাছে গাছে বেড়াইয়াছি। তাবপর তোমাব

আবার আমার আত্মপূজা বাড়াইবার জন্য একটা স্বর্ণস্পর্শী বৃক্ষের মাথায় তুলিয়া দিয়াছি। আমি মনের কথা চাপিতে জানি না, আব আজন্ম বানবী থাকিয়া কেমন করিয়া লোকের সঙ্গে কথা কহিতে হয় তুলিয়া গিয়াছি। কি বলিতে কি বলিয়া শেষে কি তাব মনোবেদনা আনিয়া উপস্থিত করিব? ভয় হয়, কেন না একেত বহুশ্রেণ ব সম্পর্ক নয়—মা তাহাকে কত্মার মত দেখিতেছেন বলিয়া আমি তাহাকে ভয়ী মত দেখিতেছি—তাহার উপর হত-ভাগিনী এই বয়সে বঞ্চিতা হইয়াছে। এখানে আসিলে সমস্ত জানিতে পাবিবে। তবে এটা না লিখিলে আমার পেটের ভাত হজম হইবে না,—মেদিনীপুর্বে যে সময় ছিলে, সে সময় কি সেই সর্ব্বনেশে মেঘেটাই তোমাব চক্ষে পড়িয়াছিল? একটা চাঁদের কিবণ ছাঁকা রঙ মাখা, একটা ননী ব পুতুল কি কখনও তোমাব দৃষ্টিগোচর হয় নাই? তাব কথাও কি কখন শুন নাই?

“যাক্ এখন আব সে কথায় কাজ নাই। মাথাগাও দাদা আসিলেই শ্রামশ্রুন্দবকে সঙ্গে কবিতা এখানে অবশ্র অবশ্র চলিয়া আসিবে।”

[ক্রমশঃ]

শ্রীক্লীবোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

ছুভিক্ষ-পীড়িতের প্রতি ।

কাদ তুমি দীন দুঃখী—যাও ম'বে যাও,
জগতেব ক্ষতি লাভ, নাহি কিছু তা'য় ।
নাহি স্নেহ, নাহি দয়া, কা'র মুখে চাও,
কে শুনিবে—কে বুঝিবে ও মর্শ্ব ব্যথায় ?

পাব যদি দাও চালি' শেষ বস্তু-কণা
নিভাইতে আশ্র-গ্রাসী পিপাসা স্বার্থের !
দ্বিভ্র—ভিখারী তোবা—হেয় আবর্জনা ;
তা'র কেন ক্ষুধা-তৃষ্ণা, আশা জীবনের ।

তোরা(ও)ত মানুষ বটে—ব্রহ্ম মাংসে গড়া,
 নাই কি তোদের মনে ঘৃণা—অভিমান ?
 তবে কেন পদাঘাতে ফেলিস্ না তোরা
 সংসারের—মানবের অমুগ্রহ-দান ?

একই বিধির সৃষ্ট—সে-ই যদি মাঝে
 মারুক কি ক্ষতি তায় ? তাঁ'বি মুখ চাই
 হাসিতে হাসিতে সবে ছাড় এ সংসারে,
 জুড়াইবে চিরতবে সব জ্বালা ভাই।

অথবা বিধির চিব শুভ আশীর্বাদ
 শিরে ধবি' অগ্রসর হও এ জীবনে ;
 নীচ স্বার্থ অভিমান—সঙ্কীর্ণতা-বাধ
 উন্নত হৃদয় বলে দলিয়া চরণে।

যে সংসার—যে মানব একদিন হাস !
 দ্বিভ্র—রূপারপাত্র ভাবিয়া তোমায,
 হেরিত ঘৃণার চক্ষে—সেই পুনরায়
 নগণ্য তিথারী মত লুটা'বে ও-পায়।

নাহি পার—দীন-দুঃখী—যাও ম'বে যাও,
 জগতের ক্ষতি-লাভ নাহি কিছু তা'য়।
 নাহি দয়া—নাহি স্নেহ, কা'ব মুখে চাও
 কে শুনিবে কে বুঝিবে ও মর্ম্ম ব্যথায় ?

শ্রীচাক্রকল্প বন্দ্যোপাধ্যায়।

তুমি না আমি ?

অপরাধী কে ?—তুমি না আমি ?

প্রকৃতি-কোড়ে বসিয়া স্নকুমার শিশুটিব মত দিব্য হাসিতে
 খেলিতে ছিলাম, ক্ষে আসিয়া আমায় অমৃত লড্ডুকের লোভ
 দেখাইয়া এখানে আনিল ? তুমি ?—কে তুমি ? তোমার চিনি

না কেন? সেই প্রথম দিন হইতে তোমার পশ্চাতে ছুটিতেছি, কিন্তু জানি না তুমি কে? চিনি না তুমি কে? ষতদিন শিশু ছিলাম, লড্ডুকের লোভ ছিল, ততদিন সেই লোভে আমার সর্বদা ঘুবাইয়া লইয়া বেড়াইয়াছ, আর আজ সেই শৈশব গিয়াছে, শৈশবের সে লড্ডুকের লোভ গিয়াছে; কিন্তু তবুও কেন আমি তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া মবিতেছি? কে তুমি, তোমার ভুবনমোহিনী রূপ দেখাইবা, যৌবনের সেই প্রিয়-প্রসঙ্গ পরিপূর্ণ স্নিগ্ধারুণ-কর-স্নাত প্রাতঃকালে আমায় মোহিত করিয়াছিলে? কে তুমি, কেন তোমাব এমন ধাবা? সে'দিনও আমাব গিয়াছে, তবুও আমাব মোহ কাটিল না, তবুও তোমার পশ্চাতে ছুটিয়াছি! যৌবনের সেই উদ্দাম আসঙ্গ-লিপ্সা-পরিপূর্ণ তপন-খব-কর-তাপে তাপিত মধ্যাহ্নকালেও আমায় তোমাব পশ্চাতে ছুটাইয়াছ! কি তোমার এমন কুহক যে, আমায় তোমার সঙ্গ-ছাড়া হইবাব উপায় বর্জিত করিয়া তুলিয়াছে? ক্রমে আমার সে'দিন কাটিল, কিন্তু কে তুমিত ছাড়িলে না! তবু যে তোমাব পশ্চাতে ছুটিতে হইতেছে, এই অতৃপ্ত-বাসনা-জড়িত নৈরাশ্য পরিপূর্ণিত যৌবনের সন্ধ্যাকালে কেন আমি তোমাব পশ্চাতে ছুটিয়া মবিতেছি? কে তুমি আমায় আকাশের চাঁদ ধরিয়া দিবাব লোভ দেখাইয়া, ধূলিমুষ্টি হাতে দিয়া দুবে অবস্থিতি করতঃ হাসিয়া উঠ? আমাব সহিত এই ভৈরবীলীলা করিতেছ—তুমি কে?—কেন এ খেলা? ইহাব ভাব কি? জীবনের এতটা দিন গেল, এ সকল কিছুই বুঝিলাম না!!!

তুমি—তুমি যেই হও, তুমি শবতের চাঁদ, রূপে ভুবন ভবিয়া রাখিয়াছ, তোমায় দেখিলে আপন-হারা হইতে হয়; তোমাব চারিদিকে স্রুধার ছড়াছড়ি, তোমাব তীক্ষ্ণ-কোমল হাসিতে, জগৎ প্রাণ হাবাইয়া ফেলে! তুমি শীতের সৌরতাপ, তাপে জগৎ জ্বাইয়া রাধ! তোমার স্পর্শে জীবের সঙ্কোচ দুবে যায়, জীবের জীবনই যেন অহুপ্রাণিত হইয়া উঠে! তুমি বসন্তের কোকিল, তোমাব ডাকে জগতের নীরসতা ঘুচিবা যায়, তোমার আস্থানে

স্বপ্ন-কাম জাগিয়া উঠে! তুমি নিদ্রাঘের মলয় সমীর, তোমার বীর-হিলোলে জগতের তাপ চলিয়া যায়, তাপিত জীব তোমার স্পর্শে শীতল হয়! তুমি প্রায়টের বারিধারা, জগৎকে অরশালী করিতেছ, জীব তোমাব ধারায় প্রাণ-ধারণ করিতেছে! এ সকল তোমার স্বরূপত্ব আমি নিজেই উপলব্ধি-অমুভব করিয়াছি, সত্য বলিয়াই বুঝিয়াছি; কিন্তু তবু তোমায় চিনলাম না, সম্পূর্ণ বুঝিতে পারিলাম না কেন? আমাব সহিত তোমার কি সম্বন্ধ, তাহা জানিতে পাইলাম না কেন? কেন আমি তোমার পশ্চাতে ছুটি তাহাও বুঝিলাম না? তুমি এত দয়াময়ী, তবু তোমার প্রাণে এ কুটিলতা-টুকু কেন? তুমি কি জানিতে দিবে না তুমি কে? তুমি এমন কেন? তোমাব এমন কেন?

দিন নাই, রাত নাই, তোমার পিছে ছুটিতেছি, ছুটিতে ছুটিতে কতবার তোমার অতি নিকটে পৌছিয়াছি কতবার মনে করিয়াছি এইবার তোমায় ধরিব; কিন্তু পাবি নতাম ক্ষুদ্র হরিণ-শিশুটির মত তুমি লাফাইয়া শত-হস্ত দূরে সরিয়া যাও। তোমার মধুব শীতল মেহেব ছায়াটুকুলাভে আমার আগ্রহ যত, তোমার বঞ্চন-স্পৃহাও তত বলবতী। সারা জীবনটা তোমার পশ্চাতে ছুটিয়া আসিতেছি, কোন দিন তোমায় স্পর্শ করিতেও পারিলাম না, তবু তোমায় ছাড়িতে পাবি না কেন? ছুটিয়া ছুটিয়া সমবে সময়ে রুদ্ধশ্বাসে অবসন্ন হইয়া পডি, তবু তোমায় ছাড়িতে পারি না কেন? কুহকিনি! জানি না, কি মায়া-স্বত্রে বাধিয়া তুমি আমায় বড়িশ-বিক্রম মংগের নায খেলাইয়া লইয়া বেড়াইতেছ। তোমার বড়িশ-বিক্রম হইয়া এই অগাধ জল-সঞ্চারী রোহিত সারা জীবনটা খেলিয়া বেড়াইতেছে, আর পারে না, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে! আব খেলান কেন? এই বার ইহাকে উঠাও; কিন্তু কৈ সে ভাব তোমার স্বেধি না কেন? বড়িশ ছিঁড়িয়া গলাইবার যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছি, দুশ্চাপনীয় জানিয়া তোমায় ছাড়িতে চাহিয়াছি, কিন্তু তুমি না ছাড়িলে তোমায় ছাড়িতে পারে কে?

তুমি কি আমার পরীক্ষা করিতেছ ?—কিসের পরীক্ষা ! কেন এ পরীক্ষা ? যে তোমার জন্ম পাগল, যে তোমাকে দেখিয়া মজিয়াছে, যে মজিয়াই মরিয়াছে, তাহাকে আবার কি পরীক্ষা কবিবে ? সারা জীবনটা কলুব বলদের মত নাকে দড়ি দিয়া ঘুরাইলে, (এখনও সে ঘুর থামে নাই), ভুলিয়াও তোমার গভীর বাহিবে যাই নাই ; উপাষ, পথ, কিছু রাখও নাই, তবু কি তোমার বিশ্বাস হয় না ? রঞ্জিনি ! এ তোমার কি বঙ্গ ? আমি সব ছাড়িয়াছি, যাহা কিছু ছিল, সবই তোমার নামে উৎসর্গ কবিয়াছি ; আমার আত্মদানের বাকী কি যে আমার এখনও প্রতিদান হইতে বহুদূরে রাখিবাছ ? সাবা জীবন তোমার পিছে ছুটিয়াছি, ধবিতে না পারি, চিনিতে না পাবি, তোমার স্বভাব জানিতে বোধ হয়, আমার আর বড় বাবী নাই। তুমি ক্রীড়াময়ী, তুমি লীলাময়ী, তোমার খেলা হইলেই হইল ; খেলার জীব তাহাতে মরুক আর বাঁচুক, আমার তাহা দেখিবে না। তবে ইহাও বলি, তুমি খেলাইতে জান বটে, কিন্তু খেলার বস বুঝ কি ? বড়িশ-বিদ্ধ মাছ যখন খেলাইয়া অবসন্ন হইয়া পড়ে, তখন তাহাকে টানিয়া ডাঙ্গায় তুলিতে হয়, তাহা জান কি ?

তুমি চিরক্রীড়াময়ী, তোমার খেলা কোনদিন ফুটাইবে না, কিন্তু আমি যে আর পাবি না—আর যে এ ভাবে তোমার পিছে ছুটিতে পারি না। শৈশবের উৎসাহ, যৌবনের তেজ আমার চলিয়া গিয়াছে, এখন যৌবনের এ সন্ধ্যাকালে অল্পেই অবসাদ আসিবা পড়ে,—উৎসাহ কমিয়া যায়, ঠিক হতাশ হই নাই বলিয়াই এখনও ছুটিতেছি—ছুটিতে পারিতেছি, কিন্তু আর কত-কাল এমন চলিবে ? ক্রমেই যেন বুঝিতেছি, তুমি চন্দ্র, আমি বামন ; তুমি সুখ, আমি অসুখ ; তুমি আমার প্রাণনীয়া নহ। এই জ্ঞান, এই বিশ্বাস যতই বাড়িতেছে, ততই যেন আর ছুটিতে পাবিব না বলিয়া বোধ হইতেছে। যেদিন তোমায় উদ্বেগে আশ্বাস, দুঃখে সুখ, দাহে শান্তি, কোভে তৃপ্তি বলিয়া

বিশ্বাস করিতাম, সেদিন যেন এখন ক্রমশঃ দূরে সরিয়া বাই-
তেছে। এখন মনে হয়—বুঝি তোমা হইতে সরিয়া দাঁড়াইলেই
আমি বাস্তবিক স্মৃতি হইব; কিন্তু কৈ তা'ত পারি না। পাষাণি !
ইচ্ছা না থাকিলেও তোমাব আকর্ষণে বদ্ধ হইতে হয় কেন ?
যে তোমায় চাহে না তাহার প্রতি তোমাব আকর্ষণ এত প্রবল
কেন ?

সময়ে সময়ে তুমি আমায় মরণের বিভীষিকা দেখাও ; কিন্তু যে
ভুলিয়াছে, যে মজিয়াছে, তাহার আবাব মরণের ভয় কোথা ?
বান্ধনী ! যাহার হৃদয়ে চিবভুযানল জ্বলাইয়াছে, চিতাব অনল
ভিন্ন দে অনল নিভিবে না, তাহা কি জান না ?

তোমাব জন্তু আমায় কি না দুর্দশা হইয়াছে ? আমি তোমাব
জন্তু সব ত্যাগ করিয়াছি, কর্তব্য ভুলিয়াছি, যাহা দুর্লভ তাহাবই
জন্তু ঘূরিয়াছি, যাহা ছায়া তাহাই হৃদয়ে পবিপোষণ করিয়াছি।
কেন করিয়াছি, তাহা তুমিই জান। তোমাব জন্তুই এসকল
করিতে হইয়াছে। প্রথম জীবনে যদি তুমি লোভ জাগাইয়া
না তুলিতে, হৃদয়ে আশাব বাতাস না বহাইতে, তাহা হইলে
আজ আমাব এ দুর্দশা হইত না। মায়াবিনি ! এখন বল দেখি,
তোমারই জালে পড়িয়া আমি যে আমাব এ দুর্দশা ঘটাইয়াছি,
ইহাব জন্তু অপবাদী কে ? তুমি ?—না আমি ?

যাহাকে এগুলি বলা হইল, সে নিশ্চয় উত্তর দিল—“অবোধ !
অপবাদ আমাব না তোমাব, তুমিই তা'ব বিচার কব ? তুমি
পতঙ্গ, বহ্নি-শিখা দেখিয়া তাহাব চতুর্দিকে ঘূরিয়া বেড়াইতেছ,
শেষে পুড়িয়া মরিবে, দোষ কি বহ্নি-শিখাব ? তুমি সর্প দেখিয়া
বাল-স্বভাবে জড়াইয়া ধরিয়াছ বলিয়া কি সর্পে দংশন করিবে
না ? আমি দেবী ! কেন, এই সংসার মরুতে অসহায়,
অনবলম্বন তোমাকে, আশ্রয়-অবলম্বন দিয়া বাঁচাইয়া রাখিয়াছি
বলিয়া ? তোমায় যদি স্মৃতি ছবি দেখাইয়া, এ মোহনরূপে
ভুলাইয়া, এত ভরসা না দিতাম, তবে তুমি কি বাঁচিতে ? তুমি মূর্খ ;

তুমি বন্ধ না যে—ভোগে সুখ নাই, তৃপ্তি নাই; সুখ-তৃপ্তি বাহা কিছু তাহা তাহার করনায়। যে সুখের ছবি অহঃরহঃ দেখিতেছ, তাহা যদি ভোগ কবিতো পাইতে, তাহা হইলে আজ তোমার এ জলন্ত লালসা কি থাকিত? যে মুহূর্ত্তে তোমার ভোগ-স্বা মিটিত, সেই মুহূর্ত্তে এই বিচিত্রতাময়ী সোণার পৃথিবীই তোমার চক্ষে শূন্যবৎ প্রতিভাত হইত,—অতি পুৰাতন বোধ হইত, তুমি আব এক নিমেষও এখানে থাকিতে পারিতে না। এখন বল দেখি, এ বঙ্গিনী যে বন্ধ দেখাইতেছে, এ কুহকিনীর যে কুহকে মুগ্ধ হইয়াছে, এ পাষণী যে নিশ্চিন্ততায় তোমায় দ্রব করিয়া ফেলিয়াছে, মায়াবিনী যে সেই মায়াই এ জীবনে অবলম্বনীয় কি না?—সেই মায়াই তোমার এ জীবনে জীবন কি না? যতদিন এই মায়াবিনীর মায়িক জীবন তোমার থাকিবে, ততদিন অপরাধী কে, জানিতে চেষ্টা কবা তোমার বাতুলতা নহে কি? এ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কবাই এই মায়াব একটা খেলা নহে কি? যদি ক্ষমতা থাকে, আমার সঙ্গ ত্যাগ কবিতো পাব, আমার গঠিত, আমার পবিচালিত এ জীবন ত্যাগ কবিয়া নূতন ধরণে আবাব জীবন গড়িতে পার, তখন ভাবিও অপরাধী কে?—তুমি না আমি? তখন জিজ্ঞাসা কবিও, অপরাধী কে?—তুমি না আমি?

মানুষের প্রাণ আশাব প্রেমে, মায়াব জালে বদ্ধ হইয়া কত প্রলাপই বকে, তাহাব আব ইয়ত্তা থাকে না, কিন্তু “তদপি ন মুক্যত্যাশা বায়ু!”

শ্রীব্যোমকেশ মুস্তকী ।

ললনা-মহিমা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

৮৩

কি অমিয়া আছে তব সুধামাখাধরে,
 “বউ-কথা-কণ্ড” পাখী,
 শাখার উপরে থাকি’,
 পিয়িতে সে সুধারাশি সাধিতেছে
 ৮৪ তোমারে।

ওরূপ সম্ভবে অস্ত্রে কিম্ব হেরমণি!
 মাতা-রূপে তব স্নেহ,
 না পাবে দেখা’তে কেহ,
 পরাজিতা তব পাশে স্বর্গ-নিবাসিনী।
 ৮৫

দেখ, দেখ, তপোধন-ধ্যান নষ্ট করি।
 অঙ্গবী মেনকা-বালা,
 প্রসবিয়া শকুন্তলা,
 না জেনে পালিতে শিশু পলা’ল
 ৮৬ সুন্দরী।

মুণ্ডিমতী তুমি দেবি! স্নেহপারাবার,
 তা’ই কহে সুধীজনে,
 সনাতন শাস্ত্রে ভণে,
 ‘স্বর্গাদপি গবীষসী’ জননী সবার।
 ৮৭

অনুপমা অতুলনা সেই স্নেহরাশি,
 এইমাত্র জানা আছে,
 নাহি তাহা কারো কাছে,
 না পাই তাহার পার, তাই ভালবাসি।

৮৮

কি যত্নে সজ্জন হয় লালন পালন,
 জননী ব্যতীত হয়,
 পরে কি বুঝিবে তা’র?
 মায়ার নির্ঝর মাতা, শ্রেষ্ঠ অতুলন।
 ৮৯

সুকোমল বাহুলতা করি’ প্রসারিত,
 শিশু নাড়ী-হেঁড়া-ধনে,
 বৃকে রাখে সযতনে,
 অনিমিখে চেয়ে থাকে সদাই শঙ্কিত।
 ৯০

পীড়িত হইলে শিশু দেখ নিরখিয়া,
 মাতা ব’সে তা’র পাশে,
 মনে কত ভয় বাসে,
 পাছে কাণ ফুল-কণি পলায় ছিঁড়িয়া।
 ৯১

রাত নাই, দিন নাই, হের অবিরাম,
 ববিষাব ধারামত,
 কাঁদে মাতা অবিরত,
 সতত শিশুর তাঁব’ভাবি’ অকল্যাণ।
 ৯২

যত্নপি হৃতাণ্য বশে হাবাস শিশুরে,
 বৃকে করে মৃতদেহ,
 কাছে যেতে নারে কেহ,
 শিশুহারা সে সিংহীরে ডরে বমচরে।

<p>২৩ [ভিত্তে, জানহারা উদাসিনী ছোটে চারি- গণেশের মুণ্ড নাশে, যেন ভয়ঙ্করা বেশে, ছোটে ভীমা মহাশক্তি শনিরে</p>	<p>২৭ অন্তে যদি ভংসে শিশু কঁাদে উভরায়, মাতা যদি মারে তা'রে, শুধু হালি সে অধরে, হুঁষ্টছেলে জানে মাতা স্নেহের আলয়।</p>
<p>২৪ নাশিতে । কিবা যথা শিশুহারা কুকা কুরঙ্গিনী, এদিক ওদিকে চায়, ছোটে পাগলিনী প্রায়, ভেঙ্গেছে কলিজা আহা বনবিহাবিণী।</p>	<p>২৮ জননী স্নেহের কভু না পাই উপমা, পঞ্চানন পঞ্চ-মুখে, অনন্ত সহস্র মুখে, কীর্তনে অক্ষম নেই স্নেহের মহিমা ।</p>
<p>২৫ অথবা সৌভাগ্যক্রমে যদি বাঁচে স্মৃত, পূজা, হোম, যাগ করে, দান করে অকাতবে, পেয়েছে গো হাবানিধি বৈভব অমৃত।</p>	<p>২৯ ধরার যতেক বীণা হ'য়ে একত্রিত, গায় যদি ঐক্যতানে, মাতাইতে “মা”ব গানে, মাতাব স্নেহেব কভু হয় না বিহিত।</p>
<p>২৬ শিশু ওঠে মা'ব বক্ষে মবি কিবা শোভা, অলকা ধবিয়া টানে, মাতা ধবে শিশু কাণে, খিলখিল হাসে শিশু আহা মনোলোভা ।</p>	<p>১০০ মাতাব মমতা-কথা বর্ণে সাধ্য কা'র ? সাবদা হৃদয়ের মেঘে, বীণা কবে গেয়ে গেয়ে, নাহি শক্তি শুধিবারে সে মহিমা মা'র । কিষণ ।</p>

প্রারম্ভ কৰ্ম ।

অকুল ভবাবধে ভাসমান, উত্তাল-তবঙ্গ-মালার ভীষণ-ঘাত-প্রতি-
ঘাতে বিকল হইয়া, সামান্যজীব আমরা কুল পাইবাব নিমিত্ত সত্তরে
সন্ধেহ মনে ইতস্ততঃ নিরীক্ষণ করিতেছি। কিন্তু উপায় কোথায় ?
সে তরি কোথায়, বাহার সাহায্যে আমরা অকুল-পাথার পার

হইয়া কুল পাইব? কলুষিত, পাপ-পঙ্কে মগ্নপ্রায়, জীবসমূহ বার বার অসহ যন্ত্রণার প্রপীড়িত হইতেছে, কিন্তু তবুও জীবের মোহ কাটিল না—জীব শাস্তি পাইল না। আমরা অন্নবৃদ্ধি, আমরা বুদ্ধিগাও বুদ্ধি না; বুদ্ধিগেও অবোধেব মত কার্য্য করি। কিন্তু আমাদের অজ্ঞানতার কারণ কি? জানি সকল দিন সমান যায় না, তবে বার বার নিমজ্জিত হইয়াও আমরা বারেকের জন্ত সুখের মুখ দেখিতে পাইতেছি না কেন?

এ যন্ত্রণার অবসান কিসে হইবে? অর্থে? অর্থোপার্জনে, অর্থ সঞ্চয়ে ও অর্থ ব্যয়ে? কৈ তাহাতে ত কিছুই হয় না। পণ্ডিতগণ বলিতেছেন:—

“আয়ে হুঃখং ব্যয়ে হুঃখং ধিগর্থে হুঃখভাজনে।” আবও দেখিতে পাই—“মৃচ্ জহীহি ধনাগম তৃষ্ণাং, কুৰুতত্ত্ববুদ্ধে মনসি বিতৃষ্ণাং।” আবাব দেখ অশ্রুত—“অর্থমনর্থং ভাবয় নিত্যাং, নাস্তি ততঃ সুখ-লেশঃ সত্যম্।”

তবে নিস্তার কিসে? যশে? যশোলাভে? বহু যশস্বী হইয়াও আমাদের হুঃখ ত যায় না।

অর্থে, নামে বা যশে যদি এ হুঃখ যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিস্তার না পাইলাম, তবে এস, আমরা এ সম্বন্ধে পার্থী বস্ত্র ছাড়িয়া অশ্রুত অনুসন্ধান করি। শাস্ত্র বলিতেছেন, উদ্ধার—কর্ম্মে ও কর্ম্মত্যাগে।

অন্ন-বৃদ্ধি অজ্ঞান অন্ধকাবে আচ্ছন্ন সামান্য জীব আমাদের কি কর্ম্মত্যাগ সম্ভবে? আর জীবের কর্ম্মত্যাগই কি সম্ভবপর? তাহা নহে। গীতাব অষ্টাদশ অধ্যায়ে দ্বিতীয় শ্লোকে ত্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন;—

“কাম্যানাং কর্ম্মণাং শাস্তং সন্ন্যাসং কবয়ো বিদুঃ।

সর্ব্ব-কর্ম্ম-ফল-ত্যাগং প্রাহন্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ ॥”

নিত্য, নৈমিত্তিক, কাম্য প্রভৃতি সকল কর্ম্মের ফলত্যাগই কর্ম্ম-সন্ন্যাস বা কর্ম্ম-ত্যাগ বলিয়া বিচক্ষণ পণ্ডিতেরা উল্লেখ

করেন। তাহা হইলে কর্মের ফলত্যাগই কর্মত্যাগ। আরও দেখ, মানবেব পরম হিতৈষিণী শ্রুতি বলিতেছেন ;—

“ভিত্তিতে হৃদয়গ্রহিচ্ছিত্তস্তে সর্বসংশয়াঃ ।

ক্ষীযন্তে চাত্ত কৰ্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পবাবরে ॥”

তত্ত্বদর্শী সাধকের যখন পবত্রঙ্গ দৃষ্ট হইবে, তখন তাহাব সমস্ত হৃদয়-গ্রহিভেদ, সকল সংশয়ের ছেদ ও প্রারব্ধ-ভোগ ব্যতিরেকে সর্ব কর্ম্মেবই ক্ষয় হয়। অতএব এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, আমবা প্রাবদ্ধ কর্ম্মেব হাত হইতে পরিত্রাণ-লাভে সম্পূর্ণ অসমর্থ। আমবা ত সামান্ত জীব, তত্ত্বদর্শী সাধক, যিনি ভগবানেব সাক্ষাৎকাব লাভ কবিযাছেন, যিনি জীবমুক্ত, তিনিও প্রাবদ্ধ কর্ম্মেব, সংই হউক আব অসংই হউক, ফলভোগ কবিতে বাধ্য। ঐ ফলভোগকালীন তাঁহাকেও কর্ম্ম করিতে হইবে। ইহা দ্বাবা এই উপলব্ধি হইতেছে যে, জীবের কর্ম্মত্যাগ অসম্ভব—কর্ম্ম কবিতেই হইবে; কর্ম্ম অনন্ত, কর্ম্ম অনাদি। কর্ম্মই জীবসমূহেব একমাত্র অবলম্বন। এ সংসাব কর্ম্মক্ষেত্র, সংসাবিমাতেই কর্ম্মের অধীন, আমবা কর্ম্মত্যাগ কবিতে ইচ্ছা করিলেও কর্ম্ম আমা-দিগকে ত্যাগ কবিবে না। ইহ জগতে কর্ম্ম কবিতেছি, পব জগতেও কর্ম্ম কবিতে হইবে; বিশ্রাম বলিযা কিছুই নাই। যখন আমরা বিষয় কর্ম্ম হইতে বিশ্রাম লাভ কবিতে ইচ্ছা কবিযা নিশ্চেষ্টভাবে বসিযা থাকি, তখনও আমাদেব মানসিক কোন না কোন ক্রিযা চলিতে থাকে।

কিন্তু এ “কর্ম্ম”টা কি? এবং যাহাব হাত হইতে সাধকেবও নিস্তাব নাই, ঐ “প্রাবদ্ধ কর্ম্মই” বা কি?

শাস্ত্রকাবগণ জীবের কর্ম্মকে তিনভাগে বিভক্ত কবিযাছেন—প্রথম সঞ্চিত কর্ম্ম, দ্বিতীয় আগামী কর্ম্ম, তৃতীয় প্রারব্ধ কর্ম্ম। এই তিন প্রকাব কর্ম্মকে তিনটা লোষ্ট্রেব সহিত তুলনা করা যাইতে পাবে। মনে বকুন, একটা বালক তিনটা লোষ্ট্র সংগ্রহ কবিয়া একটীর পর একটা নিক্ষেপ করিতেছে। একটা নিক্ষেপ

করিয়াছে, একটি নিক্ষেপ করিবার জন্ত উত্তলিত হস্ত; আর একটি এখনও সঞ্চিত আছে। এস্থলে ঐ নিক্ষিপ্ত লোষ্ট্রের সহিত প্রাবন্ধ কৰ্ম্মের তুলনা করা যাইতেছে। যে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, তাহার কার্য্যও হইয়া গিয়াছে। তাহার ফল বালককে অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; ইহার ভোগ ব্যতীত অস্ত্র প্রকাব নাশ নাই। যে দুইটি লোষ্ট্র এখন নিক্ষিপ্ত হয় নাই, তাহার কার্য্য এখনও হয় নাই; এ নিমিত্ত তাহাব কোন ফল নাই। বালকও সেই দুইটি লোষ্ট্র যত্বপূর্ণ নিক্ষেপ না কবে, কোন প্রকার ফলভোগের দাবী নহে।

ইহাও প্রমাণিত হইল যে, প্রাবন্ধ কৰ্ম্মের ফলভোগ বহিতে আমরা বাধ্য। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক প্রাবন্ধ কৰ্ম্মের ফলভোগ করিতে আসিয়া আমরা অনন্ত কৰ্ম্মে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ি। কৰ্ম্ম যেন বক্তবীজের ঝাড়। ইয়ুবোপীয় পণ্ডিতেরা—কৰ্ম্ম ও কৰ্ম্মফল এই সব কিছুই মানেন না। Charles Darwin প্রমুখ ক্রম-বিকাশ পদ্ধতিব (Theory of Evolution) পক্ষপাতী মনস্বিগণ বলেন যে, এই পৃথিবী লয়প্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের স্থায় এক প্রকাব তবল পদার্থে পবিণত হইবে। কিন্তু যত্বপূর্ণ প্রশ্ন করা যায় যে, এই সব যে হয় ও হইবে, ইহাব কাবণ কি? তদ্বত্তবে তাহাবা বলেন—“This is its nature. This is the rule এই ইহার বাঁতি। ইহাই হইয়া থাকে ও হইবে। কিন্তু ইহাতে আমাদের দুঃখ-মোচনের কি হইল? কি প্রকাবে দুঃখের হাত হইতে পবিজ্ঞাণ হইবে? ঐ মতের পোষকতাব আমাদের কোনও লাভান্নাভ নাই। আমাদের দুঃখভোগ যেনন আছে, তেমনই থাকিবে। হিন্দু বলিতেছেন,—কার্য্যের হাত হইতে যখন উদ্ধার নাই, তখন সং-কার্য্যই দুঃখার্গব পাব হইবাব একমাত্র সেতু। যে সকল কার্য্যে আত্মপ্রসাদ লাভ হয়, তাহাবই নাম সংকার্য্য।—প্রথম দান্বে, আমরা সাধাবণেব জন্ত হাসপাতালপ্রতিষ্ঠা পুষ্করিণীখনন, দেবালয়-নিৰ্ম্মাণাদি নানা সংকার্য্য করিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে বর্ত্তমান

ধর্ম জগতের অন্ততম অধিনারক প্রেমাবতার সাধক প্রবর শ্রীশ্রীরাধ-
কৃষ্ণ পরমহংস দেব বলিয়াছেন,—“মন্দির নিশ্চয় করিয়া যাইলেও,
পুনর্বার সংসারে আসিতে হইবে।” তাহাই যদি হয়, তবে উক্ত
সংকার্যে আমাদের কি উপকার হইল? যতপি পুনর্বার জন্ম
গ্রহণ করিতেই হয়, তাহা হইলে যে আবার অসংখ্য কষ্টে আমবা
ব্যাপ্ত হইয়া দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ করিব না, কে বলিতে পারে?

দ্বিতীয়—খ্যানাদি অর্থাৎ সাধু হওয়া। সে বড় মুন্সিলেব কথা।
সাধু হওয়া, বড় সোজা কথা নয়। তপ, জপ, যোগ, যাগ, পূজা,
হোম এ সকল কার্যে ব্যাপ্ত হওয়া, আমাদের গ্রাম ক্ষুদ্র জীবে
কি সম্ভবে? আমরা সংসারের নানাকষ্টে নিযুক্ত হইয়া, এমন সময়
পাই না, যে সময়ে স্থিতিতে ঐ সকল সংকার্যে নিযুক্ত
হই। যদিও সময় পাইয়া কোন কার্যেব অন্তর্ধান করিতে থাকি,
সঙ্গে সঙ্গে “আমি একটা সাধু” এই অভিমান উপস্থিত হয়। তখন
সেই অভিমান দূর কবা বড় দুঃখ; আর উক্ত কার্যেই যে আমাদের
উদ্ধার জীব নিশ্চিত, তাহাও সন্দেহস্থল! তব্বে জ্ঞানময়, জ্ঞান-
দাতা, জ্ঞানের একমাত্র আকব, পবনবোগী দেবাদিদেব মহাদেব
বলিতেছেন,—“জপাৎসিদ্ধিঃ, জপাৎসিদ্ধিঃ” ইত্যাদি; আবাব তিনিই
অন্তত বলিতেছেন :—

“ন মুক্তির্জপনাং হোমাদ্ উপবাসাং শতৈরপি।”

বিষম বিপদ। কোনটী অভ্রান্ত, কোনটী ভ্রান্ত? আবাব কোনটীই
ভ্রান্ত হইতে পারে না—কাবণ, দুইটীই শিব বাক্য—এই কথা
পণ্ডিতগণ বলিবেন। কিন্তু আমবা কোথায় যাই? কি উপায়
অবলম্বন করি?

ওসকল বুঝিয়া উঠা আমাদের গ্রাম সামান্য জীবের কর্ম নয়;
আর বুঝিয়া উঠিলেও, উহাব মতে কার্য করা বড় কঠিন। এ
জংসারে বাধা, বিপত্তি, প্রলোভন অনেক।

তৃতীয়—পরোপকাবাদি। তাহাতেই কি হইবে? কে বলিল যে,
আমরা পরোপকার করিয়া উপকৃত ব্যক্তির নিকট হইতে কৃতজ্ঞতা

প্রত্যাশা করিব না? কে বলিল যে, যত্নপি উপরূত ব্যক্তি যথেষ্ট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ না করে, তাহা হইলে আমবা তাহার প্রতি ক্রোধাক্ষ হইয়া কি করিবা তাহার সর্বনাশ করিব, সেই চেষ্টায় রত থাকিব না? সুতরাং সঙ্গে সঙ্গে মহা অনর্থ।

উক্ত তিন প্রকাব সংকার্যের কোনটীতে আমাদের কিছুই হইল না। তবে উপায় কি? তবে কি শাস্ত্র মিথ্যা? শাস্ত্র-কারগণ কি ভ্রান্ত? না, তাহা নহে।

একটা উপায় আছে, সেটা নিঃস্বার্থ কৰ্ম। আমরা যখন কোন কার্য করিব, তাহাতে স্বার্থেব লেশমাত্র থাকিবে না—প্রত্যাশার নাম গন্ধও থাকিবে না! কোনও প্রকার ফলের আকাঙ্ক্ষা করিব না! ইংবাজ কবি মহামনা Longfellow বলিতেছেন :-

“Let us then be up and doing,
With a heart for any fate.”

উক্ত কবির আব একটা মহাবাক্যও আমবা এস্থলে উপদেশ স্বরূপ গ্রহণ কবিত্তে পাবি। সেই কবিতারই অন্তর :-

“Act, act in the living present,
Heart within and God o'er head.”

আমবা দেখিতে পাই। কিন্তু এই প্রকাব কার্যেও বাধা-ব্যতিক্রম অনেক, প্রলোভন বিস্তর। নাম, যশ, অর্থ ইত্যাদির বিষয় কিঞ্চিৎ ভাবিয়া দেখিলে বোধ হয়, সবিশেষ জ্ঞাত হইব যে, আমরা এ সব প্রলোভনে মুগ্ধ হই বটে, কিন্তু লুক্ক দ্রব্য পাইতে কৃতকার্য হই না। কেহ হয় ত মৃত্যুকালে ঐ সকলের আশ্বাদ পান, কাহাব ভাগ্যে মৃত্যুকালেও ঘটে না। কিন্তু কি আশ্চর্য্য এ সকল দেখিয়া, বুঝিয়াও আমরা প্রলোভন লইয়াই ব্যস্ত। এই সকল প্রলোভন ত্যাগ করিতে হইলে শক্তিসম্পন্ন হওয়া আবশ্যক। Swami Vivekananda says,—“Strength, strength it is that we want so much in this life, for what we call sin and sorrows have all one cause, and that is our weakness. With weakness comes ignorance, and with ignorance comes misery.”

যিনি এ জগতে আত্ম-ত্যাগ করিতে, আত্ম-বিসর্জন দিতে লিপ্সা করিয়াছেন, তিনিই শক্তিমান্। আমি আপনার সংকল্পের প্রভাবে এই মর্ত্যধামত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইব, আব সকলে পড়িয়া থাকিবে। এই প্রকাব নীতিতে চলিবে না।

পবনহংসদেব বলিতেন, “আমি একটি লোকের উদ্ধার জন্ত কোটি জন্ম স্বীকার করিতে প্রস্তুত।” ছুঃখপাশ হইতে মুক্তিলাভ কবিবাব ইচ্ছা কবিলে নিস্বার্থ আত্ম-ত্যাগ, অভিমান শূন্য হইয়া কর্ম্ম কবা, আবশ্যক। কর্ম্মেব হাত হইতে নিস্তার নাই, পূর্বেই বলিয়াছি। আগুনে হাত দিতেই হইবে। স্বপ্নেও কর্ম্মেব হাত হইতে পবিত্রাণ নাই। মানস-বলাকা-গুল, চক্ৰফেননিভ, স্ককোমল শযায শয়ন কবিসা, স্নহুপ্তিকালে বাহুজ্ঞান বহিত হইলেও, স্বপ্নে আমবা কার্যেব অধীন ! বিমার্শ্য মতঃপবম্।

কর্ম্মেও আবাব পদে পদে নৈবাশ্র, সঙ্গে সঙ্গে যন্ত্রণা উপস্থিত। কিন্তু প্রত্যাশা-শূন্য কর্ম্মে অপাব আনন্দ। কিন্তু কি প্রকাবে আমবা কর্ম্ম কবি ? কি উপায়ে শক্তিমান্ হই ? কি প্রকাবে স্বার্থবিসর্জন কবি ? কি উপায়ে আত্মত্যাগ কবি, কি উপায়ে অহংত্যাগ কবিসা অভিমান শূন্য হই ? উপায় আছে ;—

“ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিবেকা, ভবতি ভবান্নবেতবণে নৌকা।”

সজ্জনসঙ্গতি অর্থাৎ সাধুসঙ্গই ভীষণ ভবান্নব পাব হইবার একমাত্র নৌকা। আমাদের সাবাটী জীবনেব মধ্যে যদি ক্ষণকালের জন্তও সজ্জন-সঙ্গতি হব, তাহা হইলেই উপায় স্থি হইয়া গেল। আবও একজন তত্ত্বদর্শী মনীষী ইহজগতেব সাববস্তু অন্বেষণ কবিতে গিয়া বলিয়াছেন,—

“অসাধবলুসংসায়ে সাবমেতৎ চতুষ্টয়ম্ !

কাশ্চাং বাসঃ সতাং সঙ্গঃ গঙ্গাস্তঃ শত্ৰুসেবনম্ ॥”

কিন্তু আমাব বোধ হব, এই চাটিটির মধ্যে সাধুসঙ্গ সকলের কবায়ত্ব ও সহজসাধ্য, আব তিনটী সকলেব পক্ষে ঘটিয়া উঠা সম্ভবপর নহে। কিন্তু সাধু কে ? এক কথায় এ প্রশ্নের উত্তর

দীতে হইলে আমরা এই বলিতে পারি—“যে ভাল কে ভালবাসে ভালর জন্ত ভাল করে, সেই ভাল অর্থাৎ সাধু।” আমরা যদি ভালকে ভাল বাসিতে পারি, ভালব জন্ত ভাল করিতে পারি, তবেই নিস্তার, নতুবা শত শত জন্ম ধরিয়া এই ভীষণ পাপ-তাপ-সম্বিত দুঃখেব সংসারে, এই সহানুভূতি-বর্জিত নিশ্চয় সংসারে, এই স্বার্থপরিপূর্ণ অনিত্য মায়াময় সংসারে গমনাগমন করিতে হইবে। অতএব এস, আমরা সকলে এমন একজন ভাল আদর্শ পুরুষেব আশ্রয় গ্রহণ করি, যাহার রূপাবলে আমরা ভালব জন্ত ভাল কবিত্তে শিক্ষা করিব, ভালকে ভাল বাসিত্তে শিক্ষা কবিব, আমাদের স্বার্থত্যাগ হইবে, আমবা কর্মফলত্যাগ করিয়া কর্ম করিত্তে সক্ষম হইব, আমাদের অহংত্যাগ হইবে, আমবা অভিমান শূন্য হইব, আব আমাদের জন্মান্তর গ্রহণ করিত্তে হইবে না।

কিবণ ।

সমালোচনা ।

মাতৃ-বিলাপ—এই বিলাপ কবিতায় লিখিত। মাতৃহীন বালক পূজনীয়া পরলোকগতা মাতাব উদ্দেশে কয়েকটি শোকগাথা গাঁথিয়া পুস্তকাকারে জনসাধারণের উপহাব দিয়াছে। পুস্তকের বিজ্ঞাপনীতে শ্রীযুক্ত প্রসন্নকুমার যথার্থই বলিয়াছেন;—

“নিদারুণ মর্শ্বেভেদী মনোবেদনায—

মাতৃহীন বালকের করুণ রোদন ;

কবিত্ব-চাতুর্য্য তা’তে থাকিবে কোথায় ?

ভাবেব মাধুর্য্যে তথা কিবা প্রয়োজন ?”

মাতৃ-পূজার ‘কবিত্ব চাতুর্য্য’ ও ‘ভাবেব মাধুর্য্য’ যথার্থই কোনও আবশ্যক নাই। মাতৃ-পূজার একমাত্র উপকরণ ভক্তি, তাহা ‘মাতৃ-বিলাপের’ ছন্দে ছন্দে পাঠক পাইবেন। তবে আর কি চাই ? ভক্তের একটি কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিত্তে পারিলাম না। মাতৃ-ভক্ত

বালক স্বপ্নে মাতাকে দর্শন করিয়া মার নিকটে বাইতে বাসনা করিল, এমন সময় নিদ্রাভঙ্গ ! কিন্তু নিদ্রাভঙ্গেও মাতৃ-ভক্ত কি বলিতেছেন, শুনুন ;—

“তাই যদি সত্য হয়, হলেই বা স্বপ্নময়,

যাবৎ জীবন যেন দেখি এ স্বপন ।

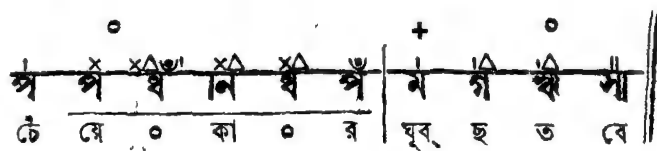
নিশি পোহায়ো না যেন, এস নিদ্রে ! এস পুনঃ,

মাতৃ-ময়-স্বপ্ন পুন করি দরশন ॥”

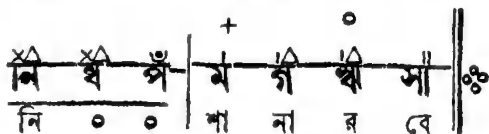
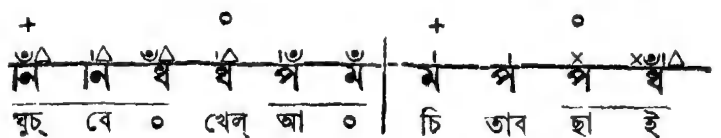
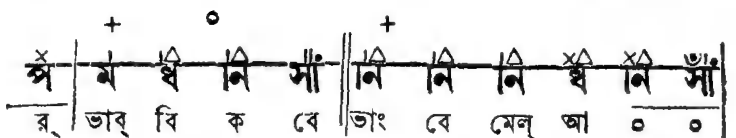
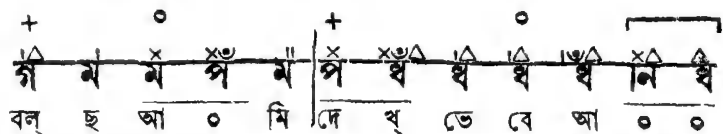
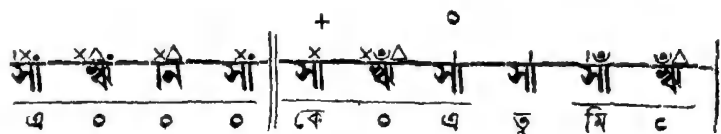
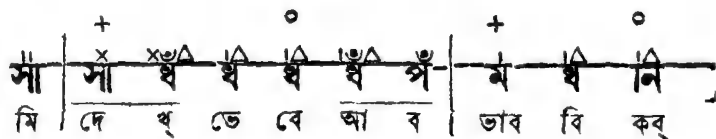
আমরা মন্থনাতের মাতৃ-ভক্তিতে বড়ই সন্তুষ্ট হইয়াছি।

নাগযজ্ঞ—শ্রীযুক্ত অন্নদাপ্রসাদ ঘোষাল প্রণীত। নাগযজ্ঞের উপাখ্যান বোধ হয়, পাঠক পাঠিকাব মধ্যে কাহারও অবিস্মিত নাই ; অন্নদাবাবু সেই পৌরাণিক উপাখ্যানটী নাট্যাকারে পরিবর্তিত করিয়াছেন। এখানি বাজকীয় বঙ্গরঙ্গভূমিতে কিছুদিন অভিনয়ও হইয়াছিল, গুণিলাম অভিনয়ে সকলে লেখকের লিপি চাতুর্যের প্রশংসা কবিতাছিলেন। পাঠকালে আমবাও তাহা না করিয়া থাকিতে পারি নাই।

রামকৃষ্ণ প্রচার সমিতির বিজ্ঞাপনী—দক্ষিণেশ্বরের সাধকপ্রবর “শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণদেব মানবেব হিতার্থ যে সকল তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন ও কার্যে যাহা তাঁহার জীবনে প্রতিপাদিত হইয়াছে ; তাহা প্রচার এবং মনুষ্যেব দৈহিক, মানসিক ও পার-মার্থিক উন্নতি কল্পে যাহাতে সেই সকল তত্ত্ব প্রযুক্ত হইতে পারে, তদ্বিষয়ে সাহায্য কবিবার জন্ত এই প্রচার (Mission) সংস্থাপিত হইয়াছে।” এই সমিতির সাধাবণ সভাপতি আমেবিকা-ইংলও বিযুক্তকারী বাগ্মী শ্রীমদ্বিবেকানন্দ স্বামী। শ্রীমৎ ব্রহ্মানন্দ স্বামী (বাগুবাজার বসুপাড়া) কলিকাতা আশ্রমের সভাপতি। সাম্প্রদায়িকতা শূন্য হইলে এই প্রচারে আমাদের সমাজের বহুমঙ্গল সাধিত হইবে, ইহা স্থির নিশ্চয়।



অন্তরা ।



শ্রীরাজকৃষ্ণ ঘোষ ।

বীণাপানি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণ-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে । ভগবতি, ভাবতি দেবি নমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । } শ্রাবণ, ১৩০৪ সাল । } ৭ম সংখ্যা ।

ঈশ্বরোপাসনা ।

সকল শ্রবণমাত্রেই অবয়ীপ্রমাণে (directly) যাহাদের স্বাভাবিক-
চুতি হয়, অবিদ্যাবিস্তৃতিত অধ্যাসেব জলন্ত প্রদীপ তাহাদের
চকিতেই নিরূপিত হইয়া যায়; অবাৎসর্যাক্রান্ত অদ্বৈত মহা-
সাগরের অব্যক্ত অতলে তাহাদের জীবনতবণী জন্মের মত নিমজ্জিত
হইয়া যায়; তাহাদের দৃষ্টিতে সৃষ্টিই বা কোথায়, প্রলয়ই বা
কোথায়? উপাস্তই বা কি উপাসনাই বা কার? “যদা সৰ্বমাত্ম-
বাহুত তদা কিং কেন কণং পশ্যেৎ” যখন সমস্তই আত্মময় হইয়া
যায়, তখন সে কি-দ্বারা কি দেখিবে? কিন্তু অনাদি অবিদ্যা
গ্রাহ্যন্ত অস্বাদাদি জীবের পক্ষে ব্যতিবেকী ভায়ে (indirectly)
পরমাত্মতত্ত্ব বুদ্ধিবার সৌকর্য্যার্থে অলীক ইলজালরূপী পরিদৃশমান
জগৎ প্রপঞ্চকে যদি একান্তই সৃষ্ট পদার্থ মানিয়া লইতে হয়, তবে
বেদান্তের ত্রিবিধ মায়ী অথবা সাংখ্য কথিত ত্রিগুণাদিকা প্রকৃতিব
গুণবিশ্লেষেই এ সৃষ্টিবৈচিত্রের সূত্র কারণ বলিয়া অনুমান

করা যাইতে পারে। বেদান্তদর্শন বলিয়াছেন, অথগু পরমায়া যখন জগদাকারে বিবর্তিত হন, তখন তিনিই সত্ত্ব, রজঃ এবং তমোগুণ-ক্রান্তের ভ্রায় হন। সাংখ্যও বলিয়াছেন, গুণের বিকোভ হইলেই সৃষ্টির সূচনা হয়। সুতরাং আমরা দেখিতেছি যে, বেদান্ত উভয় দর্শনই সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে গুণবিকোভ করনা করিয়াছেন। সৃষ্টিতত্ত্ব ব্যাখ্যা এ প্রবন্ধে মূখ্য উদ্দেশ্য নহে। তবে এই গুণত্রয় যে অসীম পরিমাণে আত্মকৃত্ত পৰ্য্যন্ত যাবতীয় সৃষ্ট পদার্থে ওতপ্রোত পরিব্যাপ্ত রহিয়াছে, তাহার উল্লেখ করাই এ স্থানে প্রতিজ্ঞা-সাধনার্থ নিতান্ত আবশ্যক মনে করিতেছি। উক্ত-গুণপদার্থত্রয়ের ক্রমভেদে প্রকাশ-মানতা ক্রিয়মানতা ও জড়তা-ধর্ম বিদ্যমান আছে। সাংখ্যচার্য্যগণ যে বলিয়া থাকেন, সদৃশ পরিণামে প্রলয় ও বিসদৃশ পরিণামে সৃষ্টি, তাহার অর্থ এই যে ত্রিবিধ গুণপদার্থের মধ্যে যতদিন বৈষম্যভাব থাকিবে, ততদিনই সৃষ্টি-কার্য্য বর্তমান; উহাদের নিঃশেষ-সাম্যে মহাপ্রলয় উপস্থিত হইবে। “গুণানাং সাম্যাবস্থা প্রকৃতিঃ বৈষম্যাবস্থা সৃষ্টিঃ” ইতি সাংখ্যসূত্র। অবিভাগ্যন্ত অম্বদাদির পক্ষে সৃষ্টি যখন প্রতিভাত হইতেছে, তখন ইহা অবশ্যই অনুমেয় যে, উক্ত গুণপদার্থত্রয়ের বৈষম্যভাব আমাদিগের মধ্যেও বর্তমান আছে। আমরা দেখিতে পাই, তম আধিক্যে জড়তা, রজ আধিক্যে ক্রিয়মানতা ও সত্ত্ব-বিক্যে প্রকাশমানতাব প্রাবল্য হয়। ক্রমবিকাশবাদী পণ্ডিতগণের (Evolutionists) সৃষ্টিতত্ত্বকপ ক্রমবিকাশমতের পরিপোষণোপলক্ষে ও প্রাক্করূপ গুণত্রয়ের ক্রমোন্মেষণ, অনুমানের অযোগ্য হয় না। নিরতিশয় তম আধিক্যই জাত্যভাব। তজ্জন্মই ক্রমবিকাশবাদিগণ জগতের আদিমাবস্থা তমোময় কল্পনা করেন। ভগবান্ মনুও ইজিতক্রমে বলিয়াছেন, “আসীদিমং তমোভূতং” এ জগৎ প্রপঞ্চ সর্বপ্রায়ে তমোভূতই ছিল। তৎপরে ক্রমোন্মেষিত চেতন জীব-জগতে রজঃ প্রাধান্যবশতঃ চেতন জগৎ কার্য্যময় এবং নিরতিশয় শুদ্ধসত্ত্ব পরাতত্ত্ব-বিবিদ জীবই স্বতঃপ্রবণ দৃষ্ট হয়। আনুমানিক জড়জগৎ

সমস্তই ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির রঙ্গভূমি,—যেখানে কেহ স্থাণুরূপ চলচ্ছক্তি রহিত, কেহ জীবরূপে গমনশীল, কেহ বা প্রশান্তমনা সত্ত্বসংস্থ হইয়া ত্রিগুণের বিক্ষোভ অতিক্রমণ করতঃ সৃষ্টিনিবাণে কৃতপ্রব্র। প্রোক্তরূপ জ্ঞানাবলম্বনে আমরা দেখিতে পাই, বিবেক-ধান্ মনুষ্য সমাজেও উক্তরূপ গুণভেদে কেহ তমঃপ্রবলতা বশতঃ মহামোহাচ্ছন্ন; কেহ বজঃ প্রাবল্যে জড়জগতের উপর আধিপত্য বিস্তারে নিয়তই কৰ্ম্মপরায়ণ; কেহ বা সত্ত্বপ্রবলতা বশতঃ প্রকৃতির পরপারস্থিত পরম পুরুষলভ্যে অনন্তমনা ও নিয়ত ধ্যানশীল। উক্ত ত্রিবিধগুণের অগ্নাধিক্যতা অনুসাবেই জীবকল্পিত উচ্চাদর্শ (highest ideal) ও যে অগ্নাধিক পরিমাণে পরাবব আদর্শ হইবে তাহাতে আব বিচিত্র কি? প্রত্যেক সমাজের ব্যক্তিগত উচ্চাদর্শই অগ্নাধিক পরিমাণে ক্রমে সমাজগত ও জাতিগত আদর্শরূপে পরিণত হয়। এইরূপ প্রত্যেক জাতিগত আদর্শই পক্ষান্তরে সার্বভৌমিক আদর্শরূপে পরিণত হওয়াই আদর্শ কল্পনার নিশেষ পরিসীমা। প্রোক্তরূপ সার্বভৌমিক অত্যাচ্চাদর্শই লোকতঃ জ্ঞানে ঈশ্বর বলিয়া নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। কিন্তু জীবগত, সমাজগত কি জাতিগত অত্যাচ্চাদর্শ বা ঈশ্বরজ্ঞান একরূপ হইতে পাবে না। যদি সকলের বুদ্ধিতে ঈশ্বর একরূপেই প্রকাশমান হইতেন, তাহা হইলে আর সাম্প্রদায়িকরূপ বাদ-বিতণ্ডার কোলাহল উথিত হইত না। জীবগত সমাজগত ও জাতিগত বিভিন্নগুণপ্রাবল্যই বিভিন্নরূপ উচ্চাদর্শ কল্পিত হইবার অধিতীয় কারণ। যোর তমসাজ্ছন্ন জড়জগতের নিয়ন্তরস্থ কীটপতঙ্গ, কি পশুপক্ষাদিজাতীয় জীবের স্বতঃপ্রবণ (instinctive) কার্যকলাপ দৃষ্টে অনুমিত হয় যে, তাহাদেব মধ্যে ঈশ্বর স্থানীয় এমন কোন অত্যাচ্চাদর্শ কল্পিত নাই, বাহা তাহাদের অনুসরণীয়; অথবা যদি একরূপ উচ্চাদর্শ একান্তই কল্পিত হইয়া থাকে, তবে তাহাও তাহাদের বুদ্ধিবৃত্তিবিকাশের অনুরূপই হইয়া থাকিবে। আমরা তদুচ্চস্তর মনুষ্য জগতে আসিয়া কি দেখিতে পাই? তমসাজ্ছন্ন মানব তত্ত্বদমুরূপ গুণেই স্বীয় আদর্শ গঠিত

করিয়া তমোগুণের নিরতিশয় সম্প্রসারণতারূপ তাহাকেই ঈশ্বর বলিয়া নির্দেশ করিতেছে। কল্পিত ভূত প্রেত প্রভৃতি অপদেবতা-গণই তাহাদের ঈশ্বরামুভূতির পর্যাপ্ত পরিসীমা। এ কথা পঞ্চদশীকারও নির্দেশ করিয়াছেন। রক্তঃপ্রধান মানবগণ স্থনিহিত রক্তোগুণের বলবত্তা অনুসারে কল্পিত ঈশ্বরে বিভিন্ন শক্তাদির আরোপ করিয়া তাহাদিগকেই জীবনের আদর্শ করিয়াছে। অশ্ব-দেবীক বেদোক্ত ইন্দ্র, সোম, বরুণ, বায়ু, অগ্নি, সবিতা ও দিক্-পাল প্রভৃতি মহাশক্তিসম্পন্ন দেবগণ এইরূপে আদর্শস্থানীয় হইয়া ঈশ্বররূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। সত্ত্বপ্রবণ মানবগণ তাহার কল্পিত উচ্চাদর্শে শান্তি, প্রেম, দয়া, বিজ্ঞান ও নির্মলতা প্রভৃতি স্থনিহিত-গুণেবই আরোপ করিয়া তাহাদের ঈশ্বরকে মনোতিমত গঠন করিয়া লইতেছে। ফলতঃ একপ বিচারের বিশিষ্ট সিদ্ধান্ত এই যে, অশ্ব-দাদির অন্তর্নিহিত গুণপ্রাবল্য বশতঃ আমরা যে উচ্চাদর্শকে ঈশ্বর-রূপে নির্দ্ভাবণ করিতেছি, তাহা আমাদেরই মনঃপ্রতিবিম্বিত গুণাদিব যৎকিঞ্চিৎ প্রক্ষুব্ধ মাত্র। সেই সেই গুণের সম্পূর্ণ বিকাশমানতা সম্পাদনই আমরা ঈশ্বর লাভের সীমান্ত তত্ত্ব বলিয়া মনে করিতেছি। স্মরণ্যঃ দেখা যাইতেছে যে, একমাত্র গুণ বৈষম্যেই কল্পিত আদর্শ বা ঈশ্বরের বৈষম্য হইয়াছে। তাই প্রত্যেকের ঈশ্বর স্বতন্ত্র। যদিও কোন অবতাব কল্প বিভূতিমান্ ব্যক্তিবিশেষকে আমরা অধিকাংশই উচ্চাদর্শ বা ঈশ্বর মানিয়া লই, তথাপি নিপুণভাবে তাবিয়া দেখুন, জ্ঞানী “রাম” তাহার জ্ঞানদর্শনে প্রেমিক “শ্রাম” তাহার নারদীয় ভক্তি দর্শনে এবং হস্তত কোন উচ্চাধিকারী একাধারে জ্ঞানী ও প্রেমিক “বহু” তাহার জ্ঞান ও প্রেম দর্শনে তাহাকেই জীবনের উচ্চাদর্শ স্থির করিয়াছে। যতদিন না অন্তর্নিহিত গুণবৈষম্যের নিঃশেষ সাম্য হইবে, ততদিন এরূপ আদর্শ-ভান্ ছাড়াইতে জীবের সাধ্য নাই। ত্রিগুণোন্মূলিত হৃদয়বান্ মানবই সেই নিবপেক্ষ (absolute) সংস্করণে অবস্থানের যোগ্য হয়। ইহাই ভাষ্যবর্ষীয় দার্শনিকগণের যৌক্তিক ও আবুভাবিক উপপত্তি।

ঈশ্বরোপাসনাই এ প্রবন্ধের মুখ্য বিষয়। সুতরাং ঈশ্বর সম্বন্ধে আলোচনা না করিয়া উপাসনা বিষয়ে ঋতিহীন হস্তক্ষেপ করা অসমীচীন বোধ হওয়াতেই উচ্চাদর্শ বা ঈশ্বর সম্বন্ধে পূর্বে স্বমত ব্যক্ত করিয়া পশ্চাৎ প্রতিদর্শন ও পুরাণাদিতে ঈশ্বরের কিরূপ স্বরূপ নির্দেশ করা হইয়াছে, সংপ্রতি যথাশাস্ত্র তাহারই আলোচনা করিব।

অনাদি অজ্ঞান বশতই আমরা প্রত্যেকে নানাশুণাধিত ও কল্পতৎপব হইয়া জনন-মরণ-সঙ্কুল মহামোহাধিত সংসার ক্ষেত্রে বিচরণ করিতেছি। এবং স্বীয় ভাবনামুরূপ উচ্চাদর্শ কল্পনা করিয়া তন্মাতেকেই পরমপুরুষার্থ বলিয়া নির্দ্ধারণ করিতেছি। পূর্বজন্মান্বিজিত সংস্কার ও দেশকাল-নিমিত্ততাই বিভিন্ন গুণ-প্রবণতার কাবণ বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। যে কোন কারণেই কেন আমরা প্রোক্তরূপ বিভিন্ন গুণাক্রান্ত হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়া থাকি না, আমাদের মনঃ কল্পিত অক্ল্যুচ্চাদর্শ বা ঈশ্বর যে সকলেরই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, তদ্বিষয়ে বোধ হয়, কাহারও মতদ্বৈধ নাই। ইহ-জগতে বিভিন্নধর্ম্ম মতের উচ্চাদর্শরূপ ঈশ্বরকল্পনাও যে কেন বিভিন্নতা দেখিতে পাই, তাহার কারণানুসারেও আপনাদের বোধ হয়, এখন কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু এ বৈষম্যের গায়া ও সামঞ্জস্য কোথাও দৃষ্ট হয় কি না, তাহাই বর্তমানে আলোচনার বিষয়।

অপৌরুষেয় বেদ গম্ভীরস্বরে বলিতেছেন, “নেহ নানান্তি কিঞ্চন” বিভিন্ন পদার্থ কিছুই নাই। “একং সৎ বিপ্রা বহুধা বদন্তি” এক সংকেই পণ্ডিতগণ নানাভাবে প্রকাশ করিতেছেন। পূর্বেই বলিয়াছি, বিভিন্নগুণাক্রান্ত মানব স্বকীয় গুণপ্রাবল্যানুসারে এক অধিতীয় তত্ত্ব হইতেই তদীয় কল্পিত ঈশ্বরকে তত্ত্বদগুণাধিত বলিয়া বর্ণন করিয়া থাকেন। সেই জন্ত গুণাক্রান্ত মানবের ঈশ্বর ও সগুণ বা তটস্থলক্ষণাধিত। সগুণ ঈশ্বরকে শ্রুতি বলিতেছেন, “ঋতো বা ইমানি ভূতানি যাস্তে যেন জাতানি জীবন্তি ধৃ-

প্রমত্ত্যভিসংবিশস্তি তৎবিজ্জিজ্ঞাগম্য তদেব ব্রহ্ম" যাহা হইতে এই সকল ভূত জন্মগ্রহণ করিয়াছে, যাহাতে অবস্থিতি করিয়া পুনরায় যাহাতে লয়প্রাপ্ত হইতেছে, তিনিই বেদের সগুণ ব্রহ্ম। বাদরায়ণ মূনি তাহাই সংক্ষিপ্ত করিয়া ব্রহ্মসূত্রে বলিলেন, "জন্মান্তর্যমতঃ" যাহা হইতে জন্মাদি অর্থাৎ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলয় হইতেছে, তিনিই সগুণ ব্রহ্ম। নিগুণ ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ বাক্যাতীত ও ভাবাতীত। তদ্ভাবপ্রকাশে ভাষাব প্রসরতা নাই। "যতো বাচো নিবর্তন্তে অপ্রাপ্য মনসাসহ"। শ্রুতি তাই "নেতি" "নেতি" বলিয়া সর্ব নিষেধের শেষ সীমাকেই নিগুণ ব্রহ্মের স্বরূপলক্ষণ করিয়াছেন। সগুণ ও নিগুণ ব্রহ্মসম্বন্ধে আবও একটু বিস্তৃত করিয়া বলিলেই পর্যাপ্তি হইবে। অনাদি কৰ্ম্মপ্রভাবে আমরা বিবিধগুণরজ্জুতে আবদ্ধ হইয়া জন্ম মরণ শ্রোতে প্রতিনিয়তই পুনঃ পুনঃ আবর্তিত হইতেছি। অন্তর্নিহিত গুণভাবকল্পিত বিরাট-মূর্তিতে বা ব্যক্তি বিশেষে অধ্যস্থ করিয়া যখন আমরা জগতের সৃষ্টিকল্পনা করিয়া লই, তখনই স্বগুণ ব্রহ্মভাব যেন আমরাই প্রকটন কবি। আত্যন্তিক গুণনিঃশেষে আবার যখন মনশ্চক্রে প্রাণে, প্রাণকে তেজ্জে, তেজ্জকে পরমপুরুষ সচ্চিদানন্দে বিলোপ করিয়া দেহাত্মভাব সমূলে উন্মূলিত কবত অভেদে আত্মসাক্ষাৎ করি, তখনই নানাঙ্ক জ্ঞানেব অভাব হেতু সর্ব নিষেধের শেষ-সীমাবস্থিত আমাদের নিগুণ ব্রহ্মোপলব্ধি হয়। বেদ ও বেদান্ত-দর্শনে ঈশ্বরের এইরূপ সগুণ ও নিগুণাভাব কথিত হইয়াছে।

অন্যদেশীয় বিভিন্ন দার্শনিকগণ এ তত্ত্বের কিরূপ মীমাংসায় উপস্থিত হইয়াছিলেন, সম্প্রতি সংক্ষেপে তাহারই আলোচনা করিব।

ভারতবর্ষীয় দার্শনিকদিগকে প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভাগ করা যাইতে পারে। (১) নাস্তিকদার্শনিক ও (২) বেদপ্রমাণ-বাদী আস্তিকদার্শনিক। নাস্তিকদিগের মধ্যেও চার্বাক ও বৌদ্ধ এই দুই সম্প্রদায় আছে। ইহাদিগের মধ্যেও দেহাত্মবাদ দৈহিক শরিগামবাদ, কণিক বিজ্ঞানবাদ, সর্কান্তিভবাদ ও সর্কশূভবাদ

প্রভৃতি অবাস্তব দৃষ্ট হয়। ইহারা কেহই ঈশ্বর স্বীকার করেন নাই। ঈশ্বর উপাসনা প্রসঙ্গে ঈশ্বরোপলাপকারী নাস্তিক মত উল্লেখের অযোগ্য হইলেও প্রসঙ্গের পৌরোপার্থ রক্ষার জন্তই মাত্র ইহাদের নাম করা হইল। মহাসমস্যাচার্য্য ভগবান্ শঙ্করস্বামী অকাট্যযুক্তিকৌশলে ইহাদের সমস্ত মতকেই একদিন ধ্বংস করিয়াছিলেন। অনুসন্ধিৎসুগণ “এক আত্মনঃ শরীরে ভাবাৎ” (ব্রহ্মসূত্রে ৩৩৫৩) এবং “ব্যতিরেকস্তদ্বাব্যবহারত্বলক্ষিবৎ (ব্রহ্মসূত্রে ৩৩৫৪) সূত্রদ্বয়ের শারীরকভাষ্যে চার্কাক মত ধ্বংস দেখিতে পাইবেন। এবং উক্ত ব্রহ্মসূত্রেরই ২য় অধ্যায়ের ২য় পাদের অষ্টাদশসূত্র হইতে দ্বাত্রিংশৎসূত্র পর্য্যন্ত শারীরকভাষ্যে বোধমত নিরাশ করিয়া ভাষ্যকার শঙ্করাচার্য্য তর্কশাস্ত্রের যে বিরূপ অনলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা মাত্র উক্ত অংশ পাঠ করিলেই বোধগম্য হইতে পারিবে।

অধুনা বেদপ্রমাণবাদী আন্তিকদার্শনিকগণ যে যেকপে কল্পনা করিয়াছিলেন, তাহারও সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রসঙ্গোপলক্ষে উল্লেখ করিতেছি। অস্বদেশীয় প্রসিদ্ধ যদুদর্শন সকলেই বেদের অপৌরুষেয়তা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ইহাদিগের মধ্যে কোন কোন দর্শন ঈশ্বরোপলাপ করিয়াও শ্রুতি প্রমাণপত্র হইয়াই মাত্র আন্তিকদার্শনিক শ্রেণী হইতে বহিষ্কৃত হন নাই। বেদের সত্ত্ব ও নিগুণতাব উভয়ই অধিকারিত্বে উত্তর মীমাংসার অভিমত বলিয়া নির্দেশ করা যাইতে পারে। পূর্বেই ইহার বিস্তৃত আলোচনা করা হইয়াছে। ষোড়শ পদার্থবাদী ভ্রাম বেদপ্রমাণবাদী হইয়াও তর্কপ্রতিষ্ঠিত মত স্থাপনেই সমধিক যত্নশীল। এমন কি বেদের প্রমাণ ও ইহারা তর্কেই প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। কিন্তু যুক্তিবিচারে ইহারা পাশ্চাত্যদেশীয় দার্শনিকগণের ভ্রাম অজ্ঞেয়বাদেই (agnosticism) সীমাবদ্ধ না রহিয়া অনুমান প্রমাণে ঈশ্বর নামক পদার্থের নির্ণয় করিয়াছেন। সপ্তপদার্থবাদী বৈশেষিকদর্শন তাহার উপরই কিছু রং পরং তুলিয়া ভ্রামের

অস্পষ্ট পরমাত্মবাদই সবিশেষ প্রকটন করত উপাদান ও নিমিত্ত কারণ স্পষ্ট ব্যক্ত করিয়াছেন মাত্র। পঞ্চবিংশতিতত্ত্ববাদী কপিল ত্রিগুণাত্মিক। প্রকৃতিরই বিপরিণামে দিক্দৃশাদি পদার্থের উৎপত্তি নির্ণয় করিয়াও পুরুষ বা আত্মাকে না নিমিত্ত না উপাদান কারণ বলিয়া যেন শুদ্ধাঈতত্ত্বগ্রহের ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছিলেন। কপিল পঞ্চাশুগামী পতঞ্জলি ঈশ্বর স্বীকার করিয়াও যেন বেদান্তের নিগূঢ়তাবের সমধিক সন্নিহিত হইয়াছিলেন। একাত্মতত্ত্ববাদী বেদান্তদর্শন সর্বোচ্চস্তরে উঠিয়া নিমিত্ত ও উপাদান, কারণ ও করণকে একই নির্দেশ করিয়া যেন দার্শনিকতত্ত্বাচলের গরিষ্ট শেখবে উপস্থিত হইয়াছিলেন। সুতরাং আমরা দেখিতেছি, গোতমই প্রথমে দার্শনিকভাবে দ্বৈততত্ত্বের সূত্রপাত করিয়াছেন; বৈশেষিক-গণও প্রায় তদ্রূপ; তবে তাহারা একটু সমধিক চিন্তাশীল বলিয়া আমার মনে হয়। সাংখ্যের পরিণামী চিন্তা প্রকৃতি পরমপরিণামিনী। পতঞ্জলির ঈশ্বরতত্ত্বও নির্বাক-অদ্বৈততত্ত্ব সূচিত হইয়াছে কিনা, স্থির সিদ্ধান্ত করা সুকঠিন। বেদান্তের বিবর্তবাদ সর্বোচ্চ দার্শনিকেবই বিশ্রাম স্থল। প্রাকৃতিক নিখিল পরিণামই ইহাদেহ মতে অদ্বৈততত্ত্ব অধ্যস্ত হইয়া মরুভূমিতে জলভ্রমের স্থায় বিজ্ঞপ্তিত হইয়াছে।

(১) নৈয়ায়িকেব অজ্ঞানের ঈশ্বর উপাস্ত কিনা গোতমের জ্ঞানসূত্রে তাহার উল্লেখ পর্য্যন্ত দৃষ্ট হয় না। ১৬শ পদার্থের মধ্যে যে আত্মপদার্থ আছে, তাহা জীবাত্মপর বলিয়াই মনে হয়। এই নৈয়ায়িকদিগের মতে জীবাত্ম বিষয়ক জ্ঞানই মোক্ষ-দায়ক-তত্ত্বজ্ঞান। জীবের দুঃখ জন্ম প্রবৃত্তি দোষ ও মিথ্যা জ্ঞানের ক্রম-পরম্পরায় অন্তর্হিতই ইহাদের মতে মোক্ষ। “দুঃখ-জন্ম-প্রবৃত্তি-দোষ-মিথ্যাজ্ঞানানামুত্তরোত্তরাপায়ে তদন্তরাপায়াদপবর্গঃ” (গোতম-সূত্র)।

(২) কণাদ প্রণীত বৈশেষিক দর্শনে ও ঈশ্বর প্রতিপাদক কোন সূত্র নাই। কিন্তু নব্য বৈশেষিক পণ্ডিতগণ আত্মাকে জীব ও পরমভেদে দ্বিবিধ কল্পনা করিয়াছেন। আত্মমনঃ সংযোগ

স্বয়ং হইলেই ইহাদের মতে মোক্ষ হয়; কিন্তু তদন্যায় স্ত্রের লেশমাত্রও নাই।

(৩) কপিলের মোক্ষ বিবেকজ্ঞানাধীন। প্রকৃতি পুরুষই বিবেক জ্ঞানের বিষয়। প্রকৃতি ও পুরুষের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হইলেই জীবের প্রাকৃতিক বন্ধন থাকে না; কায়েই কৈবল্য নামক মোক্ষ হয়। অপরিণামী পুরুষ একরূপ বিধায় ইহার আবাস্তর ভেদ নাই। কিন্তু প্রকৃতির নানাত্ব আছে;—যথা মূল প্রকৃতি, প্রকৃতি বিকৃতি, কেবল বিকৃত ও অল্পভররূপ। ইহার পুরুষই বেদান্তের ব্রহ্ম এবং প্রকৃতিই মায়া। “মায়াত্ম প্রকৃতিং বিদ্বান্ মাগ্নিনস্ত মহেশ্বরমিতি”—শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ। ইহার চৈতন্যকে পৃথক্ পদার্থ বলিয়া মানিয়াছেন। “ন সাং সিদ্ধিকং চৈতন্ত্ৰ্যং প্রোত্যেকাদৃষ্টেঃ” (সাংখ্যসূত্রে) অর্থাৎ চৈতন্ত্ৰ্য পদার্থ ভূত সংঘাতাত্মক দেহের সাংসিদ্ধিক ধর্ম্য নহে। যখন প্রকৃতির বিপরীণামেই সৃষ্টি, তখন সাংখ্যমত জ্ঞায় ও বেদান্তের মধ্যবর্তী হইয়া যেন ইজিতে অবৈতকে তবেরই সৃচনা করিয়া দিতেছে। ইহার নিত্যেশ্বর স্বীকার করেন না। কারণ তাহার প্রমাণাভাব। সম্বন্ধাভাব বলিয়া তাহার অসুমানও হয় না। “ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ প্রমাণাভাবাৎ” “সম্বন্ধভাবানুমানং” (সাংখ্যসূত্রে)। কিন্তু ইহাদের মতে অল্প ঈশ্বর আছে। “মুক্তায়নঃ প্রশংসা উপাসনাসিদ্ধন্ত বা”। এতদ্ব্যতীত হরিহরাদি পূর্ব কল্পের উপাসনা সিদ্ধ জীব। সিদ্ধজীবই পরকল্পে ক্ষমতা প্রাপ্ত ঈশ্বর বলিয়া কথিত হইয়াছে।

(৪) শ্বেশ্বর সাংখ্য বা পাতঞ্জল দর্শনমতে ঈশ্বর এক প্রকার পুরুষ বিশেষ। এই মূলপুরুষ জীবনামধারী পুরুষ হইতে সম্যক্ পৃথক্। “ক্লেশকর্ম্মবিপাকাশয়েরপরামৃষ্টপুরুষবিশেষ ঈশ্বরঃ” (যোগসূত্রে)। ক্লেশকর্ম্ম ও বিপাকাশয়াদি দ্বারা অপরামৃষ্ট পুরুষ বিশেষই ঈশ্বর।

“ঈশ্বর প্রণিধানাক্ষা” সূত্রে ঈশ্বরোপাসনা ও সূচিত হইয়াছে।

(৫) ব্যাস-শিষ্য জৈমিনি প্রণীত পূর্বমীমাংসাসাধিত কর্ম্ম-কাণ্ডাবক বেদভাগের বিচারেই পরিপূর্ণ রহিয়াছে। বেদান্ত সিদ্ধান্ত

ব্রহ্মদ্বৈততত্ত্ব জ্ঞান এ দর্শনের অনভিমত । বেদান্তবিৎ ঘোষন বলেন জগৎপ্রপঞ্চের নিঃশেষ বিলয়ে মোক্ষ হয়, ইহারা বলেন জগৎ সৰ্বক্লেব বিলয়ে মোক্ষ ; সুতরাং ইহারা জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন । কিন্তু ঈশ্বরতত্ত্বালোচনায় ইহাবা সমধিক যত্নশীল নহেন ; কাবণ ইহাদের মত এই যে বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানই মোক্ষের একমাত্র কারণ । সুতরাং শাস্ত্রান্তরালোচনা ইহাদের মতে নিতান্ত নিষ্ফল ।

(৬) বেদান্তের ঈশ্বর-ভাব পূর্বেই উক্ত হইয়াছে । এতদ্ব্যতীত তিনটি অবাস্তবভেদ দৃষ্ট হয় । নির্বিশেষাধৈতবাদী অদ্বিতীয় ব্রহ্মতত্ত্ব ব্যতীত আর কিছুই অস্তিত্ব স্বীকার করেন না । জীব ও ব্রহ্মেব অভেদ উপলব্ধিই ইহাদের নির্মাণ মুক্তি । ইহারা বলেন “ব্রহ্মসত্যং জগন্নিখ্যা জীবো ব্রহ্মেব না পরঃ ইদমেবতুঙ্গচ্ছাত্ৰং” ইতি বেদান্তুডিণ্ডিম ।

বিশিষ্টাধৈতবাদিগণ স্বজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদ স্বীকার না করিলেও ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার না করিয়া সেবাসেবকানুরূপ উপাসনায় পক্ষপাতী । শুদ্ধধৈতবাদিগণ জীব ও জগৎ উভয়কেই ব্রহ্মাত্মিক ও সত্য বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন ।

পূর্বোল্লিখিত বদ্দর্শনোক্ত ঈশ্বরতত্ত্বালোচনায় আমরা দেখিতে পাইলাম, দার্শনিকগণ কেহই একমত নহেন । সকলের ঈশ্বরদর্শনই সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র । সকলেই স্ব স্ব পক্ষ সমর্থনার্থ ক্রটি হইতে অঙ্কুলা যুক্তি সংগ্রহ, কবিতা স্বমত-সমর্থনে যত্নবান্ হইয়াছেন ; অথবা ক্ষতিব শ্লোক নিজাভিপ্রায়ানুসারে ব্যাখ্যা করিয়া স্বীয় অভিমতের অঙ্কুরূপ ঈশ্বর ভাব প্রকটন করিয়াছেন । উপরি উক্ত দার্শনিক-তত্ত্বাদি অধিকারিভেদে সর্বত্রই স্ফুট প্রযোজ্যমান হইয়াছিল ; এবং তত্ত্ব সময়ে ইহাদের সম্যক উপযোগিতা অনুমান করিয়াই দার্শনিকগণ বিভিন্ন রূপ মতাদিব প্রেষ্ঠ্য জ্ঞানদর্শন করত নান। গুণাত্মক মানবজাতিকে ক্রমে ক্রমে একাধৈততত্ত্বে আনিতেই অগ্রসর হইয়াছিলেন । যোর-ভ্রমসাক্ষর দেহাত্মবাদী চার্লীকগণ

বলিলেন দেহাতিরিক্ত আত্মা নাই। তমঃপ্রধান মানব তাহাই
বুঝিয়া বলিল, “দাবজ্জীবৎ সুখং জীবৎ ঋণং কৃত্বা মৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্ত দেহস্ত পুনরাগমনং কৃত্বা ?” জড় পরিণামবাদী (modern
evolutionists) এক জড়কেই আমি কারণ স্থির করিয়া চৈতন্যকে
তাহার পরিণাম নির্দেশ করিলেন। বিজ্ঞানবাদী তদুচ্চত্তরে উঠিয়া
শূন্য বা আকাশতত্ত্বের উপর আর উঠিতে পাবিলেন না। তদ-
পেক্ষা বিবেকবান্ প্রত্যক্ষ প্রমাণবলস্বীকরণ লৌকিক জ্ঞানাবলম্বনে
অজ্ঞেয়বাদ (agnosticism) এবং প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানবাদ (Compte's
positivism) প্রচার করিলেন না। জগতের সেরূপ অধিকারীরও
অবধি নাই; অনেকে তাহাই অবলম্বন করিল। [ক্রমশঃ]

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী।

কোথা' যাই ?

আমি চাহি ভুলিতে সংসাবে,
সংসাব-অতীত স্থানে যেতে।
সে' কেন গো চাহে বাঁধিবারে
শত স্নেহ মমতা-ডোবেতে ?

কেনইবা কাতর নয়ানে
মুখ চাহি' ফেলে অশ্রুধার ?
এত ক্ষুদ্র নিবাস্রয় হৃদে
এত কি আশাব আছে তার ?

আমি বলি—‘আমি চিরহুঃখী
দিবাব মতন কিছু নাই’ !
এত বলি, তবু চাহে মোবে ;
সংসাব ভুলিতে কোথা' যাই ?

শ্রীচাক্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

“বাসনার অবসান ।”

পরীক্ষা বিষম ঘোর,
হৃদয় হৃদয় মোব,
নাহি জানি কেমনে মা ! হইব গো পার !

পাঠা'লি কি এ সংসারে,
কাদাইতে তনয়ারে,
এই কি মা ! মাতৃ-স্নেহ হৃদয়ে তোমার ?

আমি কত্না কান্সাগিনী,
তুমি মা ! বিশ্বের রাণী,
ভব-ঘোবে স্ববা ক'বে কর গো উদ্ধার ;

দয়াময়ী তব নাম,
কেন দেবি ! মোবে বাম ?
ক্রন্দনে, নীবব মা গো থাকিওনা আব ।

পেয়েছে বডই ক্ষুধা,
দে মা তোর প্রেম-সুধা,
অন্ত কোন দ্রব্যে তৃপ্তি হবে না আমাব ।

কেমনে ছুঃখিনী-বালা,
জুড়া'বে ত্রিতাপ-জ্বালা ?
তুমি মা ! না দিলে স্থান চরণে তোমাব ;

বিশ্ব-প্রেমে মাতাইয়ে,
বাধ তব পদাপ্রায়ে,
“বাসনাব অবসান” হউক আমার !

শ্রীমতী মলিনা বসু ।

মহামায়া।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর।]

(১১)

এক ছুই করিয়া সারদাসুন্দরী মহামায়ার প্রত্যাশায় সাতদিন বসিয়া রহিল,—মহামায়া আসিল না! পত্র লিখিল—উত্তর পাইল না, রক্ত ভৃত্য সনাতনও ত তব্ব লইয়া এককোশ দূর হইতে ‘পিশিমা পিশিমা’ করিয়া বাটীর ভিতরে প্রবেশ করিল না।—তবে মহামায়ার কি হইল?

সারদাসুন্দরী একদিন বৈকালে নলিনীর চুল বাধিয়া দিতে ছিল আর ভাবিতে ছিল। স্ব কুনানা চিন্তা সারদাব হৃদয়-পথ দিয়া যাতায়াত করিতেছিল,—শেষে সব চলিয়া গেল, কেবল গোটাকতক কুপড়িয়া রহিল। তাহার এদিক ওদিক ঘুরিয়া কিরিয়া পরস্পরে জড়াজড়ি করিয়া তাল প্রমাণ কেমন এক রকম হইয়া দাঁড়াইল। সারদা বুকিল, মহামায়ার নিশ্চয়ই কিছু বিভ্রাট ঘটয়াছে। সে আজ সাতদিন আসিয়াছে।—আসিবার কথা শুনিলে আগে হইতে যে পথ আশুলিয়া বসিয়া থাকে, সে মহামায়া সাতদিনের ভিতরে একটা সংবাদও লইল না!—মহামায়ার বিপদে তাহাব সন্দেহই রহিল না।—কিন্তু কি বিপদ!—ভাবিবার উপক্রমেই সারদাব চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। বাল্যকালের কথা—নিজের হৃদশা—হৃদশার প্রতিকাব—মহামায়ার সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ—প্রথম দর্শনেই ভালবাসাব নিগড়-বন্ধন—তাহাব আদর, স্বত্ব, মমতা,—তাহাব সহিত কলহ অভিমান—নানামুখ গায়িনী শ্রোতস্বিনী তাহাব হৃদয়ে একটা আবর্ত তুলিয়া বসিল।—নলিনীর বেণীসংবদ্ধ হস্ত তাহার পৃষ্ঠে ঝসিয়া পড়িল—বাণিকার কেশপাশ আবার ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া গেল।

নলিনী মুখ ফিরাইয়া দেখিল,—বউদিদি কাঁদিতেছে। বালিকা-কে মুখ ফিরাইতে দেখিয়া, সারদা নিজের অন্তমনস্কতা

বুঝিয়া, মুহূর্ত্তেই ভাবপরিবর্তন করিয়া ফেলিল। বলিল—“কি দেখিতেছি?”

কন্দন দেখিতে বালিকা এমনই অভ্যস্তা হইয়াছিল যে, সারদার চক্ষে জল দেখিয়া সে কিছুমাত্র বিচলিতা হইল না। পরন্তু সারদার প্রাণে তাহার মুখের স্বভাব সংলগ্ন হাসিটুকু ফুটিয়া উঠিল—বলিল—“দেখিতেছি তুমি কাঁদিতেছ।”

“আমাকে কাঁদিতে দেখিয়া কি তোমার হাসি আসিল?”

“কি করিব? কান্না দেখিয়া দেখিয়া আমার হাড় জলিয়া গিয়াছে। এখন লোকের কান্না দেখিলে আমার হাসি পায়।”

“বলিস কি!—তুই এই হৃথের মেয়ে, বলিলি কি নলিনী?”—

বালিকা মুখ অবনত করিল। সারদা অনুলি-প্রাপ্ত দিয়া সেই অবনত মুখ আবার তুলিয়া ধরিল। নলিনী তাহার মুখের পানে চাহিয়াই চক্ষু নাড়াইল। সারদা দেখিল কুসুমকোমলা বালিকার মুখে প্রবীণার গাভীর্ষ্য মাখিয়া গিয়াছে। সারদা কিছু বিস্মিতা হইল।—জোর করিয়া মুখ তুলিয়াছিল—পলক তুলিতে ত আর জোর চলিবে না। সারদা আর একবার চাহিতে তাহাকে, অনুরোধ করিল। বালিকা অনুরোধ রক্ষা করিল না। বালিকার অধরে হস্ত সংলগ্ন ছিল,—হস্ত খুলিয়া লইল।—বালিকা মুখ ফিরাইল। সারদা তাহার চুল ছড়াইয়া দিল, বালিকা কথা কহিল না। কেশকলাপ ইতস্ততঃ—পৃষ্ঠে মুখে চোখে ছড়াইয়া দিল, তথাপি নলিনী কথা কহিল না, তখন সারদা বুঝিল, বালিকা লজ্জিত হইয়াছে। তাহার লজ্জা ভাঙ্গিবার জন্য আবার তাহার মুখ ফিরাইল—বাববার তাহা চুম্বিত করিল, আর বলিল—“তোমার মা আমার মামী—আর তুই আমার ননদী—এবার হইতে তোমার মাকে দেখিলে আমি ঘোমটা দিব, আর তোমার সঙ্গে গল্প-গুজব আদর সোহাগ, বিবাদ বিসম্বাদ—যাহা কিছু করিবার সম্ভব করিব। তুই আমার যোগ্য সঙ্গিনী।—এখন বল দেখি—আমাকে ছাড়িওনা।”

বালিকা আবার মুখ ফিরাইল—চোখ তুলিতে তুলিতে অধর-প্রান্তে আবার হাসির রেখা দেখা দিল। সারদার চক্ষুজল শুকাইয়া মেঘের রাজ্যে চলিয়া গিয়াছে। মনে মনে বালিকাকে দ্বিগুণ চতুর্ভুজ ভাল বাসিয়া ফেলিল। বুঝিল, তাহার স্বভাবের—একটা প্রতিবিম্ব বিধাতা মেদিনীপুরে আঁকিয়া রাখিয়াছিল—সেটা আপনা আপনি কেমন করিয়া তার ঘরে আসিয়াছে।—ইহাকে কোনও গতিকে ধরিয়া রাখিতে পারিলে—প্রকৃতিদত্ত এই ক্রীড়নক লইয়া, সংসারের জ্বালা যন্ত্রণাগুলো ভুলিবার উপায় হইবে।

“আমার মাথাখাস্ বন্ ভাই! আমাকে ছাড়িবি না।”—সারদা উপবাচিকা, বালিকার হাত দুইটা জোর করিয়া ধরিল।

বালিকা ননদীর পদে অনধিকারিণী ছিল—এ কয়দিন সাবদা তাহাকে কত্না বাৎসল্যেই দেখিয়া আসিতেছিল—স্বভাবসুলভ চপলতা পরিত্যাগ করিয়া তাহার সহিত বিজ্ঞার মত ব্যবহার করিতেছিল। আর সেই গর্জ্জভরা আসন পরিত্যাগ করিয়া, বালিকাকে আপনাব সকল অধিকার ছাড়িয়া দিল। বালিকা ননদীর পদ পাইল, ননদীর তেজ পাইবে না কেন?—সারদার প্রশ্নের উত্তরে বলিল—“বলিতে পারি না।”

“কেন ভাই?”

“তা’ বলিতে পারি না।”

“কেন, আমি কি তোদের অঘড় করিয়াছি?”

বালিকা এ প্রশ্নের উত্তর দিল না। আবার মাথা হেঁট করিল, —অঙ্গুলি দিয়া পায়ের নখ খুঁটিতে লাগিল। সারদা তাহাব হাত টানিয়া ধরিল।—আবার জিজ্ঞাসা করিল—“কেন ভাই?—আমায় যদ্ব কি তোর ভাল লাগিতেছে না?”

বালিকা উত্তর করিল না। সারদা তাহার গাল টিপিয়া ধরিল —আর বলিল—“হুঠমেন্নে তোকে ছাড়িবে কে?”

বালিকার মুখ আবার প্রশান্ত হইল—সেই ঈষদাবনত প্রশান্ত ও মুখের ঈষদ্রুমিত নয়ন সারদার পিপাসিত লোচনের উপর পড়িল,

—মুখা সারদাসুন্দরী মোহের সাগরে ডুবিয়া গেল।—বালিকা বলিল—“মা এ স্থানে থাকিতে চাহিতেছে না—কতদিন ধরিয়া বা’ব বা’ব কবিতোছে।”

অতি আগ্রহে সাবদা জিজ্ঞাসা করিল—“কেন ?”

“মা বলে, তোমরা কুহকিনী—তোমরা আমাদিগকে আব একটা কি বিষম বিপদে ফেলিবাব ক্ষুদ্র ধরিয়া রাখিয়াছ।”

“তোমরা।—এক কুহকিনী আমিই না হয় হইলাম, আর কুহকিনী কে ? মা—আমাব শান্তাডী।”—কথাটার সারদার আনন্দ উছলিয়া উঠিল, কিন্তু ভাবার্থ বুঝিবাব একটা নূতন কোতূহল উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।” [ক্রমশঃ]

শ্রীকীবোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

মহিলা-মেলা ।

“Virtue may be assailed, but never hurt,
Surprised by unjust force, but not enthralled :
Yea, even that which mischief meant most harm,
Shall in the happy trial prove most glory ”

—MILTON'S COMUS.

বাঁহার অসাধারণ রণ-পাণ্ডিত্যে ও মন্ত্রণা-কুশলতায় মোগলের গৌরব-ভাস্কর মধ্যাহ্ন গগনে স্থাপিত হইয়াছিল, বাঁহার প্রচণ্ড প্রতাপে হিন্দুজাতী বীৰ্য্য-বহির উজ্জল ফুলিঙ্গ স্বরূপ রাজপুত জাতিরও স্বাধীনতা-ববি চিবতরে অন্তর্মিত হইবার উপক্রম হইয়াছিল, বাঁহার ভূজবলের নিকট দ্রুস্ত আকগান জাতিও পরাজিত হইয়াছিল, বাঁহার বিচক্ষণতায় ও সুশাসনে শাস্তি-শশী সুবিমল কিরণ দান করিয়া ভারতবর্ষের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লীভল করিতে সমর্থ হইয়াছিল, বাঁহার যশঃ-প্রভায় দিগ্গণ্ডল উদ্ভাসিত, বাঁহার উদার রাজনীতি ও সমদর্শিতায় হিন্দুজাতি মুগ্ধ, বাঁহার “দিল্লীখরে

বা রমণীরাই বা* নাম আনিও খ্যাত, এবং বাহার তেজস্বিতা মহৎ ও উদারতা প্রভৃতি সংগ্গাবলী রাজভক্ত হিন্দুজাতি কখনও ভুলিবে না, সেই মোগল-কুল-তিলক হুমায়ুন-তনয় আবদুল মোজাক্যার মহম্মদ জেলালুদ্দিন আকবর রাজি বাহার এই “মহিলা-মেলা”† প্রবর্তক।

যখন সম্রাট আকবর দোর্দণ্ড প্রতাপের সহিত ভাবতের শাসন দণ্ড পরিচালনা করিতেন, তৎকালে তিনি প্রতিমাসেই এক একটা মহোৎসব করিতেন। এই প্রতিমাসের অনুষ্ঠিত মহোৎসবের পরবর্তী নবম দিবসে উক্ত “মেলা” বসিত—এজ্ঞা ইহার নাম “নওরোজা”‡ কিন্তু সম্রাট আদর করিয়া ইহার নাম বাধেন—“খোসরোজা” বা “আনন্দের দিবস।” § সম্রাটের প্রাসাদেব কোন নির্দিষ্ট স্থানে এই “নওরোজার” বাজাব বসিত। এ বাজারে পুরুষ সমাগম আদৌ নাই; রমণীরাই ক্রেতা, রমণীরাই বিক্রেতা—এ বাজারে রমণীরাই সব। কোন কবি বলেন:—

“রমণীকে বেচে, রমণীতে কিনে,

লেগেছে রমণী-রূপের হাট।”

রমণীরা যাবতীয় শিল্প-চাতুরীমুক্ত নয়ন ও মন তৃপ্তিকর দ্রব্য লইয়া সারি সারি দোকান সজাইয়া বসিয়া আছেন! যে দিকে

* Vide, Badoni. Vol. II. P. 324.

† আইন-ই-আকবরীতে আকবর সাহেবেব এই নাম দৃষ্ট হয় না। প্রসিদ্ধ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত ব্রজমান সাহেবেব রুত আইন-ই-আকবরীতে এই নাম দৃষ্ট হয়:—Abul Fath Jalaluddin Mahammud Akbar Padisha i Gazi.

Vide. Blochman's Translation of “Ain-i-Akbari. By Abul Fazi, Allami” Vol. I P. 186.

‡ “নওরোজা” বা “নোরোজা” শব্দের অর্থ “নূতন দিবস” অর্থাৎ বৎসরের প্রথম দিন, কিন্তু এখানে উহা অর্থ ভিন্ন প্রকাব। এখানে ইহা “নবম দিনের উৎসব” এইরূপ করিতে হইবে। মহাত্মা টড ইহাকে “Ninth-day fair” বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

§ Vide, Blochman's. Ain-i-Akbari. Ain. 28. of Vol. I, Page. 276. & 277.

চাও, সে দিকেই রমণীর শোভা বিরাজমান। সম্রাট পত্নী ও কীকার পরিবারস্থ মহিলাগণ ক্রেতা ও রাজন্তবর্গের ললনাগণ বিক্রেতা। ভারতে সম্রাটের অধীনস্থ যাবতীয় রাজপুত রাজ্যগণের মহিলাগণ ও অন্তান্ত রাজকর্মচারীগণের মহিলাগণ এই বাজারের শোভা বৃদ্ধি করিয়া সম্রাটের মনে অতুলনীয় আনন্দ সঞ্চার করিয়া দিতেছেন। এই আনন্দের দিনে আনন্দ-বাজারে সম্রাট আকবর সাহা ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেছেন। লাংণ্যবতী ললনাগণের রূপে আজ সম্রাটের প্রাসাদ আলোকিত, শিল্প-চাতুরিযুক্ত দ্রব্যের অনির্বচনীয় সৌন্দর্য্যে রাজভবন উদ্ভাসিত, সমগ্র রমণীগণ এই অপূর্ব আনন্দ ভোগ করিয়া পরম উল্লসিত, সম্রাটও ঐ সকল রমণীগণের সৌন্দর্য্য-গরিমা ও ঐ সকল দ্রব্য সকলের ক্রয় বিক্রয় দেখিয়া অনন্ত পুলকে পুলকিত। ছদ্মবেশ-ধারী সম্রাট এ বাজারে কোথায় বসিয়া গল্প কবিত্তেছেন, কখন বা কেঁদন হ্রব্যের দর করিতেছেন, কখন বা কোন দ্রব্য ক্রয় করিতেছেন, কখন বা কোন স্ত্রীর সহিত মিষ্টালাপ করিতেছেন, কখন বা ললনাগণের প্রমুখ্যৎ রাজ্যের অবস্থা ও রাজ-কার্য্যের সমালোচনা ও রাজপুরুষগণের চরিত্র কাহিনী শ্রবণ করিয়া বেড়াইতেছেন; যেন অনন্ত-সুখ-সাগরের তিনি আনন্দ উদ্ভাসিত তরঙ্গে ভাসমান হইয়াছেন।

এ বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাটের কি উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইয়াছে, তাহা দেখা যাউক। যে বাজারে আদৌ পুরুষ সমাগম নাই, তথায় সম্রাটই বা কেন ছদ্মবেশে পরিভ্রমণ করেন? যত দূর অনুমান করা যায়, তাহাতে বোধ হয় যে, এই বাজার প্রতিষ্ঠা করিয়া সম্রাট স্বীয় রাজনৈতিক অভিসন্ধির কুটিলতা, স্বীয় স্তম্ভদর্শিতা ও অসং চরিত্রের অলস্ত প্রমাণ দিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ—এই বাজারে রাজপুত-সামন্তগণ ও রাজন্ত-বর্গেরা স্ব স্ব স্ত্রী, কন্যা, ভগিনী প্রভৃতি পাঠাইতে বাধ্য হইতেন। যে সকল রাজপুতেরা যুদ্ধ করিয়া সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা ও অন্তান্ত অধীনস্থ নরপতি-বৃন্দ এবং যাবতীয় মোগল আমীর ওমরাহ প্রভৃতি রাজপুরুষ

সকল স্বীয় অন্তঃপুরস্থ ললনাগণকে “খোসরোজের” বাজারে প্রেরণ করিয়া সম্রাটের দাসত্ব স্বীকার ও সম্মাননা করিতেন। কোন কোন ভীষণভাবে রাজপুত্রবর্গ এইরূপ ভাবে রমণীগণকে সম্রাট ভবনে প্রেরণ করিতে কুণ্ঠিত হওয়া দূরে থাকুক, বরং নিজেকে সার্থক জ্ঞান করিতেন। রাজপুত্রানার কোন কোন তেজস্বী নরপতিগণ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রমণীগণকে পাঠাইতেন। এই সকল তেজস্বী রাজপুত্র নৃপতিগণের মধ্যে কেহ কেহ যদিও সম্রাটের করে স্বীয় ভগিনী ও কন্যাগণকে সমর্পণ করিয়া ছিলেন, তথাপি সম্রাটের এবিধ আচরণে অনেকেই নিদারুণ কষ্টভোগ করিয়াছেন। একরূপ ভাবে হিন্দুর অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ করিয়া আকবর যে কেবল তাহাদের দাসত্ব স্বীকার করাইতেন তাহা নহে, একেবারে চিরকালের নিমিত্ত তাহাদের শুভ্র বংশ-গরিমার কলঙ্কলেপণ করিতে ক্রটি করেন নাই। তিনি জানিতেন যে, স্ত্রী জাতি হিন্দুর মান সম্ভ্রম ও গৌরবের আধার। অতএব এই হিন্দুর অন্তঃপুরে হস্তক্ষেপ করিলে যে হিন্দুর বস্তুত্ব স্বীকার করিতে বাধ্য থাকে না, ইহা জানিয়াই তিনি “মহিলা-মেলা” বা “খোসরোজের” প্রতিষ্ঠা করেন। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির নিমিত্ত তিনি এই গর্হিত পথ অবলম্বন করিয়া যে ভায়েব মস্তকে পদাঘাত করিয়াছেন—ইহা বলা বাহুল্য মাত্র। ইহাতে তাঁহার রাজনৈতিক অভিসন্ধির গূঢ়মর্শ্ব নিহিত থাকিলেও একরূপ অবস্থায় তাঁহার বুদ্ধির প্রশংসা করা যায় না। ইহাতে যে তাঁহার রাজনৈতিক অভিসন্ধির কুটিলতা প্রকাশ করিতেছে, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

দ্বিতীয়তঃ, একরূপ ছদ্মবেশে “মহিলা-মেলায়” পরিভ্রমণ করিয়া রাজ্যের শিল্পের অবস্থা স্বচক্ষে দেখিয়া যতদূর জ্ঞান লাভ হউক বা নাই হউক, ঐ সকল রমণীগণের প্রমুখ্যৎ রাজকাৰ্য্যের সমালোচনা ও রাজ-পুরুষগণের চরিত্র সম্বন্ধে কথা বার্তা শুনিয়া তাঁহার রাজ্য শাসনে যে অনেকটা সাহায্য হইত, ইহা সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে। যে স্থানে আদৌ পুরুষ সমাগম নাই, কেবল রমণী, সে স্থানে যে রমণীরা কোনরূপ শুভ কথা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত

হইবে না, ইহা নিশ্চয়। রমণীগণ যে সাধারণ পুরুষগণগণ্য দোষ-গুণের বিচার ও কোন বিবরণের ত্রুটি ধরিতে সৰ্বিশেষ সক্ষম, ইহা আপামর সকলেই জানেন বলিয়া বোধ হয়। বাজারের স্থানে স্থানে দুই তিন বা তদধিক রমণীগণ একত্রে বলিয়া নির্ভয়ে, অসঙ্কুচিত ভাবে, মনের সুখে যে সাংসারিক ঘটনাবলী বর্ণনা করিবে এবং তৎসঙ্গে রাজ্যের শাসন সম্বন্ধে সমালোচনা ও পুরুষ চরিত্রের আলোচনা করিবে, এ ধারণা নিতান্ত অব্যক্তিক নহে। প্রকৃত পক্ষে “নরোজার” বাজারস্থ রমণীরা রাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় দোষ-গুণাবলী ও স্ব স্ব স্বামী ও আত্মীয়গণের চরিত্র কাহিনী পরস্পরে নির্ভয়ে বর্ণনা করিতেন। কতকগুলি রমণী যদি একত্রে বলিয়া গল্পারম্ভ করেন, তাহা হইলে কথায় কথায় যে নানাক্রম কথ্য আসিয়া পড়ে, ইহাও নিশ্চয় ও তৎসঙ্গে নানা বিষয়ের দোষ-গুণ বিচারও যে হইয়া থাকে, তাহা বোধ হয়, বিশেষ রূপে বলিয়া দিতে হইবে না। রমণীগণের পক্ষে একরূপ হওয়া যে অসম্ভব নহে, তাহা রমণী-চরিত্রের সুন্দরী ব্যক্তি মাঝেই স্বীকার করিবেন; আকবরও একজন সৰ্বিশেষ সুন্দরী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ও যে সাধারণ ব্যক্তিগণ অপেক্ষা এ বিষয় বেশী বুঝিতেন ও জ্ঞান সহজেই হৃদয়ঙ্গম করিতে সক্ষম হইতেন, ইহা বলা বাহুল্য নহে। আকবর রমণীগণের প্রমুখ্যৎ রাজ্যের শাসন সম্বন্ধীয় দোষ-গুণাবলীর স্বাধীন ভাবে সমালোচনা স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিতেন ও তাঁহাদেরই বর্ণিত, তাঁহাদের স্বকর্ণে শ্রুত অজ্ঞাত রাজ-পুরুষগণের চরিত্র সম্বন্ধীয় কথা শুনিয়া মনন চরিত্রে অনেকটা জ্ঞান লাভ করিতেন; ও সেই সেই রাজপুরুষগণকে তাহাদের গুণানুসারে স্তম্ভরূপ প্রয়োজনীয় রাজকাৰ্য্যে নিয়োজিত করিতেন। অতএব ইহা দ্বারা তাহার রাজ্যশাসনে যে অনেকটা সাহায্য হইত ইহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে।

[ক্রমশঃ ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৬ মহারাণী স্বর্ণময়ী C. I. E.

এমন অনেক বৃক্ষ আছে, যে রোপণ করে, সে তাহার ফল ভোগ করিতে পারে না; রোপিত বৃক্ষে হয় ত এক পুরুষ পরে ফল হয়। বৃক্ষ রোপণ করিয়া, বহু করিলে, তাহার পথের বিষ খুচাইয়া দিলে, প্রায় নিষ্ফল হয় না। সেইরূপ মনে বাসনার বীজ রোপণ করিয়া দিলে, সে বাসনা, এজন্মে না হউক, পরজন্মে বা অপর কোন জন্মে তাহার ফল হইবেই হইবে। যে সাধক “ঈশ্বর দেখিব” “ঈশ্বর দেখিব”—করিয়া হৃদয়ে বাসনার বীজ রোপণ করে, তাহার বংশে ঈশ্বরকে নিশ্চয়ই আসিতে হয়। কুদিরাম ষট্টোপাধ্যায় মহাশয় ঈশ্বরকে বলিতেন, “যদি আমার পুত্র হয়, তাহা হইলে যেন তুমিই আমার পুত্র হইও!” এই বাসনার বীজ অকুরিত হইয়া, শেষে ভগবান, রামকৃষ্ণ রূপে তাঁহাব গৃহ আলোকিত করিয়া ছিলেন! সেইরূপ কাশিমবাজারে, কাস্তাবাবু শুভরূপে জগ্নানাম স্মরণ করিয়া, এক মুদীখানার দোকান খুলিয়া ছিলেন। সেই যে তিনি লক্ষ্মীকে স্মরণ করিয়া বসিয়া ছিলেন, প্রাণের সহিত লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়াছিলেন, সেই ডাকাই মা’ লক্ষ্মীর আসন টলিয়াছিল। তিনি স্বর্গ হইতে দরিত্রের দ্রুৎ দূর করিতে ১৮২৭ সালেব অগ্রহায়ণ মাসে বর্দ্ধমান জিলার ভাটাকুল গ্রামে এক দরিত্রের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেন। আমাদের এই মা’ লক্ষ্মীর পিতা মাতা, তাঁহাব নাম দিয়াছিলেন “স্বর্ণময়ী।”

ওদিকে কাস্ত ক্রমেই লক্ষ্মীর উপাসনা করিয়া, মুদীখানার দোকান হইতে বড় আড়ত করিলেন। এই সময় কাস্ত মুদীকে কাস্ত বাবু বা “শ্রীকৃষ্ণকাস্ত নন্দী মহাশয়” বলিয়া লোকে ডাকিতে লাগিল।

যে সময়ের কথা বলা হইতেছে, সে সময় বাঙ্গালার শাসন কর্তা ছিলেন নবাব সিরাজউদ্দৌলা। তখন ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বঙ্গের রাজা হন নাই। তখন ইংরাজেরা ছিলেন কুঠিয়াল। কলিকাতা ছিল কোম্পানির বড় কুঠি, এবং স্থানে স্থানে অনেক শাখা কুঠি ছিল।

কাশিমবাজারে ইংরাজদের যে কুঠি ছিল, এই কুঠির সম্মুখেই কান্ত বাবুর দোকান। কাশিমবাজারের কুঠিতে রেসমের কার্যই বেশী হইত। কুঠির এক জন কর্মচারি সাহেবের নাম ছিল হেষ্টিংস। এই সময়ে নবাবের সঙ্গে ইংরাজদের বিবাদ হয়। শক্রতা ক্রমেই গাঢ় হইয়া উঠিল, এই জন্ত নবাব আদেশ দিলেন ইংরাজ তাড়াইতে হইবে। যত কুঠির উপর কোপ পড়িল। ঘোষণা হইল, 'যে ইংরাজকে আশ্রয় দিবে তাহার সর্ব্বস্ব নবাব সরকার কর্তৃক বাজে-আপ্ত হইবে এবং তাহাবও সবংশে নিপাত হইবে।' অস্ত্রাত্ম কুঠির ভায় কাশিমবাজারের কুঠিরও বিপদ ঘটিল। কুঠির অনেককে প্রাণ দিতে হইল। হেষ্টিংস সাহেব প্রাণ ভয়ে কান্ত বাবুর আশ্রয় লটলে, কান্ত বাবু সাহেবকে অভয় দিয়া নিজের অন্তঃপুরে লুকাইয়া রাখিলেন। তাহার পর সুবিধা ক্রমে সাহেবকে কলিকাতায় পাঠাইয়া দিলেন।

চিরদিন 'কখন সমান যায় না! ওদিকে লর্ড ক্লাইব আসিয়া নবাবের রাজত্ব ছিন্ন ভিন্ন করিলেন। তাহার পর ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে সেই কাশিমবাজারের কুঠিঘাল হেষ্টিংস সাহেব বড় লাট হইয়া কলিকাতায় আসিলেন। তৎপরে তিনি স্বীয় প্রাণ-রক্ষা কর্তী কান্ত বাবুকে নিজের দেওয়ান করিলেন। এই বার কান্ত বাবুর নাম হইল,—দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত।

ইহার পরামর্শে জমিদারী প্রথার সূত্রপাত হয়। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিস চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত চলিত করেন। লর্ড ওয়ারেন হেষ্টিংস মহোদয় কৃষ্ণকান্তকে আজিমগঞ্জ, গাজিপুর জায়গীর দিয়াছিলেন। ১৭৭২ সালে ইনি দেওয়ান হন। ১৪ বৎসর কর্ম করিয়াছিলেন। ১৭৮৬ সালে কার্য পরিত্যাগ করেন। ১৭৮৮ সালে দেওয়ান কৃষ্ণকান্তের মৃত্যু হয়। হেষ্টিংস ইহাকে রাজা করিতে চাহিয়া ছিলেন, কিন্তু হন নাই। তৎপরিবর্তে হেষ্টিংস মহোদয় ইহার পুত্র লোকনাথ নন্দিকে রাজা করিয়া দিলেন।

রাজা লোকনাথ ।—রাজা লোকনাথ পিতার শ্রাদ্ধে বিশদক টাকা খরচ করেন। শ্রাদ্ধোপলক্ষে এত টাকা ব্যয় এ পর্য্যন্ত কেহ

কখন করে নাই। ইহাঁর একটি মাত্র পুত্র ছিল। তাঁহার নাম হরিনাথ। ১৮২০ খৃঃ লর্ড আমহর্স্ট হরিনাথকে রাজা করেন।

রাজা হরিনাথ।—রাজা হরিনাথ হিন্দু কলেজে ২০ হাজার টাকা দান করেন। ইনি খুব দাতা ও লক্ষীর উপাসক ছিলেন। ১৮৩২ সালে ইহাঁর মৃত্যু হয়। ইহার এক মাত্র পুত্র কুমার কৃষ্ণনাথ। কুমার কৃষ্ণনাথকে ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে লর্ড অকলণ্ড রাজা করেন।

রাজা কৃষ্ণনাথ।—এই রাজা কৃষ্ণনাথের গৃহে আমাদের লক্ষীকৃপা মাতা স্বর্ণময়ী আশ্রয় গ্রহণস্বরূপে রাজা কৃষ্ণনাথের সহধর্মিণী হইলেন। রাজা কৃষ্ণনাথ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দে স্বর্ণময়ীকে বিবাহ করেন। রাজা সাবালক হন ১৮৪১ সালে। মৃত্যু ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দে। রাণী স্বর্ণময়ী বিধবা হইলেন, ইহার মধ্যে তাহার ২টা কন্যা হইয়াছিল।

রাজার মৃত্যু সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায় যে, একটা ভৃত্যের অপবাত মৃত্যুর জন্ত মর্শিদাবাদের ডেপুটি চন্দ্রনাথ, তাঁহাকে কোজ-দারিতে ফেলিয়াছিলেন। ইনি যাইলে কিছুই হইত না, কিন্তু তখনকার লোকের আদালতে হাজির হওয়া কিম্বা সাক্ষ্য দেওয়া বড়ই কলঙ্কের কার্য্য বলিয়া ধারণা ছিল। বিশেষতঃ রাজা হইয়া, কি করিয়া সাক্ষীর শ্রেণীতে দাঁড়াইয়া সাক্ষ্য দিবেন!! এই কলঙ্কের ভয়ে তিনি কলিকাতার চিংপুররোডস্থ মাতার ভবনে আসিয়া নিজের পিস্তল দিয়া আত্মহত্যা করেন (১৮৮৪ খ্রীষ্টাব্দে ৩১শে অক্টোবর)। ইহাঁর মাতা হরসুন্দরী এখন জীবিতা আছেন। কানীধামে বাস করিতেছেন।

রাণী স্বর্ণময়ী বিধবা হইয়া স্বামীর বিষয় সহজে হস্তগত করিতে পারেন নাই। গভর্ণমেন্টের সঙ্গে দুইবার এই জন্ত বিবাদ হয়। জাল উইল করিয়া জ্ঞাতি শত্রুরাও মোকদ্দমা করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি মন্ত্রী রাজীবলোচন রায় মহাশয়ের রূপায় সমস্ত কার্য্যে জয়লাভ করিয়াছিলেন। ইনি ১৮৭১ সালে “মহারাণী” উপাধিপ্রাপ্ত

হয়েন। ১৮৭৫ সালে ব্রিটিশ রাজের নিকট কইতে এই সম্মান পাইলেন যে, বংশবংশান্ত্রকমে তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ “মহারাজ” উপাধি পাইবেন। ভারতেশ্বরী ইহাকে “ক্রাউন অব ইণ্ডিয়া” অর্থাৎ ভারত-মুকুট উপাধি দিয়াছিলেন।

বিগত ৭১ বৎসরের মধ্যে এমন কোনও হিতকর কার্যেই দেখা যায় না, বাহাতে তাঁহার সাহায্য গৃহীত হয় নাই। ইনি দ্রবশতী ভগ্নিকেও রীতিমত সাহায্য করিয়াছিলেন। এমন স্কুল কলেজ পত্র-পত্রিকা প্রায় দেখা যায় না, বাহাতে মহারাণীর দান গৃহীত নাই। আমাদের ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র “বীণাপাণি”ও তাঁহার সাহায্য ও উৎসাহ পূর্ণ বাক্যের জন্ত চিরকৃতজ্ঞতাশাশে বদ্ধ বহিল। আজ সেই ৭১ বৎসর ব্যাপী উৎসব ভাঙ্গিয়াছে ; জননী স্বর্গগমনে চলিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতভূমি শোকে কাঁতব হইয়াছে। সমস্ত স্কুল কলেজ একদিন বন্ধ হইয়াছিল।

দারিদ্র্যভুক্তিপীড়িত-দেশে, তৃত্তিক্ষেব সময় মা লক্ষ্মী সরিয়া পড়িলেন। মা গো! আব কিছুদিন থাকিয়া তৃত্তিক্ষ নিবারণ করিয়া পেলো ভাল হইত। আমাদের হৃদয় শোকে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছে। লক্ষ্মী আজ গিয়াছেন, লক্ষ্মীর সব পুত্রেরা এখন অনেকেই আছেন, আশা আছে, তাঁহাদের দ্বারা লক্ষ্মীর স্মৃতি রক্ষা হইবে।

বীণাপানি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণা-পুস্তক-বজ্রিত হস্তে । ভগবতি, ভারতি দেবিনমস্তে ।”

৪র্থ ঋতু । } ভাদ্র, ১৩০৪ সাল । } ৮ম সংখ্যা ।

যৌবন-বাসনা ।

বিগত বসন্তে পুন বাসন্তী বসনে,
হাসি' হাসি' কেন আসি' দাঁড়াইলি পাশে
যৌবন-বাসনা মোর ? কোন্ অভিনায়ে
বচিলি এ ফুল-ফাঁস বাসব-শয়নে ?
কোথা' সে প্রেয়সী তো'ব ? প্রেম-সন্তোষণে
কে তো'বে তেটিবে আজি নিধুবন-বাসে ?
এ চিব বিবহ নিশি-সঞ্চিত পিষাসে
কে মিটা'বে, ওবে মন, মধু ববিষণে ?
থাক' রথা আকিঞ্চন ! যে অমৃত পিয়া
জীব'ছে জগৎ, মিটাইছে অচক্ষণ
অন্তহীন অন্তবেব ক্লধা, অবেষিষা
নেই উৎস, আয় আজি ফিবি মোবা দোহে,
সে নিত্য বাঞ্ছিত ধনে লভয়ে যেকন
জলে না সে কভু আব কামনাব মোহে !

ঈশ্বরোপাসনা ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

তীক্ষ্ণবুদ্ধি নৈমায়িক বলিলেন,—এ জগত্তেব শ্রুতি অমুমেষ ; কাৰণ ইহা ঘটাদিবং কার্য্য। “ক্ষিতিঃ স কর্তৃকা” “কার্য্যস্থানং ঘটাদিবং” (গৌতম সূত্র)। সূত্রবাং নৈমায়িকগুণাবাহমান্ ~~কৃত্যক~~। ~~কিত্যশ্ব~~ বিবাদী সাংখ্যাকাব পাদদৃশমান জিগৎ প্রপঞ্চকে একেবই পবিণাম বলিয়া অদ্বৈত তত্ত্বের সূচনা কবিয়াও যেন দ্বৈত মতকে অলক্ষ্যে আগিস্থন কবিয়া রহিলেন ! যোগ-সূত্র-বাব পতঞ্জলী ঈশ্বরকে যেক্রপে পুৰুষ করুনা করিলেন, তাহা প্রায় বেদান্তের নিগূর্ণ ব্রহ্মেরই অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। সৰ্ব্বোচ্চাধিকারী বৈদান্তিক বলিলেন, এ সৃষ্টিই অধ্যাস। একাদ্বৈত তত্ত্ব মায়াবশতই বজ্জুতে সর্পের ত্রায় জগৎ বিবর্তিত হইতেছে ; ইহা প্রকৃতির পবিণামেব ফল নহে, সূত্রবাং ইহাবা কার্য্য কারণকে অভেদ বলিয়াই স্থির কবিলেন। ইহাবা বলিলেন,—শ্রবণ মনন ও নিবিধ্যাসন দ্বাবা আত্মসংস্থ হইয়া জীব ও ব্রহ্মকে অভেদে দর্শন কবে। দেশকাল ও পাত্রভেদে ইহাবা সকলেই সম্যক উপযোগী হইয়াছিল। সূত্রবাং কোন মতে দোষ দিয়া সমগ্র জগতে এক মত স্থাপনে প্রয়াস পাওয়া সত্য নির্দ্বাবণেব প্রবল অন্তরায় ; কিন্তু পক্ষান্তবে সৰ্ব্বোচ্চাদর্শ সর্বসমক্ষে সংস্থাপন কবিয়া যাহাতে এই বৈবম্য বাজো সমতা স্থাপিত হইতে পাবে, তাহাব প্রয়াস পাওয়াও যে, জগতের কল্যাণকব, সে বিষয়ে আব সন্দেহ নাই।

আমবা দেখিতে পাই, বহুত্বই হুঃখেব কাৰণ। শ্রুতি বলেন, “দ্বিতীয়াং বৈভবং ভবতি”। একত্ববস্থিত মানব সম্বন্ধ শূন্য বা নিবশেবস্তুর নিবপেক্ষী, সূত্রবাং মূখ হুঃখাদি আপেক্ষিক চন্দ্রবিকাবেব সে আশ্রয়ভূমি নহে। এই একত্বরূপ মহাপ্রস্থানে অগ্রসব হইবাব জন্ত পূর্বোল্লিখিত সমস্ত মতগুলিই যেন এক একটা আবশ্যকীয় আলম্বনরূপে বর্তমান রহিয়াছে। যেমন হিমাদ্রিব

ভুঙ্গ শৃঙ্গারোহনোৎসুক পর্যটক ক্রমনিয়ম অধিত্যকাদি অতিক্রম-
নাস্তে গন্তব্য স্থানে উপস্থিত হয়, মানবও তেমনি ক্রমে জড়বাদ
দেহানুবাদ, অজ্ঞেয়বাদ, দ্বৈতবাদ, পরিণাম বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদরূপ
ক্রমোন্নত শৈলাবোহনাস্তে পবিশেষে অদ্বৈততত্ত্বরূপ মহাপ্রস্থান
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এস্থলে একপ এক পূর্বপক্ষ উপস্থাপিত করা
বাইতে পাবে যে, যিনি জড়বাদী, দেহানুবাদী কি পরিণামবাদী
তাহাব পক্ষে সমবসাদ্বৈত তত্ত্বে উপস্থিত হওয়া কিকপে সম্ভব
হইতে পাবে? কাবণ তাহাব সহজাত গুণ ও কর্মাদিই তাহাকে
সসীম জড়বাদে, দেহানুবাদে, কিম্বা পরিণাম বাদে আবদ্ধ করিয়া
রাখে। সূতবাং একতত্ত্বরূপ মহাপ্রস্থান প্রাপ্ত তাহাব পক্ষে নিতান্ত
দুর্ঘট। কিন্তু সিদ্ধান্ত পক্ষে একপ বলা যাইতে পাবে যে, যত্ন
করিলেই বিভিন্ন মতাদিরূপ সীমাবদ্ধ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া আত্ম-
তত্ত্বাচলের গবিষ্ঠ শিখরে আবোহণ করা যায়। সেই যত্নতৎপবতাবই
নামাস্তব—উপাসনা।

উপাসনা কাহাকে বলে, তাহাব আলোচনাস্তব উপাসনাব কন-
ভেদশুলি প্রদর্শন করিতে চেষ্টা করিব।

বেদান্তসাধে লিখিত আছে,—“উপাসনানি সঙ্গুণ ব্রহ্ম-বিষয়ক
মানস ব্যাপ্যরূপাণি শাণ্ডিল্য বিজ্ঞানীনি”—অর্থাৎ সঙ্গুণ ব্রহ্মে
অভিনিবেশরূপ শাণ্ডিল্য বিজ্ঞানীকেই উপাসনা কহে। ছান্দোগ্য
ভাষ্যে শঙ্করস্বামী বলিয়াছেন,—“উপাসনং তু যথা শাস্ত্র সমপিতং
কিঞ্চিদালম্বনমুপদায় তস্মিন সমান চিত্তবৃত্তি সন্তান লক্ষণম্” অর্থাৎ
কোন অধিষ্ঠানে মনে মনে যথাশাস্ত্র ব্রহ্ম কর্ত্তব্য করিয়া তাহাতে
যে চিত্তবৃত্তি বিজ্ঞাস, তাহাব নাম উপাসনা। এইরূপ উপাসনাতে
নিষ্ক্রিয় আত্মাতে কৰ্ত্তাদি কাবক ও ক্রিয়াফল আবোপিত হব;
কিন্তু আত্ম-জ্ঞানে তাহাব নাশ হয়; অদ্বৈতাত্মজ্ঞানে এইরূপ কর্ত্তব্য
নিরাশ হয়। ইহাই উপাসনা ও আত্মজ্ঞানের প্রভেদ। প্রোক্ত-
রূপ উপাসনা দ্বাবা চিত্তশুদ্ধি হয়, অর্থাৎ চিত্তের গুণত্রয়াদিব
প্রাধান্য নষ্ট হইয়া বস্তু-তত্ত্ব প্রকাশ পায়। সূতবাং উপাসনা আত্ম-

জ্ঞান সাধনের একমাত্র স্কন্ধ উপায় । ব্রহ্মসূত্রের চতুর্থ অধ্যায়েব ১ম পাদেব ৭ম সূত্র “আসীনঃ সম্ভবাৎ” সূত্রেব ভাষ্যে শঙ্করস্বামী বলেন,—“উপাসনং নাম সমান প্রত্যয় প্রবাহ কাবণম ।” সমান প্রত্যয় প্রবাহিত কবা—অবিচ্ছেদে ধ্যানান কবা—চিন্তবৃত্তি উত্থাপিত কবাই উপাসনা ।

বেদে উপাসনাব ত্রিবিধ অবাস্তরভেদ আছে । যথা—

(১) অহংগ্রহ (২) তটস্থ ও (৩) অঙ্গনাশ্রিত ।

উপাস্তেব সহিত আপনাব অভেদ বুদ্ধি স্থাপন কবিয়া ভাবনা কবাব নাম “অহংগ্রহ” উপাসনা । প্রত্যেক অহংগ্রহ উপাসনাব ফল অপবোক্ষানুভূতি । শ্রুতিও এই বিজ্ঞাফলের সাক্ষাৎকাবতা দেখাইয়া বলিয়াছেন,—“যন্ত সাদৃদ্ধান চিচিকিৎসান্তি দেবোভূত্বা দেবান স্তোতি”—যাহাব অহংব্রহ্ম, আমিই ব্রহ্ম এতদ্বিধ সাক্ষাৎকার হয়, আমি ব্রহ্ম কি না এ বিষয়ে সন্দেহ না থাকে, তাহাবই প্রাপ্তি হয় । যে জীবিত থাকিতে থাকিতে তত্ত্বাব ভাবিত হওত অভেদ হইয়া যায়, সে দেহ পাতেব পবে পব তদ্ ব্রহ্মভাব প্রাপ্ত হয় । গীতাও “সদাতদ্ধাষ ভাবিতা” বলিয়া শ্রুতিব বাক্যকে অর্থবান্ কবিতেছে । যাবৎ না আসন্ন সাক্ষাৎকাব হয়, তাবৎ সমফলক কোন এক অহংগ্রহ উপাসনা অবলম্বন কবিয়া থাকিতেই হইবে । ব্রহ্ম “আমাব মনোময়” “আমাব প্রাণময়” ইত্যাদিও অহংগ্রহ উপাসনাব অন্তর্গত । এইকপ অহংগ্রহোপাসনা বৈকল্লিক অর্থাৎ নানা হইলেও তাহাদেব ফল অবশিষ্ট “বিকল্পেহবিশিষ্ট ফলত্বাৎ” ৩৩৫৯ (বেদান্ত সূত্র) । এই উপাসনাব পক্ষ সমর্থনোপক্ষে নিম্নলিখিত শ্রুতি স্মৃতি বাক্য উদ্ধৃত কবা যাইতে পারে “আত্মৈপোপাসীত” । “তমেবৈকং জ্ঞানথ আত্মানমগ্ৰাবাবো বিমুক্তথ” । “আত্ম বেদং নিত্যমুপাসনং স্ত্রাং নাগ্ৰাং কিঞ্চিং সমুপাসীত” । আসন্ন ভিন্ন আব কিছুই উপাস্ত্র নাই ।

(২) তটস্থোপসনাকে প্রতীকোপাসনাও বলা হয় । কোন প্রতীকে অর্থাৎ বহিরালম্বনে ঈশ্বর বুদ্ধি স্থাপন করিয়া উপাসনা করার নাম

তটস্থোপাসনা। সূর্য্যে, বায়ুতে, বকণে কিম্বা নামে ব্রহ্ম-বুদ্ধি স্থাপন করিয়া যে উপাসনা করা হয়, তাহা এই উপাসনার অন্তর্গত। এই প্রতীকোপাসনা হইতেই অবাস্তব ভেদে অস্বদেশে মূর্ত্তি পূজাৰ্থ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল।

প্রতীকানুসারে ইহার ফল ভিন্ন ভিন্ন।

(৩) যজ্ঞাঙ্গ ও উদগীথ প্রভৃতি অঙ্গে যে সকল উপাসনা নির্দিষ্ট আছে, তাহাই অঙ্গাশ্রিতোপাসনা। যেমন “ঐ ইতং পবমুদগীথ-মুপসিত।” “ঐ” এই অক্ষরকে উদগীথ জ্ঞানে উপাসনা করিবেক, অথবা যজ্ঞকালে “ইন্দ্রাব স্বাস্থ” “হোতাভ্যম” বলিয়াই ইন্দ্র এবং ওঙ্কারেব ধ্যান করিবার নিয়ম আছে। স্মৃতবাং এ উপাসনা যজ্ঞেবই অঙ্গ বিশেষ। “অঙ্গেষু অর্থ্যশ্রয় ভাবঃ” ৩।৩।৬১ (বেদান্ত সূত্র)। এবং যজ্ঞাঙ্গ বলিয়া কামনা অনুসারে ফল প্রদান কবে মাত্র।

পূর্বেই বলা হইয়াছে, গুণভেদেও অধিকারিভেদে উপাসনাও বিভিন্নরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। বহু জন্মার্জিত পুণ্য ফলে বাম-দেবাদি ঋষির গ্রায সঙ্কৃত শ্রবণ মাত্রেই যাহাদেব আত্মজ্ঞান উপস্থিত হয়, তাহাদেব উপাস্তাই কি, আর উপাসনাই বা বাব ? তন্নিম্নাধিকারী শুদ্ধসত্ত্ব মুমুক্শুগণই অহংগ্রহ উপাসনার একমাত্র অধিকারী। আপনাতে ব্রহ্ম বুদ্ধি স্থাপন করিয়া পুনঃ পুনঃ শ্রবণ মনন ও নিধিধ্যাসন দ্বারা পরিশেষে তাহার আত্মসাক্ষাৎকারে কৃতপ্রযত্ন হয়। এই উপাসক সম্প্রদায়ের নিম্নস্তবে তটস্থ উপাসনার নির্দেশ আছে।

যাহাবা গুণ বৈষম্য বশতঃ আপনাতে ধর্ম্মবুদ্ধি উৎপাদনে অসমর্থ, জননীৰ গ্রায পবম হিতৈষিণী শ্রুতি কোন প্রতিকাবলম্বনের জন্ত তাহাদিগকে পুনঃ পুনঃ উপদেশ করিতেছেন। যে আলম্বনে যাহাব অভিকচি হয়, ঈশ্বরজ্ঞানে তাহাব উপাসনা করিলেই ঈশ্বর প্রাপ্তি হইবে। এই জন্ত কেহ সূর্য্যে, কেহ প্রাণে, কেহ ওঙ্কারে, কেহ বকণে, কেহ বা তদপেক্ষা স্থূল পদার্থ শিলা ও প্রতিমাদিতে উপাসনা তৎপর হইয়াছে। সকল হইয়া কোন বিশেষ ফল প্রাপ্তি

জগুই যজ্ঞোপাসনা উদাহৃত হইয়াছে । এই উপাসনায় কামনা-
রূপ ফল প্রদান করে ।

মহাত্ম্যবতেব অনুশাসন পর্কে লিখিত আছে,—“ধর্ম্যং জিজ্ঞাস-
মানানাং প্রমাণং পবমং শ্রুতিঃ । দ্বিতীয়ং ধর্ম্মশাস্ত্রস্ত তৃতীয়ং লোক
সংগ্রহঃ ।” ধর্ম্ম জানিবাব পবম প্রমাণ শ্রুতি, দ্বিতীয় প্রমাণ স্মৃতি
এবং কৌলিক ও লৌকিকাচারই তাহাব তৃতীয় প্রমাণ । যে শ্রুতি
ধর্ম্মে অদ্বিতীয় প্রমাণ, তাহা অধিকাবী ভেদে ক্রমে জ্ঞানোন্মেষণ
জন্তু কর্ম্ম, উপাসনা ও জ্ঞানকাণ্ডে বিভক্ত হইয়াছে । যাহারা নিতান্ত
তমঃপ্রবল, সংসার ত্রিতাপে পবিক্লিষ্টমনা, তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ কর্ম্ম
তৎপর কবাই হিতৈষিনী শ্রুতির কর্ম্মাধ্যায়েব প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া
মনে হয় । তবঙ্গায়িত ত্রিতাপেব প্রবলাঘাতে যাহারা নিবতিশয়
বিতাড়িত হইতেছে, তাহাদিগকে যদি স্থায়ী সুখেব আবাস স্বরূপ
কোন স্থানের আভাস দেওয়া যায়, এবং তল্লাভার্থ যজ্ঞাদিরূপ
কর্ম্মে তৎপর হইতে উপদেশ কবা যায়, তখন তাহারা সহজেই
উক্তরূপ কর্ম্মাদিতে লিপ্ত হয়, কাবণ অণবচ্ছিন্ন সুখ প্রাপ্তিই
তাহাদেব পবম পুরুষার্থ । তাই শ্রুতি কর্ম্মাধ্যায়ে বলিতেছে, “শতান্ব
মেধযাজী ইন্দ্রোভবেৎ”, “অশ্বমেধেন স্বর্গ কাম যজ্ঞেত”—শতান্বমেধ
দ্বাবা ইন্দ্রস্ত লাভ হয়, অশ্বমেধ যজ্ঞে স্বর্গ প্রাপ্তি হয় । বিবেকী
মানবেব উক্তবিধ স্বর্গাদিসুখ অস্পৃহনীয় হইলেও অবিবেকীব পক্ষে
উহাদেব বিস্তর প্রয়োজনীয়তা দৃষ্ট হয় । যাহাবা ধাবণাক্রম, তাহা-
দেব নিকট হঠাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানোপদেশ সাবসসমীপে যুক্তা ছড়ানেব
শ্রায় নিষ্ফল হয় । “অজ্ঞস্তার্ক প্রবুদ্ধস্ত সর্বং ব্রহ্মেতি যোবদেৎ ।
মহানিবয় জালেষু স তেন বিনিযোজীতঃ ॥” অর্দ্ধপ্রবুদ্ধ অজ্ঞেযেব
নিকট সবই ব্রহ্ম বলিলে তাহাকে মহানিবয় পতিত কবা হয় মাত্র ।
সেই কাবণে তমঃপ্রবল মানবদিগকে ক্রমে ক্রমে ধাবণাশীল কবি-
বাব জগুই শ্রুতি ১ম কর্ম্মাধ্যায়েব অবতাবণা কবিয়াছেন । শ্রুতি
বলিলেন, কর্ম্মেব ফল শীঘ্র পাইবে; সুতরাং স্বর্গাদি সুখেব জন্তু
কর্ম্মে প্রবৃত্ত হও । শ্রুতিপথানুগামিনী স্মৃতিও বলিতেছেন,—

“কাজাতঃ কৰ্ম্মণাং সিদ্ধিং যজন্ত ইহ দেবতাঃ। কিপ্রাংহি মানুষে
লোকে সিদ্ধির্ভবতি কৰ্ম্মজা।” অর্থাৎ ইহলোকে কৰ্ম্মজনিত ফল
শীঘ্র উৎপন্ন হয় বলিয়াই, লোকসমূহ ইন্দ্রাদি দেবতার পূজা করিয়া
থাকে। ঐহিক ও পারত্রিক ক্ষণস্থায়ী সুখে বিমুখ মানবগণ ধবা-
ধামে অতি বিরল বলিয়াই বেদের কন্ম বাণ্ড, জৈমিনির সময়ে
মুখ্য ধর্ম্মজনক কন্ম বলিয়া বিশেষ আদবণীয় হইয়াছিল। মহা-
জড়ভাবাপন্ন মানবদিগকে কৰ্ম্মাদিকাবে উৎসাহিত করিয়া যখন তাহা-
দিগকে সকাম কৰ্ম্মপবায়ণ করা হইল, জননীৰ ভ্রায় হিতৈষিণী শ্রুতি
উপাসনারূপ দ্বিতীয় কাণ্ডের অব্যবহিত পূর্বেই তাহাদিগকে বলিতে-
ছেন, সাবহিত ইহীয়া কৰ্ম্ম করিও, নতুবা তোমার দুঃখ প্রাপ্তি
অবশ্যজ্ঞাবী। অনবহিত প্রমত্ত রাজাদিগের নবকাদি ভোগ তাহা-
দিগকে প্রমাণরূপে প্রদর্শন করিলেন। স্মৃতি ও শ্রুতির কথা অল্প-
সবণ করিয়া বলিলেন, “অর্থহীনে দহেদ্রাষ্ট্রং মন্ত্রহীনে তথাষ্ডিজং।
আত্মানাং দক্ষিণাহীনে নাপ্তি যজ্ঞো সমরিপুঃ॥” (তিথিতত্ত্ব)
অর্থহীন যাগাদি কন্মে রাজ্য দগ্ধ হয়, মন্ত্রহীনে ঋত্বিককে দগ্ধ
কবে। দক্ষিণা শূন্য যজ্ঞ আত্ম হননকারী হয়। সংপ্রতি কৰ্ম্মনিরত
লোকদিগকে শ্রুতি আবণ্ড বলিতেছেন, যদিও কৰ্ম্মকাণ্ড-কথিত
যাগযজ্ঞাদি দ্বাবা স্বর্গাদি সুখ লাভ হয় বটে, কিন্তু ভোগান্তে
পুনবায় সংসাবে জন্মগ্রহণ করিয়া পূর্বাত্মরূপ সুখ দুঃখের আশ্রয়ভূত
হইতে হয়। মানবগণ কন্মতৎপবতা বশতঃ স্বাভাবিকী জড়তা
অপনয়ন করিয়াছে, স্মৃতবাং তাহাব সম্মুখে অগ্রসব হওয়া ভিন্ন
পশ্চাদ্পদ হইবাব আর উপায়ান্তব নাই। তখন কন্মতৎপব মানবের
মনে স্বতঃই এই প্রশ্ন উদ্ভিত হয়, যে নিরবচ্ছিন্ন সুখের লালসায়
যাগযজ্ঞাদি কন্মতৎপব হওয়া গেল, তাহাব কল দীর্ঘকাল ভোগ্য
হইলেও অনন্তকালের জন্ত নয। এং কৰ্ম্মাদির অসম্পূর্ণতায় নানা-
বিধ পাতকেব সঞ্চয় হইয়া মহা দুঃখকব হইয়া থাকে। অতএব
কি উপায়ে নিরবচ্ছিন্ন সুখ হইতে পাবে, ইহাই তাহার জিজ্ঞাস্য
হয। কৰ্ম্মলব্ধ ভোগ ও ত্রৈবর্ষ্য বিষয়ে অনভিনিবিষ্ট মানবগণ যখন

কৰ্মকাণ্ডের একপ দোষ দর্শন করিতেছেন, তখনই ঐক্যার্থ সমন্বয়-কাবিনী গীতা, কৰ্মাধ্যায়ে বেদান্ত কন্মের স্বরূপ বুঝাইয়া জীবকপী অৰ্জুনকে বলিতেছেন, “ওস্তাদশক্ৰঃ সততং কার্যং কৰ্ম সমাচাৰ । অসক্তো হ্যচরণ কৰ্ম পবমাপ্নোতি পুৰুষঃ” (৪।১২) । কৰ্ম-ফলে কামনা বর্জিত হইয়া বেদান্ত কৰ্মানুষ্ঠান কব । ফলাকাঙ্ক্ষা বর্জিত কৰ্ম করিলেই নিববচ্ছিন্ন সুখ বা মুক্তি লাভ হয় । কিন্তু নিত্য অতএব অবশ্যানুষ্ঠেয় কৰ্মাদি পবম্পবা সম্বন্ধে মোক্ষেবই কাবণ হব, যেহেতু কাম্য কৰ্মজনিত পাপ পুণ্যেব ত্রায সে সকল কন্মে পুণ্য পাপাদিব সঞ্চয় হয় না । “অগ্নি হোত্রাদি তু তৎকার্য্যাবৈব তদ্রশনাং ।” (৪।১।১৬) সূত্রেই তাহাব প্রমাণ প্রাপ্ত হওয়া যায় ।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশরচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ।

মহিলা-মেলা ।

[পূৰ্ব্ব-প্রকাশিতের পব ।]

মানবচবিত্রে জ্ঞানলাভ ও বাজ্য-শাসনে সাহায্য পাইবাব নিমিত্ত একপ উপায় অবলম্বন কবিবাব দৃষ্টান্ত ইতিহাসে অতীব বিবদ হইলেও, ইহা আকববেব মহত্ব ও উদাবতাব পরিচয় নহে । মানবচবিত্রে জ্ঞানলাভ ও রাজ্য শাসনে সাহায্য পাইবাব নিমিত্ত, তিনি ইচ্ছা কবিলে অত্র উপায় অবলম্বন কবিতো পাবিতেন, বিশেষতঃ তাঁহাব ত্রায বিচক্ষণ ও সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিকে এ উদ্দেশ্য সিদ্ধিব উপায় স্থির কবিতো সবিশেষ বষ্টও পাইতে হইত না ; কিন্তু তথাপি তাঁহাব সে পথ অবলম্বন না কবিয়া, বিশ্বাসঘাতকতা কবতঃ এ পথ অবলম্বন কবিবার কাবণ এই যে, বেকপে হটুক হিন্দুজাতিব অন্তঃপুবে হস্তক্ষেপ কবিয়া, চিবকালেব নিমিত্ত তাঁহা-দিগকে স্ববশে বাথেন । তিনি ইহা সবিশেষ জ্ঞাত ছিলেন যে, রাজ-ভক্ত হিন্দুজাতিকে পদানত করিয়া রাখিতে পাবিলে ও তাঁহা-

দের সহিত বন্ধুত্ব ও কুটুম্বিতা স্ত্রে আবদ্ধ থাকিলে তাঁহাব
সবিশেষ মঙ্গল হইবে। বাস্তবিক যে তাহা করিয়াছিলেন, ইহা
ইতিহাস পাঠকের নিকট অবিস্মৃত নাই। আকবরসাহ হিন্দু নর-
পতিগণের সহিত কুটুম্বিতা স্ত্রে আবদ্ধ হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন
বলিয়াই, “খোসবোজ” তাঁহাব স্বন্দর্শীতাব পরিচয় স্থল হইয়া
দাঁড়াইয়াছে। তৃতীয়তঃ, যখন “নোরোজার” রাজ্যে সম্রাট আকবর-
সাহ মনেব উল্লাসে ছদ্মবেশ ধারণ কবিয়া এইরূপভাবে পবিত্রমণ
কবিত্তেছিলেন, তখন একটা গম্ভীর-প্রকৃতি-সম্পন্ন, পবনরূপবতী,
যুবতী রাজপুত বমণী, তাঁহাব মনপথেব পথিকা হইলেন। সম্রাট
কিয়ৎক্ষণ এই বমণীর প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ কবিলে ব্রহ্মিতে পাবি-
লেন যে, ইনি নিশ্চয়ই কোন তেজস্বী রাজপুত-কুল-সম্ভূতা। এই
রমণী বাঠোব-কুল-চুডামণি পৃথীবাজের বনিতা ও মিবারের প্রসিদ্ধ
শক্তাচং বংশেব স্থাপয়িতার ছুহিতা। এই বমণী “মহিলা-মেলাব”
ধীর পাদবিক্ষেপে নানা দোকান পবিত্রদর্শন কবিয়া বেড়াইতেছেন।
ইনি উক্ত শিল্প-দ্রব্যাদিব সৌন্দর্য্য অবলোকন কবিয়া বিশেষ আক্লান্দিত
হইলেন বটে, কিন্তু ক্রয়-বিক্রয়কাবিনী বমণীগণকে শীলতা ও লজ্জাব সীমা
অতিক্রম কবিত্তে দেখিয়া বড়ই দুঃখিতা হইলেন। তাঁহাব এই
মানসিক ভাবেব বৈলক্ষণ্য উপস্থিত হওয়াতে তাঁহার প্রতিক্রতিবও
সবিশেষ পবিত্রবর্তন প্রকাশ হইল। সম্রাট তাঁহাব এই পবিত্রবর্তন
দেখিয়া অতীব বিস্ময়ান্বিত হইলেন, কিন্তু তাঁহাব এতাদৃশ অকস্মাৎ
পবিত্রবর্তনেব কাবণ স্থির কবিত্তে সক্ষম হইলেন না। এই বীৰঙ্গনা
“মিবার ছুহিতা” (Daughter of Mewar) * এই জঘন্য স্থানে অধিক-
ক্ষণ থাকিত্তে অনিচ্ছুক হইয়া তদুপেই সেই স্থান পবিত্র্যাগ
করিত্তে উত্ততা হইলেন। লজ্জাই বমণীগণেব স্বর্গীয় সৌন্দর্য্য,
যেখানে সেই লজ্জার অপব্যবহাব, সে স্থানে কি তেজস্বিনী, শীলতা-
ময়ী, লজ্জাশীলা বমণী থাকিত্তে পাবেন? সে স্থান যে তাঁহার
নিকট প্রকৃত নবক বলিয়া বোধ হইবে, সে বিষয়ে সন্দেহ কি?

তেজস্বিনী রাজপুত বমণীর প্রতি সম্রাট এতক্ষণ অনিমিষলোচনে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার ক্ষয় ও প্রাণ তাঁহাতেই সমাকৃষ্ট। তাঁহাকে গমনে উত্ততা দেখিয়া সম্রাটও বিচলিত হইলেন, এবং বাহাতে তিনি বাজ-প্রাসাদের বহির্ভাগে গমন না কবেন, তাহার উপায় বিধানে বদ্ধপরিকর হইলেন।

“লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু”—এ কথাটি কাহারও অবদিত নাই; এ কথাটি যে কতদূর সত্য তাহার উদাহরণ অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। আকবরসাহেব চবিত্রেও নিম্নলিখিত ঘটনায় এ কথাটির যথার্থতা সম্পূর্ণভাবে প্রতীকমান হইবে। সম্রাট আকবর এই বমণীর লাত কবিরাব নিমিত্ত সচেষ্ট হইলেন। সম্রাটের এই লোভের সঙ্গে সঙ্গেই পাপ চিন্তা উদিত হইল। কিরূপে এই বমণীর সতীত্ব-বল্ল হরণ করিবেন, কিরূপে তাহার মধুমাখা প্রিযবাক্য শ্রবণ করিয়া নিজের পাশব প্রবৃত্তি চবিতার্থ করিবেন, সেই সুযোগের অনুসন্ধান কবিত্তে প্রবৃত্ত হইলেন। এই বাজপুত বমণী যে কতদূর তেজস্বিনী তিনি এখনও জানিতে পাবেন নাই, তাই তিনি এই পাপ কন্ডে অগ্রসর হইলেন। তিনি এ বমণীর তেজ-স্বিতাব অতি অল্পমাত্র আভাস পাইলেও পাশবিক বৃত্তির প্রবলতার আশ্বহাবা হইয়া পড়িলেন। অতএব অগ্র-পশ্চাৎ চিন্তা না কবিয়া, সম্রাট উন্মাদেব হ্রাষ পাশবিক বৃত্তি চবিতার্থ কবণার্থ সচেষ্ট হইলেন। অহো! যেহেতু চন্দ্রেও কলঙ্ক, গোলাপেও কণ্টক, সেই জন্ত এ হেন উদাবচেতা, স্ফুদ্রদর্শী, মহানুভব নববাজেরও চবিত্র কলঙ্কিত। পাশবিক বৃত্তির কি অসাধারণ ক্ষমতা। এ হেন পরম বিজ্ঞ সুবিচক্ষণ ব্যক্তিকেও অগ্র-পশ্চাৎ বিবেচনা কবিরাব অবসর না দিয়া আশ্বহাবা কবিয়া ফেলে।

যখন এই বমণী “নৌবোজাব” বাজাব হইতে বহির্গত হইবার জন্ত উন্মোহন কবিত্তেছিলেন, কিন্তু বহির্গমনের পথ বড়ই জটীল দেখিয়া ইতস্ততঃ কবিত্তেছেন, এমন সময়ে ভাবতের একচ্ছত্র নৃপতি আকবরকে তাহার গতিবোধ করিয়া পথে দণ্ডায়মান দেখিতে

পাইলেন। সহসা সম্রাটকে এরূপ ভাবে দেখিয়া তাঁহার মনে
 যুগপৎ ভয় ও বিস্ময়ের উদয় হইল। তখন তেজস্বিনী বাজপুত রমণী
 বুঝিলেন যে, সম্রাট তাহার রূপে মুগ্ধ হইয়া ছরভিসন্ধি প্রযুক্ত
 তাঁহার গতিবোধ কবিষাছেন, তখন তিনি নিতান্ত ত্রিষমাণা হইয়া
 মনে মনে চিন্তা কবিত্তে লাগিলেন যে, “এস্থলে—এ নরকে তাঁহার
 আগমন অন্ত্যায় হইয়াছে।” যাহা হউক, উপস্থিত ষোবতর বিপদ
 হইতে উদ্ধাব পাইবার নিমিত্ত তিনিও বদ্ধপবিকবা হইলেন। তখন
 রমণী কয়েক পদ অগ্রসব হইয়া গম্ভীর স্ববে সম্রাটকে দ্বার ত্যাগ
 কবিত্তে অনুরোধ কবিলেন, দিল্লীশ্ববকে অসময়ে অতর্কিত ভাবে
 সম্মুখে দেখিয়া কিছুমাত্র ভীতা হইলেন না। তাঁহাকে দ্বার
 ত্যাগ না কবিত্তে দেখিয়া ক্রোধে বমণীব নয়নদ্বয় হইতে অগ্নিক্ষুজিত
 বহির্গত হইতে লাগিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে কে যেন তাঁহার কর্ণে
 বলিয়া দিল,—“মা ভৈঃ—মা ভৈঃ—।” যেন এই আশ্বাসবাণী কর্ণ-
 কূহবে প্রবেশ কবিবামাত্র তিনি দ্বিগুণ উৎসাহে উৎসাহিত হইয়া
 উঠিলেন, এবং এক অনির্বচনীয় মহাশক্তি প্রভাবে আশ্ব-সম্মান
 বক্ষার্থ সচেষ্ঠা হইলেন। যেন মিবাবেব অধিষ্ঠাত্রী দেবী বিশ্বজননী
 ভগবতী (“মাতা”) ঋগেশবাহিনী হইয়া তাঁহার সম্মুখে আবিস্ভূতা
 হইলেন। দেখিতে দেখিতে সেই তেজস্বিনী রমণী স্বীয় অঙ্গাববণ
 হইতে স্ত্রীকৃত্ত তববাবি বাজিব কবিয়া সম্রাটের বক্ষোপরি ধাবণ
 করিলেন, যেন “মাতাব” ইঙ্গিতে তিনি নব-পিশাচকে সমুচিত শাস্তি
 বিধান কবিত্তে অগ্রসবা হইলেন। তখন বমণী সেই নিদাকণ
 অস্ত্র হস্তে ধাবণ কবিয়া, সম্রাটকে গম্ভীর স্ববে বলিলেন ;—“বে
 নবোধম। তুই স্লেচ্ছ হইয়া পবিত্র ক্ষত্রিয়-কুল কলঙ্কিত কবিত্তে
 উত্তম হইয়াছিস্? তোব ত্রায় নবোধমেব এই অস্ত্র দ্বারা সমুচিত
 শাস্তি হওয়া কর্তব্য।” সম্রাট সেই বমণীব এবদ্বিধ বাক্য
 শ্রবণ ও সেই ভীষণ ভৈববীমূর্ত্তি দেখিয়া ভয়বিহ্বলচিত্তে দশদিক
 অঙ্গকাব দেখিতে লাগিলেন। সম্রাট স্বপ্নেও ভাবেন নাই যে, যে
 ললনাব সৌন্দর্য্যে ও লাবণ্যে তিনি বিমোহিত, ঐহার মাধুর্য্যময়ী

মূর্ত্তি দেখিয়া তিনি আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন, এই ভীষণ ভৈরবী মূর্ত্তি সেই রমণীবই অন্তঃস্তম্ভে লুপ্তায়িত ছিল! সামান্য নারীজ্ঞানে যাহাব উপর অত্যাচার কবিত্তে প্রয়াস পাইয়াছিলেন, সেই নারীই এখন আশ্চর্য্যসম্মান রক্ষার্থ তাঁহাব বক্ষঃস্থলে নিদাক্ষণ অস্ত্র ধারণ কবিয়া তাঁহাকেই সমুচিত শাস্তি বিধানে উদ্বৃত্তা। সম্রাট আকবর সেই রমণীব ভীষণ মূর্ত্তি অবলোকন করিয়া নিম্পন্দ ভাবে কিষ্কণ্ণ স্থিব হইয়া বহিলেন; পবে সেই রমণীব নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কবিলে রমণী তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন। সম্রাটও আব কোন ক্রোধলতা বা ঔদ্ধত্য পবিচয় না দিয়া মনে মনে রমণীকে তাঁহার তেজস্বিতা ও বীবহের নিমিত্ত প্রশংসা কবিত্তে লাগিলেন। আকবরসাহ বীরপুরুষ, তিনিও বীবের সম্মান জানিতেন, তাই তিনি সেই বীরাসিনাকে প্রভূত সম্মান সহকাৰে বিদায় দিলেন। সতী বাজপুত রমণীও সম্মানে স্বস্থানে প্রত্যাগত হইলেন। পরে যথাসমবে সম্রাটের সাধেব আনন্দ বাজাব তান্ধিয়া গেল।

আকবর! তুমি না ভাবত্বেব একচ্ছত্র নৃপতি? তুমি না ভাবত্বেব ঘোবতব ছদ্মিনে স্নেহেব সঞ্চাব কবিয়াছিলে? তোমার গুণে হিন্দুজাতি মুগ্ধ, তবে কেন এ হেন অসং কৰ্ম্ম-জনিত কলঙ্ক ও দুৰ্নাম চিবকালই বিজ্ঞমান থাকিবে? তুমি এ হেন স্নেহশাল ভাবত সাম্রাজ্যকে শাসন ববিয়া অনন্ত যশোবাশি লাভ কবিয়া গিয়াছ, কিন্তু স্থিবচিত্তে একবাব ভাবিলে না যে, কি কুকৰ্ম্মই কবিত্বেছ? তুমি যে এতদূব কাওজ্ঞান শূন্য পশু বিশেষ এ চিন্তা রাজভক্ত হিন্দুর মানসে স্থান পায় না। তুমি কি এতদূব ধৈর্য্য-বিহীন অপদার্থ যে, সামান্য স্নেহেব নিমিত্ত স্বীব অনন্ত যশোবাশিকে কলঙ্কিত কবিবে? “লোভে পাপ, পাপে মৃত্যু” এই বাক্যটীব মৰ্ম্ম যে তোমার ত্রায় স্নেহজ্ঞ, বিচক্ষণ, সমদৰ্শী, উদাবচেতা, ধাৰ্ম্মিক নরপতির অগোচব ছিল, তাহা মনে হয় না। তবে কেন স্নেহচায় শমনকে আহ্বান কবিত্তে অগ্রসব হইলে? তুমি কি এতাদৃশ অদূবদৰ্শী?—না তাহাও নহে; ইহা নিশ্চয়ই তোমাব দুৰ্ব্বলতা

অলস প্রমাণ । যে ব্যক্তি স্বীয় চরিত্রের উন্নতি সাধনে সমর্থ
নহেন, যে ব্যক্তি পাশবিক বৃত্তির চরিতার্থ আত্মহারা হয়, যে
ব্যক্তি স্বীয় দুর্ভাগ্যকে সিদ্ধ কবির নিমিত্ত আয়ের মস্তকে পদা-
ঘাত করিতে কুণ্ঠিত হয় না, সেকণ অসচ্ছবিত্ত ব্যক্তির স্বহস্তে
রাজ্য-শাসনেব ভার লওয়া কোনমতে যুক্তি-সিদ্ধ নহে । আকবর !
তোমাব সাধের “খাসরোজ” সমস্ত বাজতবর্গ তোমায় বিশ্বাস ও
শ্রদ্ধা করিয়াই স্বীয় অন্তঃপুংস্ব ললনাগণকে প্রেরণ করিতেন ;
কিন্তু তুমি যে এতাদৃশ পাশবিক প্রকৃতিব লোক, ইহা বোধ হয়,
সকলেরই অগোচর ছিল ; কারণ তাহা হইলে তোমার “খোস-
বোজ” স্থাপন করা অকঠিন হইত । তোমাব এতাদৃশ হীন-চরিত্র
হিন্দুব গোচরীভূত হইলে, তাঁহাবা কখনই তোমার জন্ত প্রাণ
বিসর্জন কবিতেন না, বরং তোমাব উচ্ছেদ সাধনেই যত্নবান হইতেন ;
তাহা হইলে তোমাব উন্নতি সুদূরপরাহত হইত—ভাবতে স্নোগল-
সাম্রাজ্য সুদৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইত কিনা সন্দেহ । হিন্দুজাতি তোমাব
জন্ত যত কষ্ট স্বীকার করিয়াছেন, ততকষ্ট কেহ কখনও বিধর্মী রাজাব
জন্ত করেন নাই । হিন্দুবাজ মানসিংহেব জন্তই তোমার রাজ্যের বিস্তৃতি
সাধিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্তই তুমি শত শত্রু জয় করিয়া নিকটকে
বাজ্য সুখভোগ কবিয়াছ ; হিন্দু তোডবমন্সেব জন্তই তোমার রাজ্যে
শৃঙ্খলা স্থাপিত হইয়াছিল, হিন্দুব বলে বলীমান হইয়াই তুমি ভারতে
অবিতীয় নৃপতি হইলে, হিন্দুর জন্ত আজিও তুমি প্রাতঃ স্মরণীয় ।
ধিক্ আকবর ! তোমার ধিক্ ; তুমি সেই হিন্দুব বংশগবিমার কলঙ্ক
বোপন করিতে উত্তত হইয়াছিলে ? যাহাবা তোমায় বিশ্বাস করিতেন,
যাহারা তোমায় শ্রদ্ধার সহিত পূজা কবিতেন, তুমি তাহাদিগেব উপকার
ভুলিয়া স্ত্রীর ও ধর্ম্মের মস্তকে পদাঘাত কবিতো কিছুমাত্র সঙ্কচিত হইলে
না ? বাজভক্ত হিন্দুব মঙ্গলবাচ কবিয়া যে কলঙ্ক কিনিয়া গেলে, তাহা
অতীত সাক্ষী ইতিহাস চিরকাল জগতের সম্মুখে সাক্ষ্য প্রদান কবিবে ।

শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ।

বিদায়ের প্রসঙ্গে ।

এসেছ বিদায় নিতে,
 আনায়ে ফিরা'য়ে দিতে
 কাটা তুলে চলে যেতে চাও ।
 কেন তবে আস হেথা,
 ব্যথা—মনে পড়ে ব্যথা,
 চলে যাবে!—ভুলে যেতে দাও ।
 বুঝাতে এসেছ আজি,
 শশাঙ্ক বাদলে ভিজি,
 মাখে নাক মেঘের বরণ,
 দেখা'তে এসেছ আজি,
 বরণ! প্রণয়ে মজি',
 ছোঁব নাক প্রেমের বেদন!
 শুধু হুটো "আসি" কথা,
 এতে কি সাবিলে ব্যথা,
 ভাঙা কি ঋতিরে জুড়ে যার?
 এ বল, না বুঝিবে কে,
 কেন আছ নত মুখে?
 প্রেম গেলে, প্রেম-অভিনয় ।
 আজি হে অকালে হেন,
 অদৃষ্টে জাগান কেন?
 চলে যাবে!—কব নাহি টলে!
 যে ক'দিন বাকী আছে,
 কেন তা'রে ডাক কাছে,
 বাজ সহে—বাজ পড়ে গেলে ।
 শুধু—"কব"-অভিশাপ,
 দেবেন জ্বের তাপ,

মরণের দুর্ভানা তাপদ,
 তা'ই বুঝি গালে গালে,
 কুসুম কোমুদী স্তলে,
 মায়া ঢাকে বরণ অবশ!
 জীবন বাসরে তা'ই,
 মরণে ভুলিয়ে যাই,
 মৃত্যু তাই তাবাহীন হলো!
 দূরে যাক—দূরে যা' তা',
 ছেড়ে দাও "যা'ব" কথা,
 যেতে হ'লে,—গিয়ে বলা ভাল ।
 আমি না ডাকিব পিছু,
 আমি না বলিব কিছু,
 স্বর্গ, মর্ত্য, হোক ব্যবধান!
 তোমার আসন হেথা,
 ঢাকিতে—অঁধাব কোথা,
 ভালবেসে,—বড় হয় প্রাণ!
 আলো হেথা চিরজীবী,
 মুছে নাক কোন ছবি,
 বৃদ্ধে খুজে শৈশব-আগার,
 তারা খসে অন্ধকারে,
 শূন্যতা নাহিক সারে,
 হাঁহ! করে আছড় অঁধার!
 এই—যন বন ভূমি,
 ছায়াব্রূপে রবে ভূমি,
 স্মৃতিময়ী—প্রতিমা—আমার ।
 গত-দিন ভুলে যেও,

নূতনে নূতন হয়ো,
 জীবন ত--স্বরণের হার !
 অঁধার তরঙ্গ রোলে,
 ধরণী রয়েছে ঝুলে,
 জ্যোতির্ধর—মিলন—প্রলয় !
 আমরা ধরায় থাকি,
 সে গুণ হৃদয়ে রাখি,
 শূন্যে ঝোলা—জন্ম পরিচয় ।
 হয়েছে “বিজয়া” রাখা,
 আর কেন হেথা থাকি,
 নাবি বা রাখিতে চোখে জল !
 অর্কাদারে ভোলা যায়,
 সুখ শেষে প্রেত হয়,
 ক্লম-প্রেম - অঁধি-ছল-ছল !
 কি দিব পাথেষ ভাবি,
 জন্মজন্মান্তর সবই—

কিরে গেছে ও চরণ—চুমি’,
 জীবনের মোক্ষ লয়ো,
 ইন্দিবা বৈকুণ্ঠে রয়ো,
 কণ্ঠবন্ধ—মোরে সঁপি তুমি ।
 প্রেমে দীক্ষা—বহ্নিজালা,
 মবিলে—তাতেই জালা,
 প্রেমে শুধু—অগ্নিহোত্র যাগ ;
 বৃকে বহ্নি-বেদী জলে,
 আহতি ত পলে পলে,
 ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আয়ুর বিভাগ !
 হের গো নিশীথ আসে,
 ঘুমানু ভ্রমব পশে,
 হিমালীর হিংসিত—মুকুলে ;
 মায়ার তোরণ পাশে,
 সন্ধ্যা করে ডাকে বসে ।
 চলে গেলে ?—দিবা গেল চলে !
 শ্রীনলিনীকান্ত চট্টোপাধ্যায় ।

মহামায়া ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পব]

বালিকা বলিল—“বাপেব বোন কি কুহকিনী হয় ?” শিসিমা
 আমার মায়াময়ী—আপনার ।--তোমবা পব—তোমবা আদব দেখাও,
 আমাদের সর্বনাশ করিবার জন্ত ।”

“আবার তোমবা ?—সত্য কবিতা বল—আমি ছাড়া এ বাড়ীতে
 আবার কে তোকে আমাব মত আদর কবিতাছে ?—না বলিলে
 সত্য বলিতেছি—কিল্ মারিয়া তোব মাথার খুলি ভাঙিয়া দিব ।”

বালিকা বলিল—“তোমার মত আব একজন আমাকে জোব
 করিয়া ধরিয়া কোলে তুলিয়া মা বলাইয়াছে ।”

“কোথায় ?”

“এইখানে ।”

“কবে ?”

“যেই দিন তুমি এখানে আসিয়াছ ।”

“কখন ?”

“তোমার আসিবার কিছু পূর্বে ।”

“তা’র পর ?”

“তা’র পর আসি বলিয়া যে চলিয়া গেল, আব আসিল না ।”

“বলিস কি ?”

“আজ সাতদিন হইল, আমার সেই নূতন মা ফিরিতেছে ।”

“তা’র বাড়ী কোথায় ?”

“তা’ কেমন কবিয়া বলিব ?—সেইদিন সবেমাত্র তাহাকে দেখিয়াছিলাম । আমার মা তাহাকে তুমি মনে করিয়াছিল ।”

“তাহাকে দেখিতে কেমন ?”

“সুন্দর ।”

“তোব মায়ের মতন ?”

“মা আমার শোকে শীর্ণ হইয়া গিয়াছে । মাযেব আব সে শ্রী নাই ।”

“আমাব মতন ?”

বালিকা চুপ কবিয়া বহিল ।—সম্মুখে একখানি দর্পণ ছিল । সাবদাসুন্দরী সেইটা টানিয়া নিজেব মুখেব কাছে ধবিল । তাহুল^{দী} গ-বস্ত্রিত অথব অঙ্গুলি নিপীড়িত কবিয়া, নিজেব সুন্দব মুখখানি দেখিয়া, ইতস্ততঃ বিক্ৰিপ্ত অলকগুচ্ছ যথাস্থান সন্নিবিষ্ট করিয়া মুখখানিকে আবও একটু সুন্দব কবিয়া লইল । আব প্রতিবিম্বের উপবেই নয়ন বাখিয়া আবাব জিজ্ঞাসা কবিল,—
“কেমন—আমাব মতন ?”

এ প্রশ্নেব উত্তর দিতে বালিকা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল । কোন রকমে কথাটা চাপা দিবার জন্ত বলিল,—“সন্ধ্যা হইতে চলিল, চুল বাঁধিবে কখন ?”

“কেন এ এলো সৌন্দর্য্য কি তোর পছন্দ হইল না।”

বালিকা হাসিয়া সারদার কোলে মুখ নুকাইল।

সারদা বলিল,—“তোব সত্যকথা বলিতে ভয় হইতেছে, কেমন?”

বালিকা বলিল,—“তুমি অতি সুন্দর।”

“আর তোর নূতন মা ‘অতির’ উপর এক কাটা বেশী সুন্দর।
সত্য বল, আমি তোরে আবও বেশী ভাল বাসিব।”

বালিকা সারদার কোল হইতে মাথা তুলিল, গ্রীবা ভঙ্গে
সারদার মুখের পানে আব একবার চাহিল। আব বলিল,—“তুমি
তাবুলরাগে ঠোট দুটা বাড়াইয়া, আবদী ধরিয়া, চক্ষে কটাক্ষ
বাধিয়া যেমন সুন্দর, আমাব নূতন মা শুধু শুধুই তেমনি সুন্দর।”
—বলিয়াই লজ্জায় হাত দু’খানি সাবদার গলায় জড়াইয়া দিল।

বালিকার এই স্বাভাবিক আত্মীয়তায় সাবদাসুন্দরী গলিয়া গেল,
মনে মনে আপনাকে বহু ভাগ্যবতী বিবেচনা কবিল। আর
বুঝিল—সংসারে মানস-ব্যাধিব এইরূপ শত সহস্র ঔষধ থাকিতে
মানুষে খুঁজিতে জানে না—জানিতে চাব না বলিষা এত দুঃখ
পায়। আপনাব অসুখের সন্ধানে না ঘুবিয়া—মেদিনীপুত্রের এষ্ট
আপনার সামগ্রীটীব যদি সে সন্ধান কবিত, সেও মহামায়ার
মত সুখিনী হইত—সুখ বিনাবাক্য ব্যাঘে উপযাচক হইয়া, আপ-
নাব কোট ছাড়িয়া তাহাব দ্বারস্থ হইয়া, পড়িষা থাকিত। মহা-
মায়াব বাপ—কোথাকার কে তাহাদিগকে আত্মীয় কবিষা মহা-
মায়াকে একটা দুর্ভেদ্য সুপ দুঃখে বসাইয়া গেল—তাহার কাছে
এখন আর দুঃখ আসিতে সাহস কবে না। আব তাহাব এত
আপনার—তাহাদের অবহেলায় মেদিনীপুত্রের কোন অঙ্গকাবে
পড়িষাছিল। সাবদাসুন্দরীব এইরূপ তর্ক নীমাংসা সকলেব পক্ষে
ভাল না লাগিতে পাবে; কিন্তু মানুষ যে বিষয়টী পছন্দ করে,
সেটী তর্ক যুক্তিতে যেমন কবিষা পারে, আপনাব মত কবিষা
লয়। কি ধর্মে, কি সামাজিক-বৈবধিক ব্যবহাবে, প্রতি কার্য্যানুষ্ঠানে
এইরূপ ভিন্ন পথগামী বিভিন্ন তর্কের ভিন্ন ভিন্ন স্থান সংস্থ

নানা মীমাংসায় সংসার ভরিয়া বহিয়াছে।—কেহ পরকে তর্ক মীমাংসায় আত্মীয় করে, কেহ বা তর্ক মীমাংসায় আত্মীয়কে পব কবে। কেহ মনকে বুঝাইতে পরকে যক্ষসর্কস্ব দিয়া বসে—কেহ বা মনকে বুঝাইতে ভাইয়ের বিষয় কাড়িয়া লয়। যে যা' কবে আত্ম তৃপ্তিব জন্ত। সুখ দুঃখ পবম্পব সাপেক্ষ। মহামায়ার সুখ কি বুঝিতে পাকক, আব নাই পাকক, সাবদা নিজের সুখটী বুঝিয়া লইল। নিজে বন্ধা ছিল—পুল্লেব জন্ত কত ঔষধ খাইয়াছিল, দেবতাব কাছে মানসিক কবিয়াছিল,—কিছুই ফল পার নাই। আজ দেবতাব রূপায় এই কত্তা রত্ন পাইয়া সাবদা সন্তানের অভাব ভুলিয়া গেল।

সারদা নলিনীব বাহুটী নিজেব হস্তে ধরিয়া তাহাকে বন্ধে সংশ্লস্ত করিয়া বলিল,—“হাঁ নন্! তুই তাহাকে দেখিলে চিনিতে পারিবি?”

বালিকা বলিল—“এখনও আমি তাহাকে তোমাব মুখেব ভিতব দিয়া দেখিতেছি।”

“বুঝিযাছি, তুই দেবী দর্শন কবিযাছিস্। সে দেবী চুরি করিয়া আমাকে দেখা দিতে আসিয়াছিল, তুই দেখাটা ঝাটপাড়ী কবিযা লইযাছিস্।”

নিম্নতল হইতে সারদার ঝাণ্ডী ডাকিল,—“সারদা”। রমাপ্রসাদের মা বধূকে বধু বলিত না, আব বধু বলিলে সাবদা উত্তর দিত না। এই কথা লইয়া সাবদাব স্বামীব সহিত ভ্রাতৃত্ব বন্ধনেব উল্লেখ কবিয়া মহামায়ার ও তাহাব কত প্রতিবাদিনী সহচরী তাহাকে কত বহস্ত কবিযাছে। তথাপি সারদা কত্তা বাৎসল্য নাম না ধরিয়া ডাকিলে ঝাণ্ডীব কথাব উত্তর দিত না। স্বামীব সহিত সাবদার বন্ধন-সূত্র কিকপ ছিল, সাবদাই জানিত অন্ত কাহাকেও জানিতে দিত না। সারদা বলিল,—“ঘাই মা।”

ঝাণ্ডী নলিনীকে ডাকিল, নলিনী বলিল “ঘাই পিসী”।

চুল ধেমন-তেমন বাঁধিয়া নলিনীব মাথায় একটা গোঁজ

করিয়া দিয়া, সারনা আরসী চিরুণী যেখানে হ'ক রাখিয়া নলিনীকে
লইয়া নীচে নামিয়া গেল। [ক্রমশঃ]

শ্রীকীবোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য।

“বউ কথা কও!”

[পাখীর প্রতি]

কে তুমি পাখি! পাতার আড়ালে লুকাইয়া সঁজ্জি সকালে,
দিনে দুপবে, যখন তখন, যেখানে সেখানে “বউ কথা কও” বলিয়া
চীৎকার কর; আমবা কুলেব বধু—অবলা, সবলা, তাই বুঝি তুমি
আমাদিগকে নরম পাইয়া, আমাদের কোমল প্রাণে ব্যথা দিবার
জন্ত ব্যঙ্গোক্তি “কথা কও” “কথা কও” বলিয়া কুজন কবিয়া
থাক! বনের পাখি! বনজাত বিবিধ ফল তোমার বসনার
তৃপ্তিসাধন করে, নির্ঝণিক কাচ-স্বচ্ছ সলিলে তৃষ্ণা নিবাবিত হয়;
তুমি স্বাধীনতাব সুধাধবলিত সোধে আজন্ম প্রতিপালিত হইয়া
মনের সুখে বন মাঝে—শাখীর শাখার সুখাসীন হইয়া সুখে দিন
অতিবাহিত কব, আব মধ্যে মধ্যে সুনীল নভঃস্থলে সন্তবণ দিয়া
দিগন্তে উড়িয়া বেড়াও, মানব-সমাজে শিষ্টাচারেব সহিত তোমার
কোন সম্বন্ধই নাই; তবে কেন, মানব-সমাজ অনভিজ্ঞ তুমি
কুভাবে কুজন কবিয়া কুলেব বধু কথা গুনিবার জন্ত “বউ কথা
কও” “বউ কথা কও” বলিয়া চীৎকার করিয়া মব? কেন আমবা
কি বোবা না হাবা?

পূর্বে—বহুপূর্বে—আমাদের সেই তমসাজ্বর হৃদিয়ে আমাদের
একটু বোবা বদ-নাম ছিল বটে, তখন পবাধীনা—অনেকের অধীনা,
আমরা মুকের মতই থাকিতাম বটে, তখন বুক ফাটিলেও আমা-
দের মুখ ফুটাইবাব যো ছিল না বটে, তখন স্বর্ঘ্যও আমাদের
মুখ দেখিতে পাইতেন না, পবন আমাদের কথন গুনিতে পাইতেন
কি না সন্দেহ; তখন আমরা অজ্ঞানানু, আগবা অববোধ কাবা-
গারে কালতিপাত করিতাম, এ কথা সত্য বটে, কিন্তু বিহগবব!

চিরদিন কি কতু সমান যায় ? হৃৎকের পর স্নেহ, স্নেহের পর পোর্ণমাসীব ছায় নিশ্চয়ই আসিয়া থাকে। অতীতের কথা ছাড়িয়া দাও, যাহা অতীতেব আঁধারে ডুবিয়া গিয়াছে, তাহার জন্ত অহুশোচনা শিষ্টেব কার্য্য নহে। সময়ে সকল বিষয়ই উন্নতি আনয়ন করে।

এখন আর আমাদের সে কাল নাই, সে মূর্তি নাই, সেরূপ চাল-চলন, কথন-বলন, হাব-ভাব সমস্তই পরিত্যাগ করিয়া আমবা এখন উন্নতির উচ্চ সোপানে আবোহণ কবিতেছি; অবরোধ কারাগারেব শৃঙ্খল কাটিয়া ফেলিয়াছি, এখন আর আমবা “ফটকে আটক” থাকিতে চাহি না; বোবা বদ্-নাম বিদূরিত করিবার জন্ত আমরা সভা-সমিতিতে সভাপতিত্ব গ্রহণ করিয়া, সঙ্গলায় জগৎ মাতাইয়া তুলিতেছি। অধীনতার অন্ধকার হইতে শিক্ষাদীক্ষার দক্ষতা এখন আমবা স্বাধীনতার পূর্ণালোকে আসিয়া পড়িয়াছি, এখন আমবা অবলা হইয়াও সবলা, সরলা হইয়াও নিম্নত স-বোলা, কাবণ আমাদের কণ্ঠবোলে এখন ঘর-বাহির প্রতিধ্বনিত, আমাদের কলকণ্ঠেব কাকলীতে তোমাদের কোকিল লজ্জা পাইল, তাই সে বৎসরের মধ্যে অধিকাংশ সময়ই পলায়নপব হয়। এত দেখিয়া, এত শুনিয়াও—বোকা পাখী! আমাদের কথা শুনিবার জন্ত সঁদাই কেন যে গলাবাজী কবিয়া যব, তাহা তোমবাই জান ?

আমবা আত্মশক্তিব অংশ, আমবা সংসারের সাব, তাই পত্নি-বিষোণে লোকের গৃহ শূন্য হয়, পত্নীর মৃত্যুতে “সংসার অন্তথা” বলে। “গৃহিণী গৃহ মূচ্যতে” এ কথা ও শাস্ত্রকারগণ মুক্তকণ্ঠে বলিয়া গিয়াছেন। এক কথায় আমবা সংসাবেব সর্ক্সেসর্ক্সা, সংসাব দেহের কুলকুণ্ডলিনী। আমাদের জন্তই, আমাদের বলে বলীয়ান হইয়াই সংসাবেব সমস্ত শিক্ষা, বাণিজ্য, বিষয় ব্যাপার, বিদ্যা, বৈত্তব চলিতেছে ও উন্নতি লাভ কবিতেছে। বল দেখি, নানাবিধ নূতন কাশান কলিত হইয়া এই যে দিন দিন শিল্পেব ত্রীবৃদ্ধি সম্পাদিত হইতেছে—এ কাহার রূপায় ? ইহার মূলে কি আমাদের সেই বিশ্ববিমোহকাবিলী মোহিনী শক্তির স্মৃত্তত্ব নিহিত নাই ?

অকোথ পাখি! আমরা বোকা নহি, বোকা নহি, আর হাবাও নহি। আমাদের কথার চোটে ভূত ভাগে, আমাদের হাড়ে ভেলকী লাগে, আমাদের গুণে বোবাব বোল ফোটে, বোকা সেয়ানী হয়। এখন আমবা খোমুটার ভিতবেও খেমুটা নাচিতে পারি, খাশমহলে বসিয়া খোসগল্প করিতে জানি, আর খামেব মধ্যে কত স্থানে কত খোশ খবব লিখিতেও শিখিয়াছি। আর কি চাই! আমাদের ঈদুগী ক্রমতা দেখি ঃ মুখ পাখি! কোন্ সাহসে কুজন করিয়া আমাদেরকে ব্যঙ্গ বাব জন্ত বলিয়া থাক,—“বউ কথা কও” “বউ কথা কও”

এখন . . . ইত সমানাধিকার, ববং বিক্ষিপ্ত অধিক অধিকার . . . ঃ আমাদের উদ্দেশ্য হইয়াছে। এই মহদ-দেহ—সাধু, ডেহে কার্য্যে পবিত্র করিবাব জন্ত আমাদের সভা-পত্ৰিগণ, উন্নতি সোপানাকঢ়াগণ, আমাদের মুখপাত্রীগণ দিনরাত পুরুষেব সহিত কত আন্দোলন, কত আলাপন, কত কথোপকথন করিতেছেন। এখন পুরুষেব সহিত আমবা—হাটে, বাজারে, স্কুলে, কলেজে, আফিশ-আদালতে, সমাজ-সভাতে বাগানে-ব্যারাকে সমানাধিকার পাইবাব জন্ত নিয়ত চেষ্টা করিতেছি—আব চেষ্টাব ফলও বেশ ফলিতেছে। তবে গুটীকতক নৈসর্গিক নিয়মে আমাদের মধ্যে মধ্যে কিছু কিছু ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোলে, তাই আমবা সকল বিষয়ে পুরুষ লাভ করিতে আজিও কৃতকার্য্য হইতে পারিতেছি না। কিন্তু তাহাতে আমরা হতাশ হই নাই, “বোমনগব একদিনে নিশ্চিন্ত হয় নাই।” আমাদের অগ্রগীগণ আশা দিতেছেন যে, আমরা বিজ্ঞান বলে সত্ত্বব সেই নৈসর্গিক বাধা বিপত্তি বিদূবিত কবিয়া,—“পুবা পুরুষ” হইয়া যাইব, তাহাতে আব সন্দেহ মাত্র নাই। বিজ্ঞানেব বলে কি না হয়!!

তবে একটী সময় আছে যখন আমবা কিয়ৎক্ষণ মৌনবতী থাকি,—“কথা কও” “কথা কও” বলিয়া মাথামুড় খুঁড়িলেও তখন আমরা কথা কহি না। সেটী আমাদের নিতান্ত প্রাইভেট।

সে বিষয়ে হস্তক্ষেপ করা নিতান্ত শিষ্টাচার বিরুদ্ধ। সেই “দেহি
পদ পল্লব মুদারম্” পালায় আমরা স্বকার্য সাধনোদ্দেশে অতি
কষ্টে কিয়ৎকাল রসনা আবদ্ধ রাখি। যদি সেই জন্তই সেই
প্রাইভেট ভেদ করিয়া তুমি “বউ কথা কও” বলিয়া আমাদেরকে
লজ্জা দিতে মনস্থ করিয়া থাক, তাহা হইলে আর তোমার রক্ষা
নাই; তাহা হইলে আমাদের কোপে পড়িয়া শীঘ্রই তোমার
তোমাদের সকলকে পিঞ্জরে আবদ্ধ হইতে ইবে। অতএব ছুট
পাখি! সাবধান! কোন প্রকারে কিম্বা শ্রমের মূলে আঘাত
কবিত্তে চেষ্টা করিও না। যদি নিতান্তই কথা না শুন,
তবে অচিবাৎ বৃষ্টিতে পাবিবে, তোমার পাখীর্ণ আসিয়াছে।
ত্রিবিনে, ,পাধ্যায়।

প্রার্থনা।

স্বপ্ননৌক জাগবণে, কে তুমি গো হৃদাসনে,
এই এস এই যাও নাহি কিছু স্থির ;
হৃদি-পদ্মে পদ-ছায়া, ক্ষণতরে মিশাইয়া,
আবাব চলিয়া যাও বড়ই অধীৰ।
কোন পাপে অভাগারে, কাদাইয়া বাবে বাবে,
এইকপে কব চিব বিষাদে মগন ;
ক্ষণমাত্র দেখা দিয়ে, কেন যাও পলাইয়ে,
কি দোষে বঞ্চিত দাস ও বান্ধা চবণ ?
ছিল স্থির মন মম, কে তুমি বিহ্যৎ সম,
আলোড়িত করি প্রাণ অনন্তে মিশাও ;
পুনঃ অন্ধকার আসে, কম্পিত করি'ছে ত্রাসে,
দূবে যা'ক্ তমোরাশি জ্ঞানালোক দাও।
লোকে কয় জ্ঞানময়, দয়াময় প্রেমময়,
কিষ্কিৎ করুণা কর এ দাসের প্রতি ;
ভজন সাধন হাবা, হইয়াছি দিশে হাবা,
কৃপা চক্ষে হেব নাথ অগতিব গতি।
তুমি হে অনাথবন্ধু পতিত পাবন।
ত্রিপদে অভাগা কবি মাগিছে শরণ ॥

কিরণ ।

স্বরলিপি ।

ভৈরব মিশ্রিত—কার্পা ।

কথা—শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ ।

স্বর—শ্রীরামতারণ সাত্তাল ।

কিছার আর কেন মায়া কাঙ্ক্ষন কামা ত রবে না ।

দিন যাবে দিন রবে না তোর কি হ'বে তোর তবে ;

আজ পোহা'লে কাল কি হবে দিন পাবি তুই কবে ?

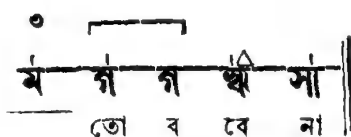
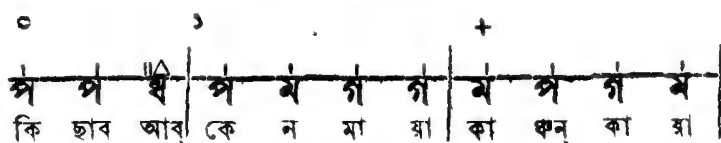
সাধ কখনো মেটে ন! ভাই ! সাধে পড়ুক বাজ ;

বেলাবেলি চল্বে চলি সাধি আপন কাষ ।

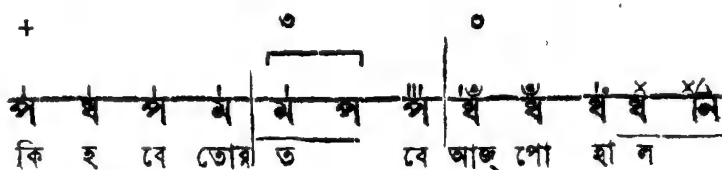
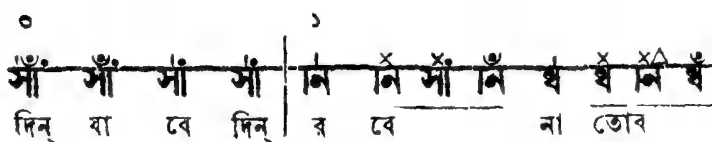
কেউ কারো নয় দেখনা চেয়ে কবে ফুটবে আঁখি ?

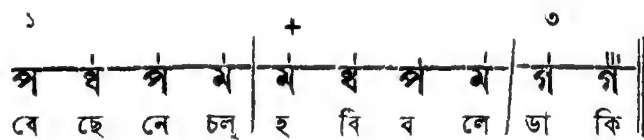
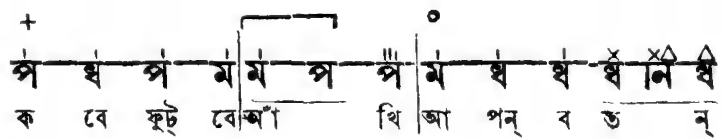
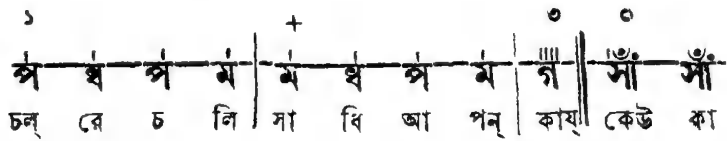
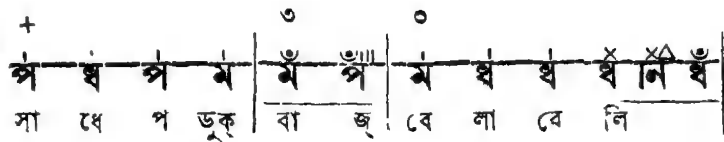
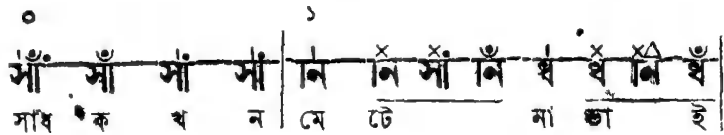
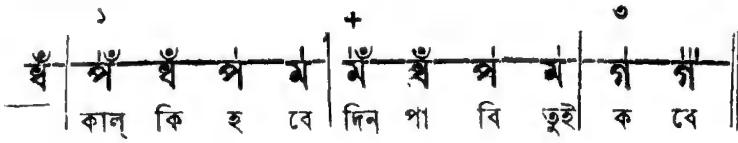
আপন রতন বেছে নে চল্ হরি বলে ডাকি ।

আহ্বায়ী ।



অন্তরা ।





বীণাপানি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।



“বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে । ঙ্গবতি, ভাবতি দেবি নমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । } আশ্বিন, ১৩০৪ সাল । } ৯ম সংখ্যা ।

ঈশ্বরোপাসনা ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

“অতোহুত্ৰাহপি হে কেশামুভয়োঃ”—শূত্র দ্বারা কাম্য কৰ্ম্মাদি যে মোক্ষের প্রতিবন্ধক তাহাই সূচিত হইরাছে । প্রোক্তকপ কাম্য-কৰ্ম্মাদিনিরত লোকদিগকেও হঠাৎ বুদ্ধিভেদ না জন্মাইয়া ক্রমে ফলাসক্তি পপ্রিত্যাগে উপদেশ কবাই ঐতি সিদ্ধান্তিত, তাই স্মৃতি বলিতেছেন,—“ন বুদ্ধিভেদং জন বেদজ্ঞানাং কৰ্ম্ম-সঙ্গিনাং ।” যোজ্যেৎ সৰ্ব্ব কৰ্ম্মানি বিদ্বান মুক্ত সমাচরণ ॥”

কাম্য কৰ্ম্মের ফলাকাজ্ঞা হেতুতই যখন এতাদৃশ ভোগবিচিত্র ও বিড়ম্বনা দৃষ্ট হইতেছে, তখন ফল অর্জিত হইয়া কৰ্ম্ম কবাই নিঃশ্রেয় প্রাপ্তির একমাত্র কারণ বলিয়া, এতদ্বারা কৰ্ম্মাশক্ত মানবের মনে সিদ্ধান্তিত হইতেছে । যেহেতু কাম্য কৰ্ম্মাশক্ত মানব দেখিতেছি,—“অনেক চিত্ত বিভ্রান্ত মোহভালে সমাবৃত্তা । প্রসক্তা কাম-ভোগেষু পতন্তি নরকেহুচৌ ॥” নানা সংকল্প কলাপ বিভ্রান্ত

মোহজালে সমাবৃত ও বিষয় ভোগে নিরতিশয় আশক্ত মানবগণ অশ্রুচি নবকে পতিত হয়। বিশেষতঃ কস্মারুষ্ঠানজনক কামনা ভোগ কবিষা তাহাবা দেখিকে পায়, ভোগস্পৃহা ক্রমেই বলবতী হয়, তাই ভগবান্ মনু বলিলেন,—“ন জাতু কামঃ কামানমুপ ভোগেণ সাম্যতি । হবিষা কৃষ্ণ বস্মেবভূয় এবাভি বর্দ্ধতে ॥” সূতবাং কস্মী যখন দেখিলেন যে, কস্ম তাহাব কেবল ভোগেব জন্তু তখনই দর্শনে সে, বিষ্ণু হইয়া পড়ে। পরে প্রতি-নিধি প্রথাও সে দোষেব অত্যন্তক কাবণ দেখিতে পায়। “স্বয়ম-সিদ্ধঃ কথং পবান্ সাধয়তি” এবন্নিধ নানা দোষ দর্শনে মানব বুঝিতে পাবে না যে, কাম্য কস্মারুষ্ঠানেব ফল আশঙ্কবি মানবেব ক্ষণিক সুখ সমুদ্রিব কথঞ্চিৎ দুর্দ্রিব জন্তু মাত্র। তখন তাহারা ফলাকাজ্ঞা বর্জিত হইয়া কস্মারুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। তখন তাহারা বুঝিতে পাবে, “কস্মন্তেবাধিকাবস্ত সা ফলেষু বদাচন। সা কস্ম-ফলে হেতুভূম্মাতে সঙ্গোহস্ত কস্মণি।” কস্মেই জীবের অধিকাব হওয়া উচিত, কিন্তু ফলে নহে।

ফল কামনায যেন কস্মে প্ররতি এবং কস্মত্যাগে যেন জীবিত প্রীতি না হয়। এইকপে জীব কাম্য ও নিষিদ্ধ কস্ম বর্জণ করিষা নিষ্কাম কস্মে বত হয়। নিষ্কাম কস্মই নামান্তবে ঈশ্বর প্রীত্যর্থ কস্ম বা উপাসনা বলিষা কথিত হয়। তাই গীতায বলিতেছে,—“যজ্ঞার্থাং কস্মণোহন্ত্র লোকেহয়ং কস্ম বর্দ্ধনঃ।” মনুয্যগণ যজ্ঞ অর্থাৎ বিষ্ণুব আবাধনার্থ কস্ম না কবিষা অন্ত্রাখারুষ্ঠান করাতেই বর্দ্ধন দশাগ্রস্ত হয়। বিষ্ণু পূবাণেও উক্ত হইয়াছে, “বিশিষ্ট ফলদাঃ কাম্যা নিষ্কামণাঞ্চ মুক্তিদা” অর্থাৎ কাম্য কস্মাদি ফলপ্রদ; কিন্তু নিষ্কামভাবে কবিলেই তাহা মুক্তিপ্রদ হয়। স্মার্তভট্টাচার্য্যও বলিয়া-ছেন,—“কাম্যং কৃষ্ণান্তুষ্ঠার্থং প্রকর্ডব্যং মুমুক্শুনা।” মুমুক্শু ব্যক্তি কাম্য কস্মাদি কবিলে ঈশ্বর প্রীত্যর্থ করিবেন। শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন,—“বেদোক্তমত্র কুর্সানো নিঃসঙ্গো পিতৃমীশ্ববে। নৈষকস্ম সিদ্ধিংনভেত বোচনার্থা ফলশ্রুতিঃ”—অর্থাৎ নিষিদ্ধ কস্ম বর্জণ

পূৰ্ণক বেদোক্ত কৰ্ম্মাণুঘোষাণুষ্ঠানকাৰী মানবগণ নিকাম কৰ্ম্ম-জনিত পৰম ফল লাভ কৰেন। ফলশ্ৰুতি কেবল কৰ্ম্ম আচোদনাব-
ৰুচি জনক মাত্ৰ। পূৰ্ণোক্তৰূপ প্ৰমাণ সংগ্ৰহে আমবা দেখিতে
পাইতেছি যে, কৰ্ম্মাণ গণ ফলাকাঙ্ক্ষা বৰ্জিত হইয়া কৰ্ম্ম কবিলেই,
ঈশ্বৰোদ্দেশ্যে অৰুষ্ঠিত হয়। এইৰূপ ঈশ্বৰ প্ৰীত্যৰ্থ কৰ্ম্মাণুষ্ঠানই
ঈশ্বৰ লাভাৰ্থ বিশুদ্ধ উপাসনাব প্ৰথম সোপান—আপনাব
অবশ্যই অনুভব কবিতোছেন।

জননীৰ ত্ৰাণ পৰম হিতৈষিনী শ্ৰুতি কৰ্ম্ম-কাণ্ডকে কিকপে
অলক্ষ্যে উপাসনা কাণ্ডে পবিত্ৰ কবিয়াছেন, কিকপে বজঃ প্ৰধান
কৰ্ম্মকে ক্ৰমোপাসনা পদ্ধতিতে সত্ৰ প্ৰবল কবিতো চেষ্টা কবিয়া-
ছেন, স্বনাম খ্যাত ইংলণ্ডীয় কবি Goldsmith গ্ৰাম্য প্ৰচাৰবেব
সম্বন্ধে যেমন বলিয়াছেন,—

And as a bird each fond endearment tries,
To tempt its newfledged offspring to the skies ;
He tried each art, reproved each dull delay,
Allured to brighter worlds and led the way.

ঠিক যেন সেই প্ৰণালীতে শ্ৰুতি, বজঃ প্ৰধান মানবগণকে
নিকাম কৰ্ম্মেব কথা বলিয়া কি অশ্চৰ্য্য কৌশলে ক্ৰমে নহেব
নিৰ্ম্মল শ্ৰোত তাহাদিগেব হৃদয়ক্ষেত্ৰে পৰিচালিত কবিয়াছেন!
সত্ৰ প্ৰবল কবিবাব জন্তই উপাসনা কাণ্ডেব প্ৰথম অবতারণা
বলিয়া অনুমান কবা যাইতে পাবে।

পূৰ্ণোক্ত উপাসনা ত্ৰয়েব মধ্যে যজ্ঞোপাসনা কৰ্ম্মাধ্যায়েব
অন্তৰ্গত বলিয়া এতুলে তাহাৰ আৰু সমধিক আলোচনা নিম্প্ৰয়োজন
মনে কবিতোছি। সংপ্ৰতি উপাসনাধ্যায়োন্তৰ্গত প্ৰতীক ও অহং-
গ্ৰহোপাসনা সম্যগালোচনা কবিব।

প্ৰতীকেব অৰ্থ বহিৰালম্বন। পবিত্ৰশ্ৰুতান্ বিচিত্ৰ জগতে আল-
ম্বনেব অবধি নাই। আত্মক পৰমান্ন সমস্তই প্ৰতীকৰূপে কল্পিত
হইতে পাবে। যাহা সমধিক বিভূতিমান্ সেই সেই প্ৰতীকই

ব্রহ্মের সমধিক নিকটবর্তী বলিয়া শাস্ত্রে নির্দিষ্ট হইয়াছে। সুতরাং উক্তরূপ প্রতীকোপাসনার সমধিক ফল প্রদান করে।

প্রাণোপাসনা, সূর্য্যোপাসনা, প্রণবোপাসনা, ইহারা সকলেই পরব্রহ্মোপাসনার অবলম্বনরূপে কল্পিত হইয়াছে। গীতাব বিভূতি যোগাধ্যায়ে “আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ” হইতে “একাংশেন স্থিতো-
জগৎ” পর্য্যন্ত যাহা যাহা ভগবানের বিভূতি বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, জগতের সর্ব্বত্রই তাহাব কোন একটা ভগবানের অন্ত-
তব প্রতীকরূপে পূজিত হইতেছে। কিন্তু পূর্বেই বলিয়াছি, যেমন পশু পক্ষী, জাতীয় উচ্চাদর্শ বা ঈশ্বর, পশু পক্ষী ভিন্ন অথ কোন মূর্ত্তিতে কল্পিত হইতে পারে না, সেইরূপ অন্তদাদি মানবও যে কোন প্রতীকে কেন ভগবদ্ বুদ্ধি ব্যুৎপত্তাপিত কবে না, তাহাতে মনুষ্য বুদ্ধিব আবোপ কবিতো হইবে। তাই পূর্বাণে দেখিতে পাই, সূর্য্যদেব মানুষরূপে কল্পিত হইয়া সপ্তাশ্ব বথে যোজন কবতঃ পৃথিবী পবিত্রমণে পবিত্র্যন্ত আছেন। তাই ঋতিগণও মূর্ত্তিমতী। মন ও ইন্দ্রিয়ের বিবাদ বেদেই দৃষ্ট হয়। অগ্নি, বরুণ পরম ও অগ্ন্য প্রভৃতি বিভূতিমান্ পদার্থ মাত্রই মনুষ্য মূর্ত্তিতে পবিকল্পিত হইয়াছে। মনুষ্যের কচি ও গুণানুসাবেই প্রতীক বিশেষে ঈশ্বর বুদ্ধি অধ্যাবোপিত হয়। তাহাব স্ববণ, মনন ও তৎসম্বন্ধীয় অন্ত-
বাগ বা একাগ্রতাই উপাসনার অঙ্গ। তাই স্মৃতি বলিতেছেন,—
“যো যো যাং যাং তনুঃ ভক্তঃ শ্রজযাচ্ছিতু মিচ্ছতি। তস্ত তস্তা-
চলাং শ্রদ্ধাং তামেব বিদধামাহম॥” যে যে মূর্ত্তি প্রতীকে শ্রদ্ধা-
পূর্ব্বক অর্চনা কবে, আমি সেই সেই ব্যক্তির শ্রদ্ধা তত্তমূর্ত্তিতে
দ্রুতা কবিয়া দেই। পৌরাণিক সময়ের পর বামানুজ, মাধবাচার্য্য
ও বল্লভাচার্য্য ও প্রভৃতি দ্বৈত সম্প্রদায় প্রবর্ত্তক মহামহোপাধ্যায়
পণ্ডিতগণ যখন দেখিলেন, প্রতীক মনেই মনুষ্য বুদ্ধি আবোপ
কবিয়া লইতে হয়, এবং বেদেও যখন তাহাব সমর্থনতা দৃষ্ট হয়,
তখন বেদানুমেদিত মূর্ত্তিবিশেষকেই তাহাব ঈশ্বরবাবতার নির্দেশ
কবিয়া ভাগবদ্ ধর্ম্মের সমধিক প্রচার করতঃ ভক্তি পথানুবর্ত্তন

কবিলেন। মহা বিভূতিমান্ বামকৃষ্ণাদিকে তাহাবা ঈশাবতাব বলিবা অবতাব বাদ বিশেষকপে প্রচাব কবিলেন। তাঁহাদের উপাসনাকেই তাহাবা মোক্ষলাভেব অনন্তোপায় বলিবা নির্দেশ কবিতেন। পৌৰাণিক সময়েই কেহ শিবমূর্তি, কেহ গণপতি মূর্তি, কেহ শাক্তিমূর্তি, কেহ বা বিষ্ণুমূর্তি রূপ প্রতীকে ঈশ্বৰ বুদ্ধি স্থাপন কবিয়া সম্প্রদায়গণেব সূচনা কবিয়া দিয়াছিল। এখন তাহারই সমধিক সংকীর্ণতা হইয়া প্রচাবিত হইতে লাগিল। কে বলিল,—“বাসুদেবং পবিত্যজ্য যোত্মদেবমুপাসতে স্বমাতবং পবিত্যজ্য স্বপচীং বিন্দতে হিসঃ॥” বাসুদেবকে পবিত্যাগ কবিয়া যে অত্ম দেবতাব উপাসনা কবে, সে স্বমাতাকে পবিত্যাগ কবিয়া চণ্ডালিনীকে ভজনা কবে। বেহ বলিলেন,—“কলাদাগ মমুল্লজ্য যোত্মমার্গে প্রবর্ততে নতত্তগতি বস্ত্তি সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ।” কলিতে ‘তত্ত্ব পথ পবিত্যাগ কবিয়া যে পথাস্ত্বেব অন্তসবণ কবে, তাহাব কখনও গতি হয় না। অপৰ কেহ বলিলেন,—“মহেশান্নাপবো দেবঃ” শিব হইতে শ্রেষ্ঠ দেব আব নাই।

একপ আমবা দেবিত্তে পাই, একাগ্নিষ্ঠা ও তন্ময়তা তেতু বিভিন্ন প্রতীকই স্ব স্ব প্রাধাত্তে স্থপিত হইয়া সাম্প্রদায়িক দ্বন্দেব প্রবল কাবণ হইয়া উঠিয়াছিল, কিন্তু ইহাদেব মধ্যে যখন কেহ ইষ্টলাভান্নরূপ নিশ্চেষ প্রাপ্ত হয়, তখন আব সাম্প্রদায়িকতাব বিদ্বিষ্টতাব দৃষ্টিগোচৰ হয় না। সেই জন্ত সাম্প্রদায়িক হইলেও, কোথাও বা বিদ্বান্মেষণবং গভীৰ তত্ত্ব, ইশাদিগেব গ্রন্থেব কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। “মংভক্তঃ শঙ্কৰদেবী মদেবী শঙ্কৰ প্রিয়ঃ। উভোভৌ নবকং জাতৌ বাবচ্চন্দ্রদিবাকবৌ॥” (হবিভক্তি বিলাসে) ইত্যাদি বাক্য তাহাব প্রমাণ স্থলকপে উল্লেখ কৰা যাইতে পাবে। কিন্তু অবতাব হইতে আবস্ত কবিয়া নিম্নশ্রেণীৰ প্রতীক পর্যাস্ত যে কোন প্রতীকোপাসনাকে কেন অবলম্বন কৰা যায় না, তাহাব ফল বেদান্তমতে সাজুয্য প্রাপ্তি বা সঙ্গেশ্বৰ লাভ। “তং বথা যথোপাসতে তদেব ভবতি” ইত্যাদি শ্রুতি বাক্যই তাহার প্রমাণস্থল।

কিন্তু সাজুয়া প্রাপ্তিও নিগুণব্রহ্মেব নিতান্ত সমীপবর্তিনী । তাই
 সূত্রকাব বলিতেছেন,—“সামীপ্যাত্তু তদ্ব্যপদেঃ” (৪।৩।৯)
 “বিশেষকঃ দর্শয়তি” (৪।৩।১৬) সূত্রদ্বারা ও প্রতীকানুসারে যে
 ফলেব তাবতম্য হব, তাহাই বুঝা যাইতেছে । যাহারা প্রতীকো-
 পাসনাব ফলে ঈশ্বর সাজুয়া লাভ কবেন, তাহাব জগৎসৃষ্টি
 ব্যতীত অত্যাশ্রয় ক্ষমতা (অগ্নিমাদি সিদ্ধি) প্রাপ্ত হয় । “জগৎ
 ব্যাপাব বর্জঃ প্রকবণাদ সন্নিহিতত্বাচ্চ ।” কিন্তু তাহাব নিগুণ
 ব্রহ্মোপাসকেব ত্রায নিবন্ধুণ নহে । বেদান্ত গম্ভীর স্ববে পুনঃ পুনঃ
 বলিতেছেন, অহংগ্রহ উপাসকেরা নিগুণ ব্রহ্মস্বরূপাবস্থান বশতঃ
 জন্ম মবণেব অতীত হয় । “অনাবৃত্তিঃ শব্দাদনাবৃত্তিঃ শব্দাৎ”
 (৪।৪।২২) কিন্তু প্রতীকোপাসনা হইতে অহংগ্রহ উপাসনা যে
 কতদূর ‘দুশ্চবনীয, তাহা অনায়াসেই বোধগম্য হয় । তাই গীতা
 ভক্তিবোধগাধ্যাবে বলিতেছেন,—“কৈশৌধিকতদ স্তেবাং অব্যক্তাসক্ত
 চেতসাং । অব্যক্তাহি গতদুঃখং দেহবদ্ধিববাপ্যতে ।” দেহাভিমানী
 মানবেব পক্ষে নিগুণ ব্রহ্মভাব প্রাপ্তি নিতান্ত ক্লেশকব । কিন্তু
 এতলে ক্লেশকব হইলেও প্রোক্তভাবকে হেব বলিয়া বর্ণনা করা
 হয় নাই । প্রতিতেও উক্ত পন্থাব দুর্গমতা বর্ণন ববিয়াছেন,—
 “ক্ষুবন্ত নিশিতা দ্ব্যাত্যা দুর্গাং পথস্তং কবযো বদন্তি ।” কিন্তু
 প্রতি প্রমাণে ইহা অসকৃত জানা যাইতেছে যে, নিগুণ ব্রহ্ম-
 স্বরূপাবস্থানই উপাসনাব সংস্কাবসম্পন্ন মানবই তাহাব একমাত্র
 অধিকাবী । জগতে একপ অধিকাবী বডই বিবল । কিন্তু সাধা-
 বশতঃ লোকেব পক্ষে প্রতীকোপাসনাই জ্ঞানবাজ্যে অগ্রসব হইবাব
 প্রশস্ততম উপায় । উপাসনা প্রভাবে সত্ত্বশুদ্ধি হইলে জ্ঞানরাজ্য
 আপনি হইয়া পড়ে । অতএব যে কোন প্রকাবের উপাসনা
 সকলেবই অবলম্বন কবা উচিত ।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশবচ্চন্দ্র চক্রবর্তী ।

বিলাপ।

বল বল স্ববা কবি,
 কোথা' প্রেমময় হবি,
 ধৈবজ্জ ধ'বে সখি। বহি কেমনে ?
 সখিলো পবাণ কাঁদে,
 তাই খুঁজি শ্রাম চাদে,
 সে বিনে ঘুচায় কে মন বেদনে ?
 হৃদি মম জ্বলে যায়,
 শুধু শ্রাম বাবি চায়,
 ঢালিবে সুধাবাশি মম পবাণে।
 সে আমার আমি তাঁয়,
 অন্ত কেহ আপনার,
 ধ্বাতে নাহি হায পোড়া জীবনে !
 কেমনে ববেছে সখি,
 আমি সদা তাঁবে দৈগি,
 ববে গো মম আঁখি তাঁবি স্বপ্নে,
 প্রাণ কাঁদে উভবায়,
 মন-চোবা সে কোথায়,
 ব্যাকুলা আমি বড় শ্রাম বিহনে।
 হৃদাকাশে শ্রামচাঁদ,
 পেতেছে মোহন কাঁদ,
 বিভোলা আমি সদা তাঁরি ছলনে ;
 মোহন মুরলী ববে,
 কুল মান নাহি রবে,
 পাগল কবেছে সে ভব ভবনে।
 সুপ্রভাতে সু প্রভাতে,
 এলে মোব নিকুঞ্জেতে,
 কহিও সখি তাঁবে মিষ্ট ভাষণে,—

সে আমার মন প্রাণ,
 জলাঞ্জলি দিয়ে মান,
 যায়ব যথা যায় তাঁহারি মনে ;
 পেলো আমি বনমালী,
 মাথায় কলঙ্ক ডালি,
 তুলিয়া নিব সখি। অতি যতনে ;
 গাইলে প্রাণেব হবি,
 কিনা পারে ব্রজনারী,
 কেবা না বাসে ভাল মনমোহনে ?
 সারা নিশি ববে যাগি,
 আমবা তাহাবি লাগি,
 কৈ সে আসেনা হেথা আপন মনে।
 মেন মোবা জোর ক'রে,
 লয়ে আসি কবে ধ'বে,
 পাইনা তব মন এত যতনে।
 তাঁহাব নাটক দোস,
 সব (ই) মম ভাগ্য দোস,
 অনেকে তাঁবে চাপ বিশ্ব ভবনে
 শ্যামেব অনেক আছে,
 মোব শুধু শ্যাম আছে,
 তাহারি লাগি তাই ঘুবি বিপিনে,
 শ্যাম হে প্রাণের সখা।
 একবার দাও দেখা,
 ফাটিল বুঝি হৃদি তব বিহনে ;
 অনেক সহেছি হায়,
 অবলায় রাখ পায়,
 পরাণ বঁধু এস কুঞ্জ কাননে।

পেলে সখা তোমা ধনে,	সকলে ত সুখী হয়,
যমুনা বহে উজ্জানে,	পেয়ে তোমা প্রেমময় ।
দীর্ঘ সমীপ দোলে কদম্ব বনে ।	বঞ্চিত আমি কেন তব চরণে ?
হাস্য রবে গাভী সব,	এস এস কালাচাঁদ,
শুনিয়ে মূবলী রব,	দুব কব অবসাদ,
ধায় গো উচ্চ পুচ্ছে তৃপ্ত পবাণে,	ডাকিছে রাখা দাসী তোমাবে বনে ।
	কিরণ ।

মহামায়া ।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পব]

(১২)

সাবদার বাড়ী হঠাতে আসিয়া অবধি মহামায়ার প্রাণে এক দিনেব জন্মও সুখ ছিল না। মহামায়া দেখিল, মোদনীপুত্রের সেই বিপদ নূতন মূর্তি ধবিয়া তাহার বাড়ীর দ্বারে হত্যা দিতে আসিয়াছে। মনের কথা প্রকাশ করিবার লোক নাই—ভাবিয়া ভাবিয়া হৃদয়ভাবে মহামায়া দুই দিনেব মধ্যেই শীর্ণ হইয়া গেল। সাবদার পত্রেব উত্তর দিতে সাহস হইল না, স্বামীকেও পত্র লিখিতে মহামায়াব হাত আসিল না, এই রকমে সপ্তাহ কাটিয়া গেল; মহামায়াকে একাকিনী পাইয়া, চাবিদিক হইতে চিন্তা আসিয়া তাহাব সঙ্গিনী হইয়া বসিল। বালিকার মূর্তিখানিক কিছুতে তাহার দৃষ্টি হইতে অপসৃত হইল না। মহামায়া তাহাকে পুত্রবধু করনা করিয়া ভবিষ্যৎ সংসারের একটা ছবি আঁকিয়া দেখিল। দেখিল সে সংসাবে কত সুখ? মহামায়া বালিকার মার মুখে প্লাম্বীনিদা শুনিয়া, সে স্থান হইতে বতশীঘ্র পারিল পলাইয়া আসিল। আসিয়াই স্থির করিল, বালিকার সমস্ত বিবাহের ব্যয় সে নিজের স্বন্ধে লইলেই সকল গোল মিটিয়া যাইবে। কিন্তু

ষত দিন বাইতে লাগিল, মহামায়া ততই বালিকার স্নেহে জড়ীভূত হইয়া পড়িতে লাগিল। মহামায়া মনে মনে কতবার স্বামীর সঙ্গে ঝগড়া কবিল। সাতদিনের পর আবার তাহার বালিকাকে দেখিবার ইচ্ছা হইল।

পরদিন সারদার বাটীতে যাইতে মনস্থ করিয়া মহামায়া রাত্রে নিজা গেল। ঘুমাইতে ঘুমাইতে স্বপ্ন দেখিল, তাহার প্রাণসম পুত্র শ্রামসুন্দর একটা অদৃষ্টপূর্ব নদীগর্ভে ভীষণ তরঙ্গের মধ্যে পড়িয়া মৃত্যুর সহিত যুদ্ধ কবিতেছে। মহামায়া উন্মাদিনীর মত তীব্র লোকগণের নিকট সাহায্য ভিক্ষা কবিতেছে, কিন্তু কেহই সে প্রকৃতিব ভীষণতার মধ্যে আত্মনিষ্কেপ কবিতে সাহস করিতেছে না। দেখিতে দেখিতে শ্রামসুন্দর অদৃশ্য হইল, লোক সকল হাহাকার কবিয়া উঠিল, মহামায়া মূর্ছিতা হইল; স্বপ্নের মূচ্ছায় মহামায়ার জ্ঞান লোপ পাইল না। মহামায়া দেখিল চারিদিক হইতে লোক তাহার জ্ঞান ফিরাইবার চেষ্টা কবিতেছে; কিন্তু মহামায়া মৃত্যুর দ্বার সমীপস্থা, লোকের সেবায় তাহার জ্ঞান ফিরিল না। ক্রমে লোকজন চলিয়া গেল, তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া দিবাও অন্তহিত হইল। গভীর বাত্রে যখন মহামায়ার জ্ঞান ফিরিল, তখন দেখিল,—একটা জলবালাব হাত ধরিয়া তাহার প্রিয়তম পুত্র তাহাকে ‘মা মা’ বলিয়া ডাকিতেছে। “শ্রামসুন্দর তোমাব পার্শ্বে উঠি কে ?” শ্রামসুন্দর বলিল ‘নলিনী’।

স্বপ্নের তাড়নায় মহামায়ার ঘুম ভাঙিয়া গেল। তখন ভোর হইয়াছে, কাক কোকিল ডাকিতেছে, মহামায়া উঠিয়া বসিল। কিন্তু বোধ হইল, স্বপ্ন তাহার মস্তিষ্কের চারিদিকে এখনও পাক খাইতেছে। মহামায়া জাগিয়াও শুনিতে পাইল, “নলিনী।” মহামায়া কাপ বাড়াইয়া দিল। অশ্রাব শুনিল—“নলিনী কোথায় গেলি ?” মহামায়া শয্যা হইতে উঠিল, ঘরের দ্বার খুলিল। বাহিরে পাকী-বাহকের মুহু কোলাহল শুনিতে পাইল।—ভৃত্য সনাতন উপরে আসিয়া বলিল—“মা ! পিসিমা আসিয়াছে।”

মহামায়া বিস্ময়েন হস্ত হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে না করিতে নীচে দেখিল—সারদা সেই কত্যাটিকে লইয়া গৃহ প্রবেশ করিতেছে ।

মহামায়া ছুটিয়া উপর হইতে নামিয়া গেল, এবং বালিকাকে ধরিয়া কোলে তুলিয়া, সাগ্রহে তাহার মুখচুম্বন কবিল । তার পর এক হাতে সারদার হাত ধরিয়া, অপর হাতে নলিনীকে কোলে বাধিয়া উপরে ফিবিয়া আসিল ।

সারদাসুন্দরী মহামায়াকে দেখিয়াই কত কথা বলিবে, কত তিরস্কার করিবে, মনে মনে কল্পনা কবিয়া, সারাটা পথ ঝগড়ার একটা পাকা মুখবন্ধ করিতে করিতে আসিতেছিল । আব নলিনীকে মহামায়ার উপর তাহার আধিপত্যের কথাটাও বিশেষ করিয়া বুঝাইতেছিল । মহামায়াব বাড়ীতে ও তাহার নিজের স্বস্ত্রালয়ের শুধু ইট কাঠেব তফাৎ এটা নলিনীকে, অতীতের গল্প মালায় বিশেষ করিয়া হৃদয়ঙ্গম করিয়া দিয়াছিল, নলিনী বুঝিয়াছিল—পিসিমাব এক বাড়ী হইতে যেন তাহার আব এক বাড়ী চালায়াছি । সেখানেও সমান আদর, সমান যত্ন, সেখানেও তাহার বউদিদিব প্রতাপে, গৃহেব অত্যাগ্র পবিবাব বর্ণ শশব্যস্ত ।

কিন্তু মহামায়াকে দেখিয়া, ও তাহার ভাব লক্ষ্য কবিয়া সারদাসুন্দরীর কথা ফুটিল না । মহামায়ার চক্ষু দিয়া দরদর ধাবে জল ছুটিয়াছিল ।

সারদা শুদ্ধমাত্র বলিল—“তুমি আজ যাইবে, কাল যাইবে করিয়া প্রত্যাশে বসিয়া বহিলাম । যখন দেখিলাম, কিছুতেই আসিলে না, তখন তোমার নূতন মেয়েটিকে কাজে কাজেই লইয়া আসিলাম ।”

মহামায়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল, “বেশ করিয়াছ । তুমি আমার জীবন-দায়িনী ।”

সারদা আর একবার মহামায়াকে ভাল করিয়া দেখিল । মহামায়া শীর্ণ হইয়াছে ।

(১৩)

সমস্ত দিন মহামায়ার সহিত সাবদার অনেক কথা হইল। সমস্ত ব্যাপার বিষদকপে বুঝিয়া সমস্তা মীমাংসাব সমস্ত ভারটা নিজের ক্ষেপে লইল। নলিনীকে শ্রামসুন্দরের হস্তে সমর্পণ করিবার ইচ্ছা তাহাব হৃদয়ে এত বলবতী হইয়াছিল যে, সে কৃষ্ণধনকে যে কোন উপায়ে তাহার মতাবলম্বী করাই সে স্থির সিদ্ধান্ত করিল। নহিলে সে আর তাহাদের সহিত সম্পর্ক রাখিবে না। স্বামী প্রতিবাদ কবিলে তাহারও সহিত আর বাক্যালাপ করিবে না। বলুক লোকে তাহাকে অকৃতজ্ঞা, বলুক তাহাকে নাবী-শুলভ ধীরতা বঞ্চিতা স্বাধীন। সারদা মীমাংসা কবিবার পূর্বে মনে মনে করিল— কেন, কুল ভাঙিলে ক্ষতি কি ? ইংবাজী শিক্ষাব প্রাচুর্ভাবে ইংবাজী ভাবাপন্ন সমাজে, কুলকর্ম্ম-তাগী ধর্ম্ম-তাগী নিত্য যবন পদলেহী বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেব মধ্যে আবাব সেই পুর্বাতন বল্লালী প্রথা কেন ? বাপ হাকিমী কবিতোছে, ছেলে উপযুক্ত শিক্ষা পাইতেছে—তাহাদের আবাব কুল গোববে কি অধিক গৌরব বৃদ্ধি হইবে ? আব নলিনীব সহিত বিবাহ দিলে কুলটাও একেবারে রসাতলে যাইতেছে না ; বড জোর ভঙ্গ হইবে। কুলেব মর্যাদা নষ্ট হইতে পাঁচ ছয় পুরুষ লাগিবে। শ্রামসুন্দবেব পর পাঁচ ছয় পুরুষ। ততদিনে ওলাউঠা ম্যালেরিয়া দুর্ভিক্ষ প্রপীড়িত বাঙ্গালায়, বাঙ্গালী থাকিবে কি ? সাবদা কৃষ্ণধনেব ভ্রম বুঝিল, তাহাকে মূর্থ পণ্ডিত স্থির কবিল। আব শ্রামসুন্দব নলিনীব একত্র বন্ধনে একটা সোণাব সংসারের ছবি দেখিতে দেখিতে পাড়ায় বেড়াইতে গেল। তখন সন্ধ্যা হয় হয় হইয়াছে।

সন্ধ্যার সময় নলিনী বাড়ীব সম্মুখস্থ ছোট একটা ফুলেব বাগানে বেড়াইয়া বেড়াইয়া ইচ্ছামত ফুল তুলিতে ছিল। সনাতন জিনিসপত্র আনিতে হাটে গিয়াছে। পাটিকাব অশুখ হইয়াছে বলিয়া, মহামায়া রন্ধনের উদ্যোগে আছে। কাজেই বালিকা বাগানেই রহিল। বহুক্ষণ কেহ আর সন্ধান পাইল না।

ঠিক সেই সময় কৃষ্ণধন কলিকাতা হইতে বাটী ফিরিতে ছিলেন। তাহাব সঙ্গের ভৃত্য কলিকাতা হইতে আনীত দ্রব্যাদি আনিবার ব্যবস্থায় দূরে পড়িয়াছিল। কৃষ্ণধন একাই বাড়ী আসিতে-ছিলেন। বাটীর সম্মুখে উপস্থিত হইয়াই তিনি দেখিতে পাইলেন, তাহার ছোট বাগানটীতে একটি সোণার ফুল ফুটিয়াছে।

কৃষ্ণধন প্রথমে বিস্মিত হইলেন। বিস্ময় দেখিতে দেখিতে শঙ্কায় পরিণত হইল। কৃষ্ণধন বুঝিলেন, মহামায়া আবার বিভ্রাট বাধাইয়া বসিয়াছে! বিভ্রাট—কেন না কৃষ্ণধন কলিকাতায় শ্রাম-সুন্দরের একটা বিবাহের সম্বন্ধ স্থির কবিয়াছেন। তিনি পাকা দেখিয়াছেন, আগামী কল্য ভাবী বৈবাহিক তাঁহাব গ্রামে আসিয়া পাকা দেখিয়া যাইবেন।

বালিকা আপন মনে ফুল তুলিতে ছিল, আর কৃষ্ণধন দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে ছিলেন, আর মহামায়া কি কবিল, নিজেইবা তাড়াতাড়ি কি করিয়া ফেলিয়াছেন, ভাবিতেছিলেন। তিনি মনে মনে বলিলেন “সম্বন্ধ স্থির কবিবার পূর্বে অন্ততঃ মহামায়াকে সংবাদ দিলে ভাল হইত।”

সহসা বালিকার দৃষ্টি কৃষ্ণধনের উপর পড়িল। অন্তঃসমনোমুখ অরুণ আভায় সুবর্ণ-রাগ-রঞ্জিত, অতঙ্গী-বর্ণা বালিকার মুখ-মণ্ডলশ্রী কৃষ্ণচন্দ্রের তারকাযুগল ভেদ করিয়া হৃদয় মধ্যে প্রবেশ করিল। বালিকা কে-ত-কে আসিয়াছে ভাবিয়া, আবার ফুল তুলিতে আরম্ভ করিল।

কৃষ্ণধন জিজ্ঞাসা করিলেন—“তুমি কাদের বাড়ীর মেয়ে গা!”

নলিনী মুখ ফিরাইয়া ইঙ্গিতে কৃষ্ণধনের বাড়ী দেখাইয়া দিল। তার পর আবার ফুল তুলিতে বসিল। চঞ্চল পদে এদিক ওদিক চাষিদিগ স্বরিতে ঘূষিতে সজ্জারাগরঞ্জিত আকাশ তলে, গোলাপ মল্লিকাদি পুষ্প শোভিত উদ্যানটীর সমস্ত শোভা নিজের ক্ষুদ্র অঙ্গটীতে পূরিয়া, সেই ক্ষুদ্র বালিকা কৃষ্ণধনের অন্তরের স্তরে স্তরে ইঙ্গিরের অহুপভোগ্য এক অপূর্ণ আনন্দের প্রতিষ্ঠা করিয়া বসিল,

কৃষ্ণধন গলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, কি করিলাম! মহামায়া পুত্রের শুভাকাঙ্ক্ষিনী, যদি শ্যামসুন্দরের জন্তই এই কষ্টা আনিয়া উপস্থিত করে, তা হইলে ত তাহাকে বলিবার কিছুই নাই। কৃষ্ণধন আবার প্রমাদ গণিলেন। আবাব বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন;—“এ বাড়ীতে তোমার কে আছে।”

বালিকা বলিল—“মা।”

কথাটা কৃষ্ণধনের পক্ষে হেঁয়ালিব মত ঠেকিল। আর কোন কথা না কহিয়া, তিনি বাড়ীতে চলিয়া গেলেন।

বাড়ীতে প্রবেশ মাত্রই মহামায়াব সঙ্গে তাহার সাক্ষাৎ হইল, কৃষ্ণধন দেখিলেন, মহামায়া ক্রুশা ও মলিনা হইয়াছে। কিন্তু কাবণ জিজ্ঞাসা করিতে তাহার অবকাশ হইল না। আব মহামায়াকে গ্রামসুন্দরের কুশলাদি জিজ্ঞাসা করিতে দিতে তাহার সময় হইল না। কৃষ্ণধন একেবাবে জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বাহিরে যে কষ্টাটিকে দেখিলাম, ওটা কে?” মহামায়া মুহূ হাসিল, আব বলিল—সাবদা আসিয়াছে, তাহাব কাছেই সমস্ত স্তনিতে পাইবে; আমি বলিতে পারি না।”

কৃষ্ণধন আবাব বলিলেন—“বালিকার মুখে শুনিলাম, এ বাড়ীতে তাহাব মাও আসিয়াছে।” মহামায়া আবাব হাসিল, আর বলিল—“মা আইসে নাই। তাহার মা এই বাড়ীতে ববাববই বাস করিতেছে।

ক্রমে প্রহেলিকাৰ মীমাংসা হইল। কৃষ্ণধন বুঝিলেন—“মহামায়া যে কৃষ্ণ ধনের স্ত্রী, মেয়েটা কেমন কবিয়া জানিতে পারিয়াছিল। জানিয়া অন্তঃপুৰুষা মহামায়ার উদ্দেশে “মা মা” করিয়া কাদিতে কাদিতে, তাহাদের গ্রামের চারি ধাবে ঘূৰিত। শেষে পথ ভুলিয়া কেমন করিয়া মহামায়ার গৃহে আসিয়া পড়িয়াছে। সুতরাং তাহাকে কোন্ গৃহস্থ কষ্টা আশ্রয় না দিয়া থাকিতে পারে?”

কৃষ্ণধন কতক কতক খেন বুঝিয়া একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিলেন। বলিলেন—“মহামায়া। এমন সুন্দর বালিকা আমার চক্ষে ঠেকে নাই। ছুঁমি যে ইহাকে পুত্র-বধূ করিবার জন্ত গৃহে আনিয়াছ, আমাব মত

লইবার অপেক্ষা কর নাই, ইহাতে তোমাব কোনও দোষ দেখিতে পাই না ; অধিকন্তু তোমার পছন্দের প্রশংসা করি। বলিতে কি মহামায়া ! বালিকার সৌন্দর্য্য দেখিয়া আমি পর্য্যন্ত বিমুগ্ধ হইয়াছি। কিন্তু বড়ই হুঃখের কথা, তোমার এ অনুরোধ রক্ষা করিতে পারিলাম না।

সাগ্রহে মহামায়া জিজ্ঞাসা করিল—“কেন ?”

কৃষ্ণধন বলিলেন—“আমি শ্রামশূন্যের সম্বন্ধ স্থির করিয়া আসিয়াছি। কাল তাহারা পাকা দেখিতে আসিবে।”

মহামায়ার মুখ আবার বিবর্ণ হইয়া গেল। কিন্তু আর কোনও কথা না বলিয়া শুদ্ধ মাত্র স্বামীকে বিশ্রাম লইতে অনুরোধ করিল। কৃষ্ণধন উপবে গেলেন। মহামায়া আবার কৃষ্ণধনের আগমনে আহাবাদির নতন ব্যবস্থায় প্রবৃত্ত হইল। [ক্রমশঃ]

শ্রীকীবোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য ।

কাল-যন্ত্র মাহাত্ম্য ।

<p>১ কে তুমিগো ধবাধামেআসিলে ছলিতে সুধাই তোমাবে, ছুটে ছুটে কেন বল, বাতিদিন অবিবল, খুঁজিছ অমূল্য নিধি বিশ্বের মাঝারে সেই তব তুমি বিনা কে বুঝিতে পাবে</p>	<p>৩ আমাব(৩)জীবনে আর আনন্দ তুফান উঠে না কখন, শৈশবের হাসি খেলা, ঘুচেছে শৈশব বেলা, কিশোর বয়সে দেখি নীরদ ভীষণ, আবরিল এক কালে তব জীবন।</p>
<p>২ তুমি কি আমাব মত হুঃখী কোনজন এ ধবলী' পবে, তাই ঘুব অনিবার, লইয়া হুঃখের ভাব, নিশিদিন একমনে প্রাশস্তিত তবে, অবশ্য মিটিবে সাধ কিছুকাল পরে।</p>	<p>৪ আর কি উদ্দিবে কতু শারদ চক্রমা হৃদয় গগনে, আর কি জ্যোছনা রাশি, ঢালিবে পীযুষ রাশি, কেমনে বিকাশ পাবে মেঘ আবরণে, এ মেঘ কি সরে কতু প্রচণ্ড পবনে?</p>

৫
না না মিছেকেনতোবে পাগলেবপ্রাণ
নিজ দলে টানি,
হুঃখী নও তুমি সত্য,
লঘেছি তোমাব তন্তু,
সাধে কি ঘুবিছ তুমি দিবস যামিনী,
আছে গুট হেতু তার আমি তাহা জানি

৬
কালের কুটিল তন্তু শেখাতে মানবে
এসেছ হেথায়,
কালের কবাল কোলে,
কেমনে মানব থেলে,
কোথাবাতাহাবআদিঅন্তবা কোথায়,
তুঁষিই রহস্তভেদ কবিলে ধরায়।

৭
কিনামে ডাকিলে তোএ অন্তরেবভাব
সকল (ই) বুঝায়,
“ঘড়ী”টা যে ছোট কথা,
মরমে বহিল ব্যথা,
হৃদয়ের ভাষা কভু লেখা নাহি যায়,
বড়ই রহিল ব্যথা এ জীবনে হায়।

৮
ধীরে ধীরে দিবারাতি চলিছে তোমাব
ঘুগল চরণ,
নাহিক ভাবনা কিছু,
কভু না হাঁটিছ পিছু,
অগ্রসর—এইমাত্র মন্ত্রেব সাধন,
সদাই করিছ তুমি শরীর পতন।

৯
শান্তিময়ী সহিষ্ণুতা একাধাবে তোমা’
সতত বিবাজে,
কভু ত হওনা শাস্ত,
ঘুবে ঘুবে দেহ অন্ত,
তথাপি শিথিলভাব আপনাব কাজে,
কভু না লক্ষিত হয় ঘুরণেব মাঝে।

১০
তোমার দৃষ্টান্ত সব দেখে মুচ নবে
দেখে ত শিখেনা,
নিজের কাজের বেলা,
সদা কবে অবহেলা,
কভু ত উন্নত আশা হৃদয়েতে ধবেনা,
বৃথা কাজে সদাব্যস্ত আসলে ছিলনা।

১১
তুমিত শেখাও নরে, চলছে সময়
নাহি তাব সীমা,
অনন্তেব তুমি ছায়া,
অনন্তে বিলীন কায়া,
এ নশ্বর ধবামে অনন্ত প্রতিমা,
সান্ত নরে কিবা জানে অনন্ত মহিমা!

১২
তুমি হে জগদ্বন্ধু, সাধিতে বিশ্ববহিত
তোমাব জীবনে,
যে দণ্ড যে কাজ নবে,
করিতে বাসনা ধরে,
সে দণ্ড আদিলে তুমি জানাও তখন,
তোমাসম হেন বন্ধু আছে কোনজন?

১৩	১৫
তুমি হে মমের দূত হবিত্তে সবাবে হেথা আগমন, প্রতিপলে কাঁটা সবে, মানব জীবন হ'বে, ক্রমশঃ নে'ষাও তুমি শমন ভবন, তোমাসম হেন শত্রু আছে কোনজন	এসব ভাবনা কভু উঠে না হৃদয়ে ধকিতে তোমায়ে, ধবিলে তোমায়ে বৃকে, নাহি লাজ ছোট মুখে, সবম না পায় স্থান সবাব মাঝাবে, তোমার বদনখানি সতত নেহাবে ।
১৪	১৬
বাখে ত পৃকষে জানি হৃদয় মন্দিবে বমণী বতন, এইমাত্র বিদ্রু তায, নিবজ্ঞান স্থান চায, সকলেব মাঝে তায হৃদয়ে ধাবণ, সবমেব মাথা থেয়ে পাবে কোনজন ?	ধন্য এই ধরাধামে ওহে ক্ষুদ্র জীব তোমাব জীবন, এইরূপ চিবকাল, দেখাও অনন্তকাল, এই বেলা কব সবে কার্য্য সম্পন্ন, কিছু নাহি বাকিবয় আসিলে শমন । শ্রীগোপালকৃষ্ণ ঘোষ ।

জীবনের নাট্যাভিনয় ।

ভাই নব্যযুবক ! নগরের নাট্যশালায় নিত্য নূতন পয়সা খরচ কবিয়া কত নব্য, নূতন নাটকের নাট্যাভিনয় দেখিয়াছ ও দেখিতেছ—
দেখিয়া ভাবেব বিভ্রমে কখন কখনও হাঁসিয়াছ, কখনও কাঁদিয়াছ, কত প্রেমিক প্রেমিকাব প্রেমের পশরা প্রাণ ভবিয়া আশ্বাদন করিয়াছ, কত সং ঢং ও রং তামাসা দেখিয়া হৃদ মজা পাইয়াছ, আবার কত বিরোগান্ত নাটকেব বিরোগ বিধুবা বালার বিরহ, বিচ্ছেদ বিলাপ পবিত্রাপেব অভিনয়ে নীরবে অশ্রুপাত কবিয়াছ, আর অভিনেতা ও অভিনেতৃগণের অভাবনীয় ভাব বৈচিত্রে অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করিতে করিতে গৃহে প্রতিগমন করিয়াছ ।

কিন্তু গৃহে গৃহে আমাদের জীবন নাটকের যে নিত্য নূতন

অভিনয় হইতেছে, তাহা কি কখনও দেখিয়াছ'?, এই বিশাল বিশ্ববিস্তৃত রঙ্গমঞ্চ প্রকৃতির অত্যদ্বুত পট-পরিবর্তনে আমাদের জীবন নাটকেব যে জীবন্ত অভিনয় হইতেছে, তাহা কি কখনও সন্দর্শন করিয়াছ? এ অভিনয়ে যে হাসি কান্না, হর্ষ বিষাদ, ও সুখ দুঃখের বিচিত্র সমাবেশ আছে, তাহা দেখিয়া কখন কি কাঁদিয়াছ, হাসিয়াছ? সংসারের এ অভিনয়ের নিত্য নূতন অভিনব অঙ্কে বং তামাসা সকলই বর্তমান। যদি এই মবজ্ঞগতের মরম বেদনায় স্বীয় মর্শ্মগ্রস্ত্রী শীথিল করিবার বাহা থাকে, যদি বিখ প্রেমিকেব প্রেম প্রবাহে হৃদয় পবিত্র করিবার সাধ থাকে, যদি অসাব সংসারের সাব বস্তব সমাস্বাদ করিবার ইচ্ছা থাকে, যদি পবাংপবের পবিত্র প্রেমের সুধা আশ্বাদনে অগ্রসব হইতে চাও, তাহা হইলে এই প্রকৃতির পট পরিবর্তনে মানব জীবনের যে অভিনয় অহরহ হইতোছ, তাহা একবার প্রাণ ভরিয়া সন্দর্শন কর।

ঐ দেখ, হীরক খচিত স্তনীল চন্দ্রাতপের নিম্নে বিশাল বিশ্ব মঞ্চ বিস্তৃত রহিয়াছে, আর ওই প্রদীপ্ত দীপশিখা নীল চন্দ্রাতপে লীন থাকিয়া উজল আলোকে বঙ্গমঞ্চ আলোকিত করিতেছে, ঐ আলোকে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রাতপের চন্দ্র সদৃশ হীবক খণ্ড সমুদ্র কেমন ধক্ ধক্ জলিতেছে। আব ওই যে প্রকৃতি দৃশ্য পট কত নদ নদী সবিৎ-সাগর বন উপবন প্রান্তর পুলিন বক্ষে ধাবণ করিয়া ভাবুক দর্শকের দর্শনে-জ্বিয়ের পরিতৃপ্তি সাধন করিতেছে, নিম্নে দেখ কলকণ্ঠে কুজনকাবী বিহঙ্গকুল স্রমধুর স্রবতান লয়ে তান ধরিয়া ঐক্যতান বাদ্যে উৎসুক দর্শকবৃন্দের উৎসাহ বর্ধন করিতেছে।

কালের আবর্তনে একটাব পর একটী করিয়া প্রকৃতির দৃশ্য পট উঠিতেছে ও পড়িতেছে, আব এই ব্যবধান সময়ের মধ্যে মানব জীবনের এক একটী অঙ্কের অভিনয় হইয়া যাইতেছে! ক্ষণেক অপেক্ষা কর, এই জীবন নাটকের অভিনয়ে কত "তাজ্জব ব্যাপাব" কত "পঞ্চরং" কত "আনন্দ রহো" কত "নিরানন্দ রহো" আর কত বকম "বিভ্রাট" দেখিয়া তোমাব চিত্ত বিভ্রম জন্মিবে, তখন বুঝিতে

পাবিবে, ইহাতে কত “হৃদ মজা” কত প্রফুল্লতা, কত ডিগ্রী “ডিগ্‌মিস্” আর বং বেরঙ্গের প্রহসন নিহীত আছে ।

অভিনয় দর্শন করিবাব পূর্বে নাটক খানির কিঞ্চিৎ পবিচয় আবশ্যক, অন্ত্যথা অভিনয় দর্শনের আমোদ সম্যক অনুভূত হয় না ।

আমাদের “জীবন নাটক” খানি প্রধানতঃ পাঁচ অঙ্কে বিভক্ত, তবে প্রত্যেক অঙ্কেই অবশ্য কতিপয় গভীরা আছে । নাটক খানির প্রারম্ভে আশা, উৎসাহ, উদ্যমেব সম্যক আবেগ আছে ; মধ্য ভীষণ সংগ্রাম, বিভিন্ন ভাবেব সমাবেশ ও অনেক রকম প্রহসনের প্রবাহ আছে, কিন্তু শেষে নাটক খানি বিয়োগান্ত নাটকেই “Tragedy” পর্য্যবসিত হয় । ইহাব শেষাঙ্গ বড়ই Pathetic.

আমাদের জীবন নাটকেব অভিনয়ে প্রোগ্রাম, হাণ্ডবিল্ প্রভৃতিরও বিশেষ বন্দোবস্ত আছে, আর সেই হাণ্ডবিলে নাট্যকাবের নাম ধাম সুবর্ণ অক্ষরে খোদিত আছে । কাল সকাল, সন্ধ্যায়, প্রাস্তরে, পর্কতে, পুনিনে এমন কি গৃহে গৃহে সেই সুন্দর সজ্জিত প্রোগ্রাম সকালব চক্ষেব সামনে ধবিষা দিতেছে, কিন্তু হায় আমরা তাহা পড়িতে পাবি না—আমবা সে অক্ষব চিনি না—আমবা সেই মহান্ নাট্যকাবের প্রতিবিম্ব প্রোগ্রামের গাত্রে, হাণ্ডবিলের প্রত্যেক ছত্রে অঙ্কিত দেখিয়াও তাঁহাকে চিনিতে পাবি না ।

ওই দেখ, প্রথম দৃশ্য পট উত্থিত হইয়াছে ; দেখ দেখি, স্নেহময়ী, স্বর্গীয় সরলতার আদর্শকপিনী ওই মোহিনী মৃতিব অঙ্কে কেমন সুন্দর স্নেহেব পুতলী আপন আমোদে আপনি বিভোব হইয়া ক্ষুদ্র হস্ত পদ সঞ্চালনে কেমন ক্রীড়া করিতেছে, আর মধ্যে মধ্যে পরমেশ প্রেম প্রকাশক পবন পীণুব পান করিয়া পরমানন্দে নৃত্য করিতেছে ; আহা কি স্বর্গীয় ভাব ! স্বার্থত্যাগে কি সুন্দর দৃশ্য, স্নেহের কি সুন্দর বিকাশ, স্বভাবের কিসুন্দর সৃষ্টি ! জননী ওই স্নেহের পুতলীকে, দেখ কত সযতনে লালন পালন কবিতেছেন, কত আদরে কত সোহাকে তাহাব সাস্থনা বিধান করিতেছেন । এই স্বাভাবিক দৃশ্য কি মনোহর নয় ?

এই শৈশবভিনয়ই—আমাদের জীবন নাটকের প্রথম অঙ্ক। ইহাব কয়েকটা গর্ভাঙ্কে ওট শিশু ক্রমশঃ বলিষ্ঠ ও বয়োপ্রাপ্ত হইয়া ধাবন কুর্দন, অম্লকষণাদি নানা বিষয়ের অভিনয় করিতে তাহাব বাল্য জীবনের অবসান কবিতোছে—

এই বার দ্বিতীয় দৃশ্য। ঈশ্বং, শ্রুশ্র বাজি সমন্বিত নব্যযুবক, সুন্দর সজ্জিত হইয়া সতেজে, সোৎসাহে রঙ্গমঞ্চে বিচরণ করিতেছেন, আর নবীন উৎসাহে আশাব কুহকিনী শক্তিতে সকল দিকে দৃষ্টিপাত পূর্বক কখন এক দিকে, কখনও অত্র দিকে গমন করিতেছেন। উদ্যম আছে অথচ যেন অধ্যবসায় নাই, উৎসাহ আছে অথচ যেন লক্ষ্য স্থির নাই, মনের বল আছে অথচ যেন মনস্তেব স্থিৰতা নাই; প্রাণের পিপাসা আছে অথচ যেন মিটাইবার স্থান নাই। এই অঙ্কেব অভিনয় জীবন নাটকের কঠিনাংশ; এই সময়ের চাক্ষুশ, এই সময়ের আবেশ, এই সময়ের ভাব বেশ বজায় রাখিয়া দর্শকেব আশায়ুৰূপ অভিনয় করা বড়ই কঠিন। ওই দেখ বিপুল প্রবল প্রতাপে তাহার চতুর্দিক বেষ্টিত করিল, যেন বীর বালক অভিনয়্য সপ্তবধী পরিবেষ্টিত হইলেন। যুবকে তুমি এই অঙ্কে ও ইহার অন্তর্গত কয়েকটা গর্ভাঙ্কে অধিকাংশ সময়েই ভীষণ সংগ্রামে লিপ্ত থাকিতে দেখিতে পাইবে।

আবার দেখ এই অঙ্কেব একটা গর্ভাঙ্কে ওই যুবক নায়ক, নায়িকার সহিত মিলিত হইল, দুইটা প্রাণ যেন মিলিয়া একটা হইয়া গেল, উভয়েব বলে উভয়ে বলীয়ান হইয়া আবার নূতন উৎসাহে জীবনের আহবে ঝাঁপ দিল। যুবক, ওই দেখ, কখনও ঘোরতর যুদ্ধ করিতেছেন, কখনও পদস্থলিত হইতেছেন, আবার পুনরায় উষ্ণিয়া বিপুল বিক্রমে শত্রুকুল নিশূল করিতেছেন। এ দৃশ্য কি ভীষণ, এ অভিনয় কি তেজোপূর্ণ, তোমার যদি Capital বা Excellent বলিয়া হাঁক মারিবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে এই সময়েই সে সাধ পূরণ কর, আর করতালি প্রদানই যদি অভিনয়ের ঐকর্ষ জ্ঞাপক হয়, তাহা হইলে এ সময়েই একবার সজোরে শব্দ করিয়া লও, কারণ এই অঙ্কে ও ইহার গর্ভাঙ্ক প্রেম পিরীতের ছড়াছড়ি, নয়নবাণের হানাহানি

বিরহ বিচ্ছেদের কাঁদাকাঁদি এবং আদান প্রদানের বাড়াবাড়ি ছড়াছড়ি সমস্তই আছে—আবার যুদ্ধক্ষেত্র, ভীষণ সংগ্রাম, “হাহতোশ্বি” উত্থান পতন, লক্ষন, রম্পন—তাঁহাও আছে ।

দেখিতে দেখিতে দ্বিতীয় দৃশ্য অদৃশ্য হইল, ভবিষ্যের যবনিকা উন্মোচিত হইয়া জীবন নাটকের তৃতীয় দৃশ্য তোমার দৃষ্টিপথে পতিত হইল । ইচ্ছাতেও সেই দম্পতি নায়ক নায়িকা ; তবে নায়ক নায়িকাব চলনে বলনে, গমনে উপবেশনে পূর্ব ভাবের কিঞ্চিৎ পরিবর্তন লক্ষিত হইতেছে । আব যেন সে তেজ, সে উৎসাহ, সে উত্তম নাই ; বিষাদ কালিমায় মুখশ্রী শ্রীভ্রষ্ট, গভীর চিন্তায় কপোল কুঞ্চিত, আর সর্বাবয়বে যেন কি মরম বেদনার মধ্যস্থিত ভাব মাথান বহিষ্কৃত । এখন বিষম বিষাদ বিষে জর্জরিত হইয়া দম্পতি দারুণ কষ্টে অগ্রসর হইতেছেন, স্বল্পে কতকগুলি শিশু সন্তান,—তথাপি কিন্তু পশ্চাদপদ নহেন, শোণ-পণে অরাতি নিধন সাধন কবিত্তে কবিত্তে স্বীয় গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছেন । কখনও অতিশয় শ্রান্ত ক্লান্ত হইয়া ক্ষণকাল উৎবেশন করিতেছেন ; আবার স্নানাবগণেব প্রতি সন্মুখে দৃষ্টিপাত করিয়া আবার যেন নূতন বলে বলীয়ান হইতেছেন । এ দৃশ্যে নায়কেব নিত্য নূতন সাজ সজ্জা সরঞ্জাম ; অবস্থানুসাবে তাঁহাকে কত বকম সাজ পোষাক, চলন, বলন, ও অঙ্গ ভঙ্গিমার ব্যবস্থা করিতে হইতেছে । ইহাব অভিনয়ে, ওই দেখ, কখনও পাষণ গলিতেছে, আবার কখনও হাসিব কোয়ারা ফুটিতেছে ।

কিয়ৎক্ষণ পবে এ দৃশ্যপট দৃষ্টির অতীত হইল, আবার নূতন আঙ্গুর অভিনয় । ওই দেখ গলিতকায়, শুভ্র কেশ বৃদ্ধ সুধশয়নে শায়িত হইয়া সহাস্র বদনে সমাগত জনগণেব সহিত কত গল্প গুজব ও মুহুমুহু বুঝ পান কবিতেছেন—রণরাস্ত্র মহাবীর ভীম যেন শবশযায় শয়ন করিয়া সমাগত আত্মীয়বর্গকে রাজধর্ম শিক্ষা দিতেছেন, আর মধ্যে মধ্যে মহিমার্গবেব মাহাত্ম্য বর্ণনায় বর্ণনাতীত সুখের আনন্দ লাভ করিতেছেন । এ দৃশ্যে নায়কের সে কৌশল, সে কার্য্য পটুতা, সে উত্তম উৎসাহ, সে রঙ্গ ভঙ্গ কিছুই নাই, আছে কেবল—সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার

সার গর্ভ উপদেশ—আর আছে—বিশুদ্ধ ঐশী প্রেম, বিমল আনন্দ ;
আব বিগত বিষয়ের অলুতাপ । ফল কথা এ দৃশ্যে অভিনয়ে দর্শনীয়
অপেক্ষা শিক্ষনীয় বিষয়ই অধিক । অতএব তুমি মনোযোগের সহিত
সেই মনোহর মধুর অভিনয় দর্শন ও শ্রবণ কর ।

অধৈর্য্য হইওনা, এই বার জীবন নাটকেব শেষাঙ্ক অভিনীত
হইবে । কিন্তু অহো ! সে দৃশ্য—সে শোকাভিনয় আব দেখিয়া কাজ
নাই ; শেষ না দেখিলে—তোমাব অভিনয় দর্শন অপূর্ণ থাকিবে ।
অতএব আব একটু অপেক্ষা করিয়া “জীবনের চবম অবস্থা” আমাদের
“শেষের সে দিন” দর্শন কর ।

যে মেহের পুতলীকে সযত্নে মাতৃ অঙ্কে পবিত্রীকৃত হইতে দেখিয়া-
ছিলে, যে সুন্দর সুপুরুষ যুবাযুৱকে সংসারের ভীষণ সংগ্রামে উন্মত্ত
হইতে দেখিয়াছিলে, যে শাস্ত দাস্ত গম্ভীর শ্রোচকে সোণার সংসারের
মধ্যে সুখ শয়নে শায়িত দেখিয়াছিলে, আজ সেই দেহ, জীর্ণ শীর্ণ যুৱব-
লুপ্তিত ;—সংসারের খেলা সাক্ষ হইয়াছে । সাক্ষান বাগান পড়িয়া রহিল,
পুত্র কলত্র নেত্রনীরে ভাসিতে লাগিল, আব প্রাণ পাখী দেহ-পিঞ্জর
পরিত্যাগ করিয়া উড়িয়াগেল, ওই দেখ মৃত দেহ মহাশ্মশানে আনীত
হইল, চিতাঘি জলিয়া উঠিল—আর ক্ষণেকের মধ্যে এই ক্ষণ ভস্ম
দেহের অবদান হইল—সব ফুবাইল—পঞ্চভূতের বিচিত্র ব্যাপারে অনন্ত
কাল সাগরে যে জলবিহুটী উথিত হইয়াছিল, তাহা কিয়ৎক্ষণ পরে
কাল সাগরেই লীন হইল—বাহাতে উৎপত্তি, তাহাতেই নিবৃত্তি ; যেমন
ভাবে গঠিত হইয়াছিল, আবার তেমনি কবিয়া মিশিয়া গেল ।

চিতাঘি নিবিল—পাচে পঞ্চ মিশাইল, আত্মীয় স্বজন, শেষের
সম্বল সেই “হরিনাম” উচ্চারণ করিয়া গৃহে প্রতি নিবৃত্ত হইল, আমাদের
জীবননাটকের অভিনয়ও শেষ হইল ।

এই অভিনয় সম্বন্ধে একটু মন্তব্য প্রকাশ করিয়াই তোমাকে বাটী
বাইতে দিব, কাণে বাজি অনেক হওয়ায় বোধ হয়, তুমি অত্যন্ত অধৈর্য্য
হইয়াছ । অবস্থা ভেদে এই জীবন নাটকেব অভিনয় হইয়া থাকে,
তোমাকে বাহা দেখাইলাম, প্রত্যেক অভিনয়েই যে ঠিক এইরূপ হয়

তাহা মনে করিও না। তবে যাহা সচরাচর অভিনীত হয়, তাহাই
অন্ত ভোমাকে দেখাইলাম।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

স্বরলিপি।

ভৈরবী—যৎ।

কথা—শ্রীগিরিশঙ্কর ঘোষ।

স্রব—শ্রীরামতাবণ সান্মাল।

ছাড়ি যদি দাগা বাজী কৃষ্ণ পেলেও পেতে পাবি।

আমি কি পাববো বাবা দেখি বেয়ে পারি হারি ॥

যদি কেউ বাংলাে দিতো, এমন লোক দেখলে হতো,

দাগাবাজীৰ উপব বাজী খেলা বড় বিষম ভারি ॥

আশ্বারী।

গা গা গা গা সাঁ নি নি সাঁ গা গা গা
ছা ডি য দি দা গা বা

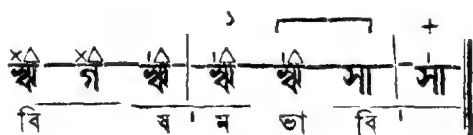
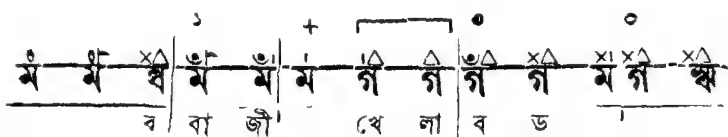
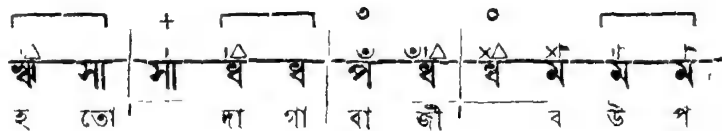
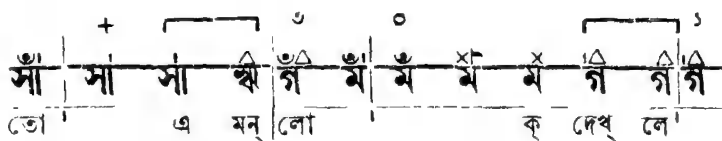
সাঁ সা সা সা গা গা গা গা গা
জী কৃষ্ণ পে লে ও

গা গা গা গা গা সা সা সা সা সা
পে তে পা রি আ মি কি পার

গা গা গা গা গা গা গা গা গা
বো বা বা দে খি বে

গা গা গা গা গা গা গা গা গা
মে পা রি হা রি

অন্তরা ।



শ্রীদক্ষিণাচরণ সেন ।

বীণাপানি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণা-পুস্তক-রঞ্জিত হস্তে । ভগবতি, ভারতি দেবি নমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । } কার্তিক, ১৩০৪ সাল । } ১০ম সংখ্যা ।

৬ যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ।

আজ আমরা অতিশয় শোচনীয় সংবাদ বন্ধে করিয়া আমাদের সহৃদয় পাঠক-পাঠিকাগণ সমীপে উপস্থিত হইলাম । আমাদের কার্যাব্যাহক বন্ধুবর যোগেন্দ্রনাথ আব ইহ জগতে নাই—বিগত ৭ই কার্তিক তারিখে আত্মীয়, স্বজন বন্ধু-বান্ধবের মায়া পরিত্যাগ করিয়া, পাপ, তাপ প্রলীড়িত এই ধবাবাহ হইতে তিনি চিরশান্তি নিকেতনে প্রস্থান করিয়াছেন । তাঁহার আত্মীয়-স্বজন ও আমবা তাঁহার হতভাগ্য বন্ধুগণ শোক করিবার জন্ত এখানে পড়িয়া রহিয়াছি ।

বন্ধুবর যোগেন্দ্র, বাল্যকাল হইতেই অতি ধীর, পরোপকারী, নম্র প্রকৃতি ও মিষ্ট-ভাবী লোক ছিলেন । তাঁহার সহিত যাহার পরিচয় হইয়াছে, তিনিই তাঁহার এই সুলভ স্বভাবের সুখ্যাতি না করিয়া থাকিতে পারেন নাই ।

বন্ধুবর ১২৭৬ সালে মাঘ মাসে জেলা বাঁকুড়াব অন্তর্গত অবন্তিকা গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন । বাল্যকাল হইতে পাঠে তাঁহার প্রসঙ্গ ভক্তি ছিল, তিনি বর্তমান সময়ে বি-এ, পড়িতে ছিলেন । অতি

বাল্যকালে তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়। সেই অবধি তিনি তাঁহার
উদার-চেতা পিতা কাশীবল্লভের রক্ষণাবেক্ষণে লালিত পালিত হইয়া
আসেন। যোগেন্দ্রের বয়স যখন ১০ কি ১১ বৎসর, তখন তাহার পিতা,
একমাত্র সম্ভ্রান্ত যোগেন্দ্রের সংসার-স্বষ্টি বন্ধার জন্ত অগত্যা দ্বিতীয়
বার দাব-পরিগ্রহে বাধ্য হন। ১২২৯ সালে ৬ই আষাঢ়, যোগেন্দ্রের
পিতার মৃত্যু হয়। যোগেন্দ্র তখন এফ-এ, পড়িতেছেন। এই অল্প
বয়সেই যোগেন্দ্রকে সংসারের গুরুভার পড়ে। পিতার পরিত্যক্ত
অবস্থায় ১৫।১৬ বৎসর বয়সে যোগেন্দ্রের বিবাহ হয়; বিমাতা ও
স্বামীকে লইয়া যোগেন্দ্রকে অর্থাভাবে কিছুমাত্র কষ্ট পাইতে হয় নাই।
কারণ, যোগেন্দ্রের পিতা যোগেন্দ্রকে প্রভূত ধনের উত্তরাধিকারী করিয়া
যান, সুদয়বল্লভ নামে যোগেন্দ্রের এক খুড়া আছেন, যোগেন্দ্র তাহাবই
উপর তাহার বিষয়-সম্পত্তি ভাব দিয়া কলিকাতায় পাঠদশায়
কালযাপন করিতেছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর বৎসবে (১৩০০, শ্রাবণ)
যোগেন্দ্রের স্ত্রীর মৃত্যু হয়। যোগেন্দ্র আত্মীয়-স্বজনের অতিমতে
১৩০১ সালের ১২ই বৈশাখে পুনরায় দাব পরিগ্রহ করেন। ইহার
পর বৎসর (১৩০২, জ্যৈষ্ঠ) যোগেন্দ্রের বিমাতা, জেলা বালেশ্বরের
অধীন বালুহস্তা নামক স্থানে স্বর্গলাভ করেন। এখন আব
যোগেন্দ্রকে আপনাব বলিবাব কেহ রহিল না।

এইরূপে ২১ বৎসব কাটিয়া গেল, একদা যোগেন্দ্র শুনিলেন, তাঁহার বিষয়-সম্পত্তিৰ উপৰ দেনা হইয়াছে; ইতাব কাৰণ কিছুই অবগত হইতে না পাবিয়া, তথ্যান্বয়ক্ৰমে প্ৰবৃত্ত হন। পৰে খুঁজাব হস্তে বিষয়-সম্পত্তিৰ ভাব বাখা যুক্তিবৃত্ত মনে কৰিলেন না। এই কাৰণে তাঁহাৰ পিতৃবোৰ সহিত নানা প্ৰকাৰ গোলযোগ হইতে লাগিল। গত ঐশ্ব্যাবকাশ ও পূজাবকাশ এই গোলমালে অতি-বাহিত হইয়া যায়। পৰে শ্ৰীশ্ৰী ৬ কালীপূজাৰ বাজাৰ কৰিয়া যখন তিনি কলিকাতা হইতে স্বীয় বৰ্তমান বাসস্থান জেলা বাঁকুড়াৰ অধীন বান্সাগৰ যাইতে ছিলেন, পথিমধ্যে নৰুবডাঙ্গা নামক স্থানে বোধ হয়, কোনও অনৈসৰ্গিক কাৰণে তাঁহাৰ মৃত্যু সংঘটিত হয়। পুলিশ

ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার কর্তৃপক্ষ কাহাকেও না দেখাইয়া লাস ফেলিয়া দেয়। নানা কারণে লোক নানাপ্রকার সন্দেহ করিতেছেন; তদন্ত এখনও চলিতেছে। আমরা এই সংবাদে মন্বাহত হইবাছি। আমাদের পাঠক-পাঠিকাগণও বোধ হয়, এ সংবাদে হৃৎ প্রকাশ না করিয়া থাকিতে পারিবেন না।

এখন আমাদের ঈশ্বর স্থানে এই প্রার্থনা—যেন তাহার ইচ্ছা অনুসারে পরিব্রাজ্যে, পরজগতেও পবিত্রতা লাভ করে। তাহার দ্বিতীয়া স্ত্রী শোক করিতে এই নন্দন জগতে বহিল, পবনেশ্বর হস্ত-ভাগিনীর মতিগতি স্থিরতর রাখিয়া তাহার স্নদয়ে শান্তি প্রদান করুন।

ঈশ্বরোপাসনা।

[পূর্ব-প্রকাশিতের পর]

অহংগ্রহরূপে ব্রহ্মোপাসনাব অধিকারী যে-সে হইতে পারে না। যিনি যথাবিধি বেদ বেদাঙ্গ অধ্যয়ন করতঃ অর্থাৎ ব্রহ্ম জিজ্ঞাসা ব্যতিবিক্ত নিখিল বেদার্থ অবগত হইয়াছেন, যিনি বর্তমান জন্মে ও পূর্ব জন্মান্বিতে কামা নিষিদ্ধ কাম বর্জন পূর্বক নিত্য নৈমিত্তিক উপাসনা দ্বারা উন্নিত হইয়াছেন; যিনি সাধন চতুষ্টয় সম্পন্ন এবং যিনি আচাৰ্য্যাদি লঙ্ঘন করেন না, বেদান্তে তাহাকেই নিগুণ ব্রহ্মোপাসনাব অধিকারী বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। ব্রহ্মস্বরূপাবস্থানকে ইহা বা উপাসনাব চরম ফল বলিয়াছেন, ইহা বলেন,—“ব্রহ্মাদি তূণ পর্যন্তং মায়া কল্পিতং জগৎ। সত্যমেকং পবং ব্রহ্ম বিদিত্বৈবং সুখী ভব।” “জ্ঞানং লব্ধং পবাং শান্তিঃ অচিবে নাধিগচ্ছতি। সৰ্বং কস্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পবিসমাপ্যতে॥” “নাস্তপস্থা বিত্ততে” ইত্যাদি প্রকরণে ব্রহ্মজ্ঞান প্রাপ্তিকেই অদ্বৈত-বাদিগণ পরম পুরুষার্থ সাধন বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অহং-গ্রহ উপাসনা দ্বারা প্রোক্তরূপ অদ্বৈত জ্ঞানের প্রকাশ হয়।

ছান্দোগ্য উপনিষদে খেতকেতুর উপাখ্যানে “তত্ত্বমসি” প্রভৃতি মহাবাক্য দ্বারা অদ্বৈত-জ্ঞান উদ্বোধিত হইতে দেখা যাইতেছে ; এবং অগ্ন্যগ্নি শ্রুতি ও তাহার অনুবর্তন করিয়াছে । “ন প্রতীকেন হি সঃ” সূত্রে ও তাহার অর্থই সমর্থন করিতেছে । আত্মাদির মত এই যে, উক্তরূপ উপাসনা দ্বারা “তত্ত্বমসি” রূপ অপারোক্ষ-ভূতিই পরমপুরুষার্থসাধন । অহংজ্ঞান ব্রহ্মবগ্রাহী হওয়াই ব্রহ্ম-জ্ঞান । ইহা গুণাতীত, নির্ভয়, অদ্বয়, স্থান, একরূপ আনন্দ ও চৈতন্য স্বরূপ । ইহাতে জড়ত্বের লেশমাত্রও নাই । এ তত্ত্বের পর আব জ্ঞাতব্য তত্ত্ব নাই ; বিদেহকৈবল্যই মানব সাধনার চূড়ান্ত নিশ্চিন্তি ।

প্রতীকোপাসকদিগের মধ্যেও নানা মতভেদ দৃষ্ট হয় । বিশিষ্টা-দ্বৈতবাদী রামানুজ বলেন,—উপাসনা পাঁচ প্রকার ; যথা (১) অভিগমন বা ভগবদ্ভিরাদি মার্জ্জন, (২) উপাদান বা গুরুপুষ্প শূপদীপাদি দান, (৩) ইজ্যা বা পূজা, (৪) স্বাধ্যায় বা মন্ত্রজপ, স্তোত্র পাঠ ও ভাগবৎ শাস্ত্রের অভ্যাস, এবং (৫) যোগ বা একাগ্রচিত্তে ভগবদনুসন্ধান । ইহারা বলেন,—এই পাঁচ প্রকার উপাসনা দ্বারা ভক্তিতত্ত্ব উদ্ভাসিত হইলে মানব আবৃত্তিরূপ আনন্দ-ময় বৈকুণ্ঠধাম প্রাপ্ত হয় । ইহারা আবও বলেন,—অহংগ্রহোপা-সনার তত্ত্বমসি প্রভৃতি মহাবাক্যে ভগবন্তের সাক্ষাৎকারের অন্তপ-যোগী । ইহাদেব মতে ভক্তিই ভগবৎ-প্রাপ্তির অনন্তোপায় । কিন্তু তিনি একথা পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন,—বৈবাগ্য ব্যতীত পরা-ভক্তিচাবণেব কোনও সম্ভাবনা নাই । ভাগবদ্রত্ন ও তৎসম্বন্ধীয় ভক্তিশাস্ত্র এবম্বিধ মতাবলম্বনেই উদ্ভব হইয়াছে । “স্রবণং কীর্তনং বিষ্ণোঃ শ্রবণং পাদসেবনং । অর্চনং বন্দনং দাত্ত্বং সৌখ্যমাম্র-নিবেদনং ॥” ভাগবৎ ধর্ম্মেব অন্তর্গত ভক্তির নয়টী লক্ষণ নির্দিষ্ট হইয়াছে । রামানুজ ও বল্লাভাচার্য্য প্রভৃতির সময় হইতেই জগতে ভক্তি শাস্ত্রের সমধিক মহিমা প্রচার হইয়াছে । কি বেদে, কি উপনিষদে, কি দ্বা দর্শনশাস্ত্রের কোথাও প্রজ্ঞা, কি একনিষ্ঠা শব্দ ভিন্ন ‘ভক্তি’ কথাটির পর্য্যন্ত উল্লেখ দৃষ্ট হয় না । পৌরাণিক সময়

হইতেই ভক্তি পথাবলম্বনে উপাসনার সূত্রপাত হইয়া দ্বৈত সম্প্রদায়-প্রকর্তক রামানুজ, মাধবাচার্য্য, নিম্বাদিত্য ও বল্লাভাচার্য্যের সময়ে ইহার পূর্ণতালাভ হইয়াছিল। নারদীয় ভক্তিসূত্র, সাণ্ডিল্যসূত্র, নারদপঞ্চরাত্র ও শ্রীমদ্ভাগবৎ প্রভৃতি অতুলনীয় গ্রন্থ ভক্তি-উপবনের সুউজ্জ্বল কুসুমরূপে অত্মাপিও জগতেব প্রীতিপ্রদ হইয়া রহিয়াছে। প্রতীক-রূপে কুণ্ডলী হইতে উপাসনার বেগবতী অশ্রুধারা নানা-পথে প্রবাহিত হইয়া, মুখ্য ভক্তিরূপ শত শত মুখে যেন সেই এক অদ্বৈত মহাসাগরে মিলিত হইবার জন্তই নিরতিশয় যত্নবতী হইয়াছে। ফলত, অধিকারীভেদে মুখ্যভক্তি পথও যে উপাসনার অন্ত্র শ্রেষ্ঠতর আলম্বন, সে বিষয়ে অশ্রুদাদির কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সাধক প্রবর শ্রীরামকৃষ্ণদেব বলিতেন,—যেমন মই, বাঁস, দড়ি বা অন্ত কোন আলম্বনে এক চাঁদে সকলেই উঠিতে পাবগ হয়, সেরূপ সমরস অবৈততত্ত্বে পৌছিতে সংস্কার ও শিক্ষামূরূপ প্রতীক অবলম্বন কবিলেই হয়। দেশ কাল ও পাত্রানুসারে প্রতীক উপা-সকদিগের আলম্বন পরিবর্তিত হইতে দেখা যায়। ইহাব প্রমাণ আমবা সর্বত্রই দেখিতে পাই। যোগশাস্ত্রেও “পূৰ্ব্ব পূৰ্ব্বভূমিঃ জিহ্বা উত্তবোত্তর ভূমিমভ্যাং” ইত্যাদি উপদেশ দৃষ্ট হয়।

আপাততঃ বিষম-বৈষম্য ঘোব ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যেও সাম্য-বিদ্যায়-ষণ সময় সময় আমাদিগকে উৎসাহিত করে। সে সাম্যভাব প্রদর্শন করিতে জগতের নানাস্থানে সমযোপযোগী বিভিন্ন মহাপুরুষ জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহারা ঈশ্বরকল্প বা ঈশ্বরবতার বলিয়া কথিত হন। অধিকাংশ স্থলেই উক্তরূপ বৈষম্য-সাম্যকারী মহাপুরুষগণ উপাসনার প্রতীকরূপে পবিগৃহীত হইয়াছেন। কৃষ্ণ, রাম, শিব, চৈতন্য, বুদ্ধ, জৈনা ও মুসা যে প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়াছেন, তাহাদের সমধিক বিস্তৃতি-বিকাশমানতা ও সাম্যকরণীয়তাই তাহার কারণ। সময়ের গতি পর্যালোচক হৃদয়দর্শী পণ্ডিতগণও বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রতীকবলম্বনের উপযোগীতা প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেকে মনে করিল, সময়ের পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আমরা

অধঃপতিত হইয়া উপাসনার নিয়াদিকারী হইয়া পড়িয়াছি। এ কথার মূলভিত্তি কি ? জানি না। আমাদের সমাজ গঠন, ধর্ম, নীতি, বিজ্ঞাবস্থা ও অন্যান্য যে সকল বিষয়ের পরিবর্তন হইতেছে, সেই সকল পরিবর্তনই সময় নামক কল্পিত আদর্শে অধ্যস্ত করিয়া আমবা সময়ের পরিবর্তন নির্ধারণ করিতেছি। তাবিয়া দেখুন, সময় আপনায়ই কল্পনা বই অস্ত্র কিছুই নহে। তাই বলিতে- ছিলাম, সময়ে কিছুই পরিবর্তন হইতেছে না। আমরাই অবিজ্ঞা- কল্পিত, স্মৃত্ত্বাঃ অনতিক্রমণীয় পরিবর্তনরূপ অবস্থা অতিক্রমণ করিয়া ক্রমশই অবস্থা-লভ্য একত্বে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করি- তেছি। স্মৃত্ত্বাঃ আমরা সকলেই নিয়াদিকারী, কি সকলেই মধ্যমাদিকারী, কিবা সকলেই উচ্চাদিকারী, একরূপ কল্পনা ভ্রান্তি কল্পিত উদ্ভাসেব প্রেলাপ বই আব কিছুই বলা যায় না। সকলের একাদিকারিত্বে অবস্থাপিত হওয়া অনৈসর্গিক। সকলে একাবস্থায় থাকিতে পারে না। তবে এই পর্য্যন্ত স্বীকার করা যায় যে, মানব সমাজেব পরিবর্তনরূপ শ্রোতের অব্যাহতগতিকে যখন অধি- কাংশ মানবই (Majority) একরূপ দৈন্তারস্থাপন হয়, প্রকৃতির দুর্লভ্য শাসনের বশবর্তী হইয়া তখনই অসম্মিত কোন এক মহাপুরুষ বা অবতাব জন্মগ্রহণ করিয়া ধর্মমংস্থাপন করিয়া থাকেন, এবং তিনি সে সময়ে সর্বত্র প্রতীকরূপে গৃহীত হইয়া পূজিত হন।

সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, ধর্মপ্রাণ ভারতে তাদৃশ জীবন্ত প্রতীকেব কোন কালেও বৈরল্য দৃষ্ট হয় নাই। প্রেমাবতার ত্রীচৈতন্ত্য দেবের অপ্রকট হওয়ার পর, অস্বদেশে যখন ধর্মভাব নিতান্ত বিকৃত অবস্থা হইয়া পড়িল, যখন পাশ্চাত্য জড়বাদ চৈতন্ত্য সহ ভারতের রুদ্ধক্ষেত্রে দস্যুরমত অনুন সার্বদ্বিশত বর্ষ পর্য্যন্ত ভীষণ আক্রমণ করিতে আবস্ত করিল, ভারতের এ হেন ঘোর ঘনঘটাচ্ছন্ন অমানিশার কামকাঞ্চনাসক্ত জগতের ঘোর দুর্দশা ত্রিষায়াব স্মপ্রভাত সূচনা করিবার জন্ত, পুণ্যক্ষেত্রে ত্রীকারার পুরুরে আবার সেই পুরুষোত্তমাদি ৬ দিগন্ত উদ্ভাসিত করিয়া

পুনৰ্জন্মিত হইলেন। অধিকারীভেদে তাঁহার শ্রীচরণাশ্রিত শিষ্য ও ভক্তমণ্ডলীকে তিনি উপাসনার উপযোগী যে যে পন্থা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। অধুনাতন জগতে তাহাই একমাত্র কল্যাণকর ও অবলম্বনীয় বলিয়া আমাব দৃঢ় বিশ্বাস। লিপিবদ্ধ ব্যতীত উপাসনা বিষয়ে সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তদীয় শ্রীমুখবাণী আমার ক্রতি-গোচর হয় নাই। সুতরাং তদ্যতীত উপাসনা প্রণালী তাঁহার পদাশ্রিত ভক্তগণের নিকটই আমাদের সম্যক্ শিক্ষাব বিষয় হইয়াছে। যদি তিনি সমগ্র জগতে সৰ্ব্ব ধৰ্ম্মেব নমন্য করিয়া পূর্ণতা স্থাপন করিতেই আসিয়াছিলেন, যদি নিরক্ষয় হইয়াও বেদান্ত সিদ্ধান্ত গভীর তত্ত্বগুলি কবামলকবৎ সৰ্ব্বজনসমক্ষে প্রত্যক্ষ দৃশ্য পদার্থের স্তাষ সরল কথায় বুঝাইয়া দিয়া গিয়া থাকেন, এবং যদি তাহার ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষবে অক্ষবে পূর্ণতা লাভ কবিয়া থাকে, তবে আমরা যে যেকপ কেন অধিকারী হই না, তাহাবই সৰ্ব্বোচ্চাংশ শ্রীবামকৃষ্ণ চরণাশ্রিত কোন না কোন ভক্তগণে নিশ্চয়ই দেখিতে পাইব। যদি অন্যান্যাদিব স্তাষ অধিকারী প্রতীকাবলম্বনে উপাসনাব প্রয়োজনীয়তা থাকে, তবে আব বুধা কালক্ষেপ না কবিয়া পূৰ্ব্বজন্মার্জিত সংস্কাবানুৰূপ যে কোন ভাবাবলম্বনে শ্রীশ্রীবামকৃষ্ণ দেবেব সাম্যাতিসাম্যমুষ্টিব ধ্যানাবলম্বন, তাঁহার অদ্বুত লীলাখ্যান শ্রবণ এবং তদগত প্রাণ হইয়া তাহাতে আত্ম সমর্পণ, এ সময়ে জনসাধারণেব পবমপুরুষার্থ লাভের অনন্ত সাধন বলিয়া আমার অবিচলিত ধারণা হইয়াছে। অলমিতি বিস্তবেণ।

শ্রীশবচ্চক্র চক্রবর্তী।

দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?

দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?

স্বমেক সমান আশ, নৈবাত্তের দীর্ঘ স্বাস,

অভাব—ভাবনা সদা নয়নেব ভল ;

নত আঁখি নত মুখ, বিষাদেব হাসি টুক,

মলিন অধর প্রান্তে বিরাজে কেবল ।

হিংসার সংসারে হায়, কেহ নাহি ফিরে চায়,

দরিদ্র নিন্দার ভাগী প্রশংসা বিবল ;

হেরিলে বিপন্ন জন, কেবল ব্যাকুল মন,

শুধু অশ্রুজল ভিন্ন নাহি অস্ত্র বল ।

কাতবে আকুল মনে, যাপে কাল নিরঞ্জে,

লুকায়ে ভাবনা ভাবে যাতনা কেবল ;

দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?

স্বত সূতা যদি হয়, বিলাস সামগ্রী চায়,

তাছে বুক ফাটে প্রাণ ব্যথায় বিকল ।

লজ্জা, ক্ষুধা নিবারণে, দুর্বল জীবন গণে,

সাঁতারে সংসার সিদ্ধি বিষাদে বিহ্বল ;

দরিদ্রের কি আছে সম্বল ?

শ্রীসাবদাপ্রসাদ সেন গুপ্ত ।

মহামায়া ।

[পূর্ব প্রকাশিতের পর ।]

(১৪)

সারদা প্রতিবেশীগণের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া কিরিয়া আসিয়া
গুনিল, কুমুদন আসিয়াছে । সে অমনি তাঁহাকে একটা গড় করিয়া
আসিল । বেশী কোন কথা না কহিয়া, শুদ্ধমাত্র শ্রামসুন্দরের
কুশল সংবাদ লইয়াই কার্যব্যাপদেশে আবার নীচে নামিয়া গেল ।

কৃষ্ণধনও তাহাকে অল্প কিছু জিজ্ঞাসা করিবার অবসর পাইলেন না। তাহার হৃদয়ে তখন নানাবিধ চিন্তা আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল।

একটু অধিক রাজে কৃষ্ণধন আহারে বসিলেন। সারদা তাহাকে বাতাস করিবার জন্ত একখান পাখা লইয়া তাঁহার কাছে বসিল। আর কৃষ্ণধনের সঙ্গে বিরূপ ভাবে কথা কহিবে, তাহার একটা ধাঁজ মনে মনে গড়িতে লাগিল। সে মহামায়ার কাছে আন্ত-পূর্ব্বিক সমস্ত ঘটনা শুনিয়াছিল।

সারদা পাছে কত্ভার কথা পাড়িয়া একটা আশ্চর্য তুলিয়া বসে, এই ভাবিয়া কৃষ্ণধনও মনে মনে সারদাব মুখ বন্ধ করিবার উপায় নির্দ্ধারণ করিতেছিলেন। কোন মতে রাত্রি প্রভাত দেখিলেই তিনি নিশ্চিন্ত হন। পবদিন শ্রামসুন্দর ও তাহার ভাবী-শুভর আসিয়া পড়িলেই, সাবদা নূতন মেয়েটার জন্ত আর তাহাকে বড় একটা জেদ কবিতে পারিবে না, এটা তাহার বিশ্বাস ছিল।

কৃষ্ণধন রমাশ্রসাদের ও তাহার মাতার কুশলাদি জিজ্ঞাসা কবিলেন। সাবদা সংক্ষেপে উত্তর দিল। রমাশ্রসাদ আজিও আসিতে পারিল না বলিয়া, কৃষ্ণধন হুঃখ প্রকাশ করিলেন। বৃদ্ধা মাতাকে গৃহে ফেলিয়া বিদেশে চাকরী করিতে পড়িয়া থাকা রমাশ্রসাদের মত সন্তানের তিনি উপযুক্ত কার্য্য বিবেচনা করিলেন না। স্বাধীনভাবে যে জীবিকা অর্জন করিতে শিখিয়াছে, সে কেন পরেব অল্পগ্রহ ভিখারী হইবার জন্ত লালায়িত—স্বাধীন ভাবে যে প্রভূত ধন উপার্জন করিতে পারে, নানাবিধ সংকার্য্য করিয়া, যে দেশের ত্রীবৃদ্ধি সাধনে সক্ষম,—বাড়ীঘব, আজীবস্বজন, প্রতিবেশীমণ্ডলী সকলকে লইয়া সুখে স্বচ্ছন্দে দিন কাটাইতে তার কেন প্রবৃত্তি হইতেছে না? দুই একদিন ছুটিব জন্ত আজিও পর্য্যস্ত কেন যে সে হাঁ করিয়া সাহেবের মুখ চাহিয়া বসিয়া থাকে? কৃষ্ণধন কিছুতেই বুঝিতে পারিলেন না। রমাশ্রসাদের কথা হইতে চাকরীর কথা হইল—চাকরীর দোষগ্রাম বড়জ হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তমে উঠিল; বড় বড় বাক্য যোজনায়, বড় বড়

পদবিত্তাসে, চাক্চিক্যময় অলঙ্কার প্রয়োগে, স্বাধীন জীবনকে স্বর্গের চূড়ায় তুলিয়া দেওয়া হইল! শ্রামসুন্দরকে বাহাতে আর চাকরী করিয়া না থাইতে হয়, তাহারও একটা বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে, এটাও সাবদাসুন্দরীকে শুনান হইল। সারদা শুধু শুনিতে লাগিল, উত্তর করিল না। একথা হইতে ও-কথা—এইরূপ কথার পব কথায় ক্লেশধন বত্ক্ষণ সারদাকে চুপ ববাইয়া বাখিলেন। তিনি বাক্যচ্ছলে সারদাকে এমন আবদ্ধ করিয়া ফেলিয়াছিলেন যে, সাবদা কত্যাটীব কথা তাঁহাব কাছে কাল পাড়িবেই স্থির করিল, আজ আর কথা কহিবাব বাগ দেখিল না। কিন্তু বিধির নির্বন্ধ ক্লেশধন নিজেই বিপদ ডাকিয়া উপস্থিত কবিলেন।

ব্যঞ্জনাদি ক্লেশধনের মুখে আজ বড়ই সুস্বাদু বোধ হইল। ক্লেশধন বলিলেন,—“বাঁধুনী কি সাতদিনেব মধ্যেই হাত পাকাইয়া ফেলিয়াছে। সে এমন রান্না কেমন করিয়া বাঁধিল?”

সাবদা বলিল,—“বাঁধুনীব জর হইয়াছে। সে বাড়ী গিয়াছে।”

ক্লেশধন। এ ত মহামায়াব রান্না নয়। তা হইলে এতগুলো ব্যঞ্জন মুখে দিলাম, এখনও একটাতে লবনের স্বাদ পাইলাম না কেন?

সাবদা। তাব শরীর অসুস্থ, তাহাকে বাঁধিতে দিই নাই।

ক্লেশধন। তুই বাঁধিয়াছিস্?

সারদা। আমাব স্বামী ডাক্তার। তাঁহার মতে ব্যঞ্জন সুসিদ্ধ না কবিলে, ও তাহাতে মসলাব আধিক্য থাকিলে, অন্ন অজীর্ণাদি নানা বোগেব উৎপত্তি হইয়া থাকে। তাহার আদেশ পালন কবিলে আমি শুদ্ধ তবকাবী সিদ্ধ কবিতে ও আঁকাইয়া ফেলিতে শিখিয়াছি। বাঁধিতে তুলিয়া গিয়াছি। স্বাশুভী পর্য্যন্ত আর আমার হাতে থাইতে চান না।

ক্লেশধন অনেকদূর অগ্রসর হইয়াছেন, এখন কথার মীমাংসা না করিয়া কেমন করিয়া চুপ করিবেন। তাই বলিলেন,—“ভবে বুঝি পাড়ার কেহ?”

সারদা বলিল,—“পাড়ার সহিত মহামায়ার সদ্ভাব নাই। মহামায়া নাকি আর তাহাদের খোঁজ লয় না।”

কৃষ্ণধন বড় ফাঁপরে পড়িলেন। সারদা বৃষ্টিতে পাবিল। বৃষ্টিয়া মুখ নামাইয়া টিপিয়া টিপিয়া হাসিল।

কৃষ্ণধন আবার জিজ্ঞাসা করিলেন,—“তবে কে? আমি এমন রান্না আর কখন মুখে তুলিয়াছি, এমন আমার মনে হয় না।” কৃষ্ণধনের জানিবার কৌতুহল বাড়িয়া গেল। সাগ্রহে বলিলেন,—“তবে কি মা আসিয়াছেন?”

সারদার মনে আনন্দ যেন তোলপাড় কবিয়া উঠিল, সেই সঙ্গে গৰ্জ আসিল। কৃষ্ণধনের মুখপানে চাহিয়া সাবদা গৰ্জভরে বলিল,—“বথার্থই মা আসিয়াছে। মা কমলা আমাদের গৃহে অধিষ্ঠিতা হইয়াছেন।”

কৃষ্ণধন সব বৃষ্টিবা নীবব হইলেন। আবার তাহার মুখ গম্ভীর হইল। সাবদা বৃষ্টিতে পাবিল—আব কোন কথা কহিল না।

কৃষ্ণধন অবনত মুখে অন্নপাত্র হস্ত রাখিয়া গম্ভীর স্বরে সাবদাকে বলিলেন,—“সাবদা!—কলিকাতার গণা-মাণ্ড অনেক ভদ্র-লোকেব সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিয়াছি। মিথ্যা কথার কত শাস্তি দিয়াছি, তার সংখ্যা নাই। বৃদ্ধকালে নিজে কি সেই মিথ্যাব আশ্রয় গ্রহণ করিব?”

সারদা কথা বৃষ্টিতে পাবিল না—কোন উত্তরও কবিল না।

(১৫)

রাত্রে কৃষ্ণধন মহামায়াব কাছে বালিকার সমস্ত পবিচয়ই পাইলেন। মহামায়াও কৃষ্ণধনের কাছে শ্রামস্বল্পের সমস্ত সমস্ত কথা অবগত হইলে বৃষ্টি, কলিকাতার ভাষনন্দ চৌধুরী বলিয়া একজন জমিদার আছে, তাহাব একমাত্র পুত্র তারিণীচরণ। সেই একমাত্র পুত্রের একমাত্র কণা নলিনী। বিষয় অনেক, সঞ্চিত অর্থ যথেষ্ট, কলিকাতায় তাহার মান সম্বন্ধের অবধি নাই। শ্রাম-

সুন্দর কালে সেই সব সম্পত্তির কার্য্যতঃ অধিকারী হইবে। আপা-
ততঃ ভবানন্দ শ্রামসুন্দরকে বিংশ সহস্র মুদ্রা নগদ দিবে। শ্রাম-
সুন্দর বিজ্ঞাশিক্ষার জন্ত যতদিন কলিকাতায় থাকিবে, ততদিন
তাব বিজ্ঞাশিক্ষার সমস্ত ব্যয়ভার গ্রহণ করিবে। শ্রামসুন্দর গাড়ি
ঘোড়া চড়িবে, ভবিষ্যতে চাকরীর ভাবনা ভাবিবার তার বংশ-
বলীর আর প্রয়োজন হইবে না। কৃষ্ণধন এখন হইতে বাহা
উপার্জন করিবে, মহামায়া তাহা ছই হাতে খবচ করিতে পারিবে।
কৃষ্ণধনের তাহাতে আব বিন্দুমাত্রও আপত্তি নাই।

কৃষ্ণধন ইহা ছাড়া মহামায়াকে আবও অনেক কথা বুঝাইলেন।
সহনা কোন কাজ করিতে নাই, ভবিষ্য চিন্তিয়া কাজ না করিলে,
ভবিষ্যতে অনেক বিপদে ঠেকিতে হয়, মহামায়াকে উদাহরণ
স্বরূপ কবিয়া কৃষ্ণধন অনেকক্ষণ ধবিয়া বক্তৃতা করিলেন। মহামায়া
বড় একটা জবাব দিতেছিল না, কেবল “হুঁ”—“তাত বটে”—
“বুঝিয়াছি”—ইত্যাদি কথায় সায় দিতে ছিল। কৃষ্ণধন বুঝিলেন
—মহামায়া এককাল পবে ভালমন্দ কাহাকে বলে বুঝিয়াছে।
একজন শিক্ষিত পদস্থ ব্যক্তির জীব যোগ্যা হইয়াছে। কৃষ্ণধন
এত তর্কবিতর্ক, এত বক্তৃতা করিতেছিলেন, শুধু কি মহামায়াকে
বুঝাইবাব জন্ত? মহামায়াকে বুঝাইবাব জন্ত কখন ত তার এত
কথার প্রয়োজন হয় নাই। তবে এত বক্তৃতা বাগাড়ম্বর কেন?
বালিকার মুখ দেখিয়া অবধি কৃষ্ণধন নিজেই কতকটা আশ্চর্য্য
হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার নিজের মনটাই বিশেষরূপ অবাধ্য
হইয়া পড়িয়াছিল।

কৃষ্ণধন সেই অবাধ্য মনকে মহামায়া স্থানীয় কবিয়া প্রবোধ
দিতেছিলেন। নিজে শ্রুতের বিষয়ে অধিকারী হইয়া, লুক্ক শ্রাম-
সুন্দরকেও পবেব অধিকারী কবিবার লোভ সামলাইতে পারিতে-
ছিলেন না। এক দিকে লোভ, অল্প দিকে অন্তরাধিষ্ঠিতা নবাগত
বালিকা, তাহাব হিতাহিত জ্ঞান লইয়া লড়াই করিতেছিল। কলি-
কাতার নলিনীও সুন্দরী, কিন্তু এ পোড়ার মুখো মেয়েটা যে

রূপের সাগর। তাহার উপর এ হতভাগা মেয়ে শব্দর খাণ্ডী
কৃষ্ণধনের সেবার জন্য প্রস্তুত হইয়াছে—শুধু শিথিতে আসে
নাই, শিখাইতে আসিয়াছে। ব্যঙ্গনের মিষ্ট-স্বাদ তখনও পর্য্যন্ত
কৃষ্ণধনের মুখে লাগিয়াছিল। সহরে মেয়ে—বিশেষতঃ সহরে ধনীর
মেয়ে শুধু পড়িতে জানে—কেমন করিয়া রাখিতে হয়, পুস্তকে
দেখিয়াছে—হাঁড়ি দেখিয়াছে কি? সে হইবে স্বামীর সজিনী;
এ হইবে সংসারের স্বেচ্ছা প্রণোদিতা বিনা মাহিনার দাসী।

হউক আর নাই হউক, নলিনীকে দেখিয়া কৃষ্ণধনেব সে
বিধাঙ্গটা হৃদয়ে বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল। যাহাই হউক, অনেক
ভর্ক-বিতর্কের পর লোভেবই জয় হইল। মহামায়া তাঁহার কার্যের
অনুমোদন করিয়াছে ভাবিয়া, তিনি ধীরে ধীরে বালিকাকে মন
হইতে সরাইয়া দিলেন।—মহামায়া যখন বশে আসিল, তখন
সারঙ্গা আসিতে কতক্ষণ?—কৃষ্ণধন বক্তৃতা শেষ করিয়া মহামায়া
জিজ্ঞাসা করিলেন,—“বল দেখি, কাণ্ডটা কি মন্দ করিয়াছি?”

মহামায়ার উত্তর শুনিয়া কৃষ্ণধনের গ্রীহা চমকিয়া উঠিল।
মহামায়া বলিল,—“কোন কাণ্ড?”

“কোন কাণ্ড কি মহামায়া!—এতক্ষণ তবে কি করিতেছিলে?”

“একটা কথা ভাবিতেছিলাম।”

কৃষ্ণধন বুঝিলেন,—এতক্ষণ তিনি ভয়ে ধী ঢালিয়াছেন।
তিনি আর কোন কথা না কহিয়া, একটা চুরট ধরাইয়া মুখে
ধরিলেন। রাগে তাহার অঙ্গ জলিয়া গেল। এতো দেখিতেছি সেই
মহামায়া! সংসার-জ্ঞান-বিরহিতা, পর-হুঃখ-কাতরা, সদাই অস্ত্র মনকা
দুর্জনানী মহামায়া!

মহামায়া উপযাটিকা হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,—“তাহারা কি কুলীন?”

কৃষ্ণধন উত্তর করিলেন না।

মহামায়া। বল না, চুপ করিলে কেন?

কৃষ্ণধন। আমি তোমার মত নির্দোষ জীলোকের সঙ্গে কথা
কহিতে চাহিনা।

মহামায়া ক্ষমা প্রার্থনা করিল। বলিল,—“অশ্রুমনক ছিলাম, ওনিতে পাই নাই।”

কৃষ্ণধন তখন আবার বলিতে আরম্ভ করিলেন,—“তবানক চৌধুরী পোত্ৰী—সুন্দর কণ্ঠা, প্রকাণ্ড জমিদারী, অনেক টাকা, সুন্দর বাড়ী, সুন্দর বাগান, গাড়ি-ঘোড়া, লোক-লস্কর, মান-সম্মান।” এক দিকে কুল, অশ্রু দিকে এই সমস্ত প্রেলোভন। কুলকে লম্বু দেখাইবাব জন্ত কৃষ্ণধন প্রতি কথাটায় জোর দিয়া বলিতে লাগিলেন।

মহামায়া কথায় বাধা দিয়া বলিল,—“সমস্তই হ’ল, কুলটী ত ভাঙ্গিয়া যাইবে।”

কৃষ্ণধন একটু উগ্রভাবে বলিলেন,—“ক্ষতি কি? যেকোন কাল পড়িয়াছে, তাহাতে আর কুল-গৰ্ব্ব কয়দিন থাকিবে? তবানন্দ বৃদ্ধ বলিয়া কুলেব মর্যাদা বাখিতেছে। পুত্র তাবিণীচরণের কাছে কুলের এত মূল্য হইত কি?”

মহামায়া অনেকক্ষণ চুপ কবিয়া বহিল,—তাবপর একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—“কুলই যদি ভাঙ্গিতে হইল, তবে মেদিনী-পুত্রের হতভাগা ব্রাহ্মণ কণ্ঠা কি অপরাধ কবিয়াছিল?”

কৃষ্ণধন বুঝিয়াছিলেন, তাহাব ভিতবে ক্রোধের সঞ্চয় হইয়াছে, শিক্ষিত, বুদ্ধিমান, বিজ্ঞ স্বভাবতঃ ধীর—তিনি আত্ম-সংযমের চেষ্টা কবিতেন। মহামায়া কথায় তাহাব সে চেষ্টা ওড়াইয়া গেল। ক্রোধে আত্ম-বিস্মৃত—বলিয়া উঠিলেন,—“ধন-সম্পত্তি আমার উপাঞ্জন, গৰ্ব্ব-অহঙ্কার সমস্তই তোমাব হইতে পারে, ঘব-জামাইয়ের সঙ্গে এ সবের সম্পর্ক কি? কিন্তু কুল আমার, তোমাব পিতার নয়; সে আমার ইচ্ছায় থাকিবে—আমার ইচ্ছায় ভাঙ্গিবে।”

“কি কবিলে,—ভুল কথায় আমাব বাপ ভুলিলে?”

কহিতে কহিতে মহামায়ার কর্ণরুদ্ধ হইয়া আসিল। চক্ষু দিয়া শ্রাবণের ধাবায় জল ছুটিল। বসিতে পারিল না। আর কোনও কথা না কহিয়া নিশ্চেষ্ট ধীর-পদ-সঞ্চারে ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

মূর্ত্তমধ্যে প্রকৃতিহু কৃষ্ণধন আপনা আপনি বলিয়া উঠিলেন,
“কি করিলাম!”—কিছুক্ষণ স্তম্ভিত হইয়া বলিয়া রহিলেন; মহা-
দাদাকে ফিরাইতে তাঁব সাহস হইল না।

* * * * *

বলিয়া বলিয়া বাত্ৰি কাটিয়া গেল। কৃষ্ণধনের তখন চমক
ভাঙ্গিল, তখন দেখিলেন—উষালোক ধীরে ধীরে গৃহে প্রবেশ কবি-
তেছে, শুনিলেন—দৈবাল ডাকিতেছে, দাস-দাসীগণ গৃহকাণ্ডে
ব্যাপৃত হইয়াছে। মহামায়াব সাবদাব কণ্ঠস্বর ক্রমে ক্রমে তাঁর
কর্ণে গেল। তিনি সারদাকে ডাকিলেন। সাবদা আসিলে বলিলেন,
—“মহামায়াকে ডাকিয়া দে।”—কথার ভাবে ও কৃষ্ণধনের মৃদু
দেখিয়া সারদা বুঝিল, বাত্রে কিছু গেঁ যাচ্ছে। সাবদা মহা-
মায়ার কাছে ছুটিল—প্রভাতালোকে মুখ দেখিল।—
মহামায়া এমন সুকোশলে মুখ ধানি ৭ ঢাকিয়াছিল,
কিছুতেই সাবদা তাহাতে ভাব-বিকল হইল না—তবু
একবার বাত্ৰিক কথা জিজ্ঞাসা করিল। বলিল,— দাদার
সহিত বুঝি ঝগড়া করিয়াছি?”

মহামায়া। কখন দেখিয়াছি? কি?

সাবদা। তবে দাদাকে কেমন কেমন দেখিলাম কেন?

মহামায়া। তোমার দাদার অদৃষ্ট। তুমি ত চিবকালই তাহাকে
কেমন-কেমন দেখ।

সারদা। তুমি কি নলিনী সম্বন্ধে কোনও কথা তুল নাই?

মহামায়া। তুলিয়াছিলাম।

সারদা। তাবপর?

মহামায়া। ভবিতব্য।

সারদা। সে'কি কথা।

মহামায়া। আমি কেবল এইমাত্র বলিতে পারি, নলিনীকে কত
বলিয়াছি, মায়ের চক্ষে তাহাকে চিরকাল দেখিব,—আদর যত্নের
কিছুমাত্র ত্রুটি করিব না।

সায়দা। নেকি আমি পারিব না? আমার পুত্র কত্না নাই, কত্নাহে গ্রহণ করিবার জন্ত আমি মহামায়ার কাছে আসি নাই। মহামায়ার পুত্র দীর্ঘজীবী হইয়া থাক, তাঁর আর কত্নার প্রয়োজন কি?”

রাগে সায়দা ফুলিয়া উঠিল—মুখ ফিরাইল, কিয়দূর চলিয়া গেল। বাইতে যাইতে বলিল,—“শীঘ্র যাও, তোমার স্বামী কি জন্ত তোমাষ ডাকিতেছেন।” তারপর মহামায়া গেল কি না গেল, আব কিব্বিয়াও দেখিল না।

মহামায়া বরাবর স্বামীকে কাছে গেল। কৃষ্ণধন মহামায়াকে গৃহ প্রবৃষ্টা দেখিয়াই উঠিয়া দাঁড়াইয়া সাগ্রহে তাহাব হাত ধরিলেন, আর বলিলেন আমায়! আমি অকৃতজ্ঞ নরাদম,—জুফন্দা করিয়াছি—আমায় ।”

মহামায়া স গ্রহণ কব্বিয়া বলিল,—“ওকি বলিতেছ, তুমি কি যাছ!”

কৃষ্ণধন বাস্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে বলিলেন,—“বল, এখনই বলিকাতার বাইদ, নবেধ করিয়া আসি।”

মহামায়া বলিল,—“ছি! তা’ করিলে লোকনিন্দা হইবে। তোমার মানসম্মত, আমরা জীলোক কি বুঝি?”

কৃষ্ণধন সাগ্রহে বলিলেন,—“অনেক ভদ্রলোকের সাক্ষাতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইয়া আসিবাছি। আমি পুত্রকে বলিকাতার বাধিবার জন্ত স্থান নির্দিষ্ট কব্বিয়াছিলাম, তাহারা জোর কব্বিয়া তাহাকে তাহা দেব গৃহে লইবাগিয়াছে। পুত্রের আদরে রাখিয়াছে। বল এখন আর কি করিতে পারি?”

মহামায়া বলিল,—“আর কিছুই করিতে হইবে না। প্রজাপতির নির্বন্ধ কে খণ্ডন করিতে পাবে?”

[ক্রমশঃ]

শ্রীকীরোদপ্রসাদ ভট্টাচার্য।

আর যা'ব না।*

আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
 কেমন তোমার স্বভাব ভাই, নিতুই এক খেলা ছাই,
 একেলা পেয়ে মুখেব পানে কেবলি চেয়ে থাকা;
 আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

আর যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
 তুমি থাক' অমনি চেয়ে, আমিও যাই কেমন হ'য়ে,
 বুঝি না ও মুখ থানিত কি যে আছে লেখা;
 আর যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

আর যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
 ভুলিয়ে-ভালিয়ে কোলে নিয়ে, গাল জু'খানি দাও বাঙ্গিয়ে,
 বড় ছুট নষ্ট তুমি, বানিয়ে দাও বোকা;
 আর যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

আর যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
 গেলে তুমি দাও না ছেড়ে, ধব শুধু আঁচল বেড়ে,
 বোথা দিয়ে যায় যে দিন, পড়ে সাঁঝেব বেথা;
 আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
 কিনে আসতে অন্ধকাবে, কাঁটা বনে পথেব ধারে,
 আঁচল বেধে ছুঁছুঁ খেয়ে বিষম দায়ে ঠেকা;
 আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।
 চোবেব মতন ফিরি বাড়ী, লাজে কিছু বলতে নাবি,
 আঁচলে ঢাকি আদরের সে গালের রান্না হেঁকা।
 আব যা'ব না বকুল-বনে তোমার সাথে একা।

শ্রীচারণচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

* শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র দাসের কবিতা "এই এক নতুন খেলার" উত্তর।

পল্লী-প্রবাসীর পত্র ।

প্রিয় সুরেন বাবু!—

কোন বিশেষ কার্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়া আমি এবার পূজার ছুটিতে বাটা যাইতে পারি নাই। “বারদিবস অবকাশ দায়িনী” হুর্গোৎসব পর্যায়ে আমাদের সেই সোণার সহরের নব্য সভ্য সুহৃদবর্গের সদালাপ ও সভাজনোচিত আমোদ প্রমোদে বঞ্চিত হইয়া এবার আমাকে এই সুদূর পূর্ব-বঙ্গের সামান্ত পল্লীতেই পূজার অবকাশ অতিবাহিত করিতে হইল। আমাদের বন্ধুবর্গকে এবং সমিতির সভ্য, সভ্যা, সভাপতী ও পল্লীগণকে আমার সাদর সম্ভাষণ দিবে। আমাদের “উন্নতি বিধায়িনী” সভার কার্য কেমন চলিতেছে? মিস মনোবমা গাঙ্গুলী মহাশয়া আমাদের “পবিত্র-প্রেম-বিধায়িনী” সমিতির সহিত (কপ) সহানুভূতি দেখাইতেছেন, তাহার সংক্ষিপ্ত সংবাদ প্রদানে আমার বাধিত করিবে। আমি অগত্যা কিছু দিবসের জন্ত কলিকাতা হইতে অন্তরে থাকিতে বাধ্য হইয়াছি বলিয়া, আমি যেন তাঁহাদের অন্তর হইতে অন্তর না হই। দূরে থাকিলেও আমি কিন্তু আমাদের কর্তব্য—আমাদের জীবনের ব্রত বিন্মত হই নাই। আমি এই পল্লীগ্রামে বাস করিয়া, বিশেষতঃ এবার পূজায় এখানে থাকিয়া পল্লী বাসিগণের বীতি নীতি, আচার ব্যবহার, আহাব বিহার সমস্তই সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টিব সহিত Study (পাঠ) করিতেছি। ভাই। ভাবতের পল্লীগ্রাম সমূহের নৈতিক অধোগতি, অসভ্যতা-বৃদ্ধি ও অলীলতার উন্নতি দেখিয়া বাস্তবিকই আমি মর্শ্বাহত হইয়াছি। শিক্ষিত যুবক যে এখানে আদৌ নাই, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু উপযুক্ত সভা সমিতির অভাবে ইহারা সভ্যতার সুপথে অগ্রসর হইতে পারিতেছে না। এই সকল অসভ্য বর্ষব গুলিকে অসভ্যতাব ঘোব অন্ধকার হইতে আলোকে আনিতে এবং সাম্যভাবের সুধায় তাহাদিগের মন প্রাণ মাতাইতে না পারিলে

আমাদের জীবনের ব্রত অসম্পূর্ণ ও অসম্পন্ন থাকিয়া যাইবে। তাই আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি যে, তোমরা সকলে এক মনে, এক প্রাণে, এক তানে, আমার সহিত সহানুভূতি করিলে আমি এখানে একটা “শাখা-সমিতির” প্রতিষ্ঠা করিয়া এই অন্ধ-তমসচ্ছন্ন পল্লীগুলিকে সভ্যতার সূর্যালোকে আলোকিত করি। এ বিষয়ে অবশ্য প্রথমে কিছু ব্যয় আছে, আমি মনে করিতেছি “যদি সভ্য সভ্যাগণের মত হয়” তাহা হইলে গত বর্ষে আমরা যে ফিজীদ্বীপের দরিদ্রগণের সাহায্যার্থ টাকা আদায় করিয়া ছিলাম, তাহা হইতে আপাততঃ কিছু এই শুভ উদ্দেশ্যে ব্যয়িত হউক; আর কামস্কাট্‌কায় চাউল প্রেরণের যে প্রস্তাব হইয়াছিল, তাহা আপাততঃ কার্য্যে পরিণত না হইলেও চলে, কাবণ তোমরা সকলেই বোধ হয় জান *Charity begins at home*. তোমাদের গ্রাম উচ্চ-মনার পক্ষে সমগ্র সংসারই গৃহ—বহুধাবাসী সকলেই তোমাদের আত্মীয়।

তাই! এবার পূজার অবকাশ এখানে অতিবাহিত করিয়া, আমি পল্লীবাসিগণের দুর্দশা ও পাশব ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিয়া, অনেকটা বহুদর্শীতা লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আগ্রাব এই কয়েকদিন এখানে অবস্থানে আমি বেশ বুঝিয়াছি যে, পল্লীগ্রাম সমূহ অসভ্যতার ঘোর অন্ধকাবে আচ্ছন্ন। ইহারা অর্থের সম্ভাবনাব আদৌ জানে না, পদে পদে অলসতার প্রশ্রয় দেয় আর *Old fool* গণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া অনেক আপদ বিপদ আনয়ন করিয়া আমাদের গ্রাম উন্নতিশীল যুবকবৃন্দেব উন্নতির পথের কণ্টক স্বরূপ হইয়া দাঁড়ায়। তাই! এবার পূজায় এখানে যেরূপ বীভৎসকাণ্ড দেখিলাম, তাহার কিয়দংশ তোমাকে না জানাইলে আমি স্মৃতির হইতে পাবিতেছি না। বিবরণটা পাঠ করিলেই তোমরা জানিতে পারিবে—পল্লীগ্রামের অসভ্য বর্ষবগুলা কিরূপ নিরোধ ও কিরূপ অপরিমিতব্যয়ী, অর্থের অর্থবোধ ইহাদের আদৌ নাই। পল্লীগ্রামে পূজায় যে কেবল কতকগুলো ভূতভোজন হয়, তাহা তুমি আমার পত্রে বেশ বুঝিতে

পারিবে, আর আশা করি, ব্যাপার বুঝিয়া প্রতিকারের চেষ্টায় অগ্রসর হইতে কুণ্ঠিত হইবে না।

আমি যে গ্রামে রহিয়াছি, সেখানকার ঘোষেবা বেশ বড় লোক। বৃদ্ধ ঘোষজ মহাশয়ের আর ব্যয় দুই যথেষ্ট বটে, কিন্তু দুই সমান। পবিবাব, দাস দাসী, সন্তান সন্ততি প্রভৃতিতে অনেকগুলি। তিনটি সন্তান বেশ শিক্ষিত ও উপার্জনক্ষম; তাঁহারা বিদেশে চাকরী করেন, কিন্তু যথেষ্ট আয় থাকিতেও অর্দ্ধাঙ্গ-ভাগিনীগণকে সঙ্গে রাখেন না। বাহা উপার্জন কবেন, সমস্তই সেই বৃদ্ধ সেকেলে অসভ্য পিতাব হাতে দিয়া লাতে মূলে হাবাং হন। এক কথায় ইহারা যেন সেই বৃদ্ধের ক্রীতদাস। বৃদ্ধা গৃহিণীই সংসারের সর্বময়ী কত্রী আর পুত্রবধূগণ যেন বাটীর চাকবাণী। এই যুবক-দম্পতীগণের মাথায যে কিছুমাত্র পদার্থ আছে, সে বিশ্বাস আমাব আদৌ নাই; থাকিলে তাঁহারা কখনই এই বিস্তৃত সংসারের ভূতভোজন ব্যাপারে এত অর্থনাশ ও প্রেম-প্রতিমাগণের স্বাস্থ্য নাশের ব্যবস্থায় স্বীকৃত হইতেন না। ভাই! বল দেখি আমাদের সুসভ্য কলিকাতা সহরে একরূপ বর্বর কয়জন আছে?

বাই হউক, এখন এই বাটীর পূজাব ব্যাপার শুন। এই গ্রামের চতুপার্শ্ববর্তী ৩৪ ক্রোশের মধ্যে আর কোন গ্রামেই পূজা নাই। এই এক খানি মাত্র পূজাব খাতিরে এখনকার কত লোক বিদেশ হইতে—এমন কি কলিকাতা সহর পবিত্যাগ করিয়া, সেই সাহেব ভোজন, নাচ, থিয়েটার প্রভৃতিব স্বর্গীয় বিমল আনন্দ অবহেলা করিয়া কেন যে এই কু-পল্লীতে দৌড়িয়া আসিয়াছে, তাহার অর্থ আমি কিছুই বুঝিতে পাবিলাম না!

পূজার প্রায় একমাস পূর্ব হইতে বৃদ্ধ ঘোষজ মহাশয় আহাব নিদ্রা পরিত্যাগ পূর্বক নানাবিধ দ্রব্যাদি আয়োজনে নিযুক্ত হইলেন। যেখানে যে ভাল জিনিষ পাওয়া যায়, অকাতরে অর্থ ব্যয় করিয়া তিনি তৎসমুদয় সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। বিবিধ সুরম্য উপাদেয় খাদ্য বস্তুতে গৃহ পবিপূর্ণ হইতে লাগিল। পূজার কয়েকদিবস পূর্ব

হইতে গ্রামস্থ কতকগুলি বিকটাকার ব্রাহ্মণ আসিয়া মহানন্দে বিবিধ দ্রুতপক মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিতে লাগিল। পরম উপদেশ ইংরাজ-পছন্দ দ্রব্য সমুদয় দেখিয়া আগি আগে মনে করিয়াছিলাম— বোধ হয়, ঘোষজ মহাশয়ের বাটীতে এই পূজা উপলক্ষে কতকগুলি সাহেব-সুবো ও ইংরাজী-শিক্ষিত নব্য-সভাবৃন্দের শুভাগমন হইবে। তাঁহাদের সহিত আমাদের মার্জিত রুচির গোটা কতক কথা বার্তা কহিয়া মনের আক্ষেপ মিটাইব। তাই! বলিব কি এখানে আসিয়া পর্য্যন্ত মন খুলিয়া আমাদের সেই অপূর্ব-মিশ্র বাঙ্গালায় কথা কহিবার সুখ আদৌ পাইলাম না। যদি কখনও কোন ভ্রমলোকের সহিত আলাপ করিতে যাই, কি জানি কেন তাঁহারা আমার সমস্ত কথার প্রকৃত মর্ম গ্রহ করিতে পারে না।

পূজার পূর্ব দিবসেই নিমন্ত্রিত আগন্তুকগণেব জনতায় ঘোষজ মহাশয়ের সুবৃহৎ বাটী পরিপূর্ণ হইয়া গেল। গ্রামস্থ অনেকেই বাটীতে তালা লাগাইয়া সপরিবারে এখানে আসিয়া অবতীর্ণ হইলেন। যিনি না আসিলেন, ঘোষ-গৃহিণী স্বয়ং যাইয়া তাঁহাকে ডাকিয়া আনিতে লাগিলেন। আমি পূর্বে যেকপ সুসভা লোকের শুভাগমন আশা করিয়া ছিলাম, তাহার একটাও দেখিতে পাইলাম না; কেবল কতকগুলি অর্দ্ধ-উলঙ্গ বিকটাকার ব্রাহ্মণ ও কতকগুলি ইতর লোকে সেই সকল উপাদেয় দ্রব্যজাত উদরসাৎ আরম্ভ করিল। এক এক জনের আহাব দেখিলে তোমবা নিশ্চয়ই মুচ্ছিত হইতে। সে গুলি যাহুয কি রাক্ষস, সে বিষয়ে আমার বিলক্ষণ সন্দেহ আছে।

অষ্টমী পূজার দিন সন্ধ্যার পর যে একটা বীভৎস ভোজন ব্যাপার আমি স্বচক্ষে অবলোকন করিয়াছি, তাহার বিবরণ তোমায় যথা-যথ লিখিতেছি, তুমি ত অবশ্যই পাঠ করিবে, আর আমাদের বন্ধুবর্গকেও শুনাইও; কিন্তু সাবধান! যেন আমাদের সভা সমিতির সভ্য ও সভাপত্রীগণের কর্ণে এ কথা প্রবেশ করিতে না পায়! এ বীভৎস বর্ণনা তাঁহাদের কর্ণে প্রবেশ করিলে তাহাদের নিশ্চয়ই ফিট্ হইবে। আর তুমি একেলা সকল গুলির শুক্রা করিয়া উঠিতে পারিবে না।

ব্যাপারটা এই,—আরতীর পর, আগন্তুক প্রতিমা দর্শকগণকে সান্নিধ্য সম্ভাষণে ও উপাদেয় আহার্যাদানে পরিতৃপ্ত করিয়া বুদ্ধ ঘোষজ মহাশয় যখন জল যোগ করিবার জন্ত বাটীর মধ্যে যাইবেন, এমন সময় হঠাৎ “চক্রবর্তী মহাশয় আসিতেছেন”—বলিয়া চারিদিকে যেন একটা কোলাহল পড়িয়া গেল । বলা বাহুল্য যে, বুদ্ধ ঘোষজ মহাশয় পূজার তিন দিবসই প্রত্যুষে স্নান কবিয়া চণ্ডীমণ্ডপে উপবিষ্ট হন এবং স্বয়ং অনিমত্তিতগণের ভোজন ব্যাপার তত্ত্বাবধান করিয়া আরতীর পর অন্তঃপুরে গমন করতঃ জলযোগ করেন । গৃহিণীব জলযোগ সুতরাং কর্তব্য জলযোগেবও পরে । চক্রবর্তী মহাশয় আসিতেছেন শুনিয়া ঘোষজ মহাশয় হস্ত-মুখে কবজোড়ে দ্বাবেব দিকে অগ্রসর হইলেন এবং এক বিকাটাকার ঘোর ক্রুদ্ধ বর্ণ ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিয়া সময়ে চণ্ডীমণ্ডপে আসাইলেন । উপস্থিত ব্যক্তিবর্গ চতুর্দিকে সমবেত হইল, পুত্রগণ একে একে আসিয়া সেই অসভ্য বর্ষবের ফাটা পায়ের ধূলি লইয়া মুখায় দিতে লাগিল । উপরে স্ত্রীলোকগণও তাঁহাকে দেখিবার জন্য জানলার নিকট জনতা করিয়া বসিল । আমি এই ব্যাপারের কিছুই বঝিতে না পারিয়া বড় বাবুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম—ইহার নাম তরোরাম চক্রবর্তী ইনি প্রতিবর্ষে অষ্টমী পূজার দিন রাত্রে এখানে পদার্পণ কবিয়া জলযোগ করেন এবং জল যোগেব দক্ষিণা বা বৃত্তি পাঁচ টাকা গ্রহণ কবিয়া আশীর্বাদ কবিয়া চলিয়া যান ।

কিয়ৎক্ষণ ঘোষজ মহাশয়ের সহিত কথাবার্তা কহিয়া চক্রবর্তী মহাশয় বলিয়া উঠিলেন, ভাই ! এবার ভাড়াড়ে মন্দাঘিতে বড়ই কষ্ট পাইয়াছি ; আহার আর আদৌ নাই বলিলেই হয়, তবে তোমাকে একবার আশীর্বাদ করিতে না আসিলে মনটা কেমন করে তাই আসা । ভাই ! ভাড়াড়ে মন্দাঘির জালায় এ বয়সে আমাকে প্রথম ঔষধ সেবন পর্য্যন্ত কবিতে হইয়াছে । পীড়ায় অত্যন্ত কাতব হইয়া যখন আহার একবারে কমিয়া গেল, তখন একদিন অনেক ভাবিয়া বৈজ্ঞপুয়ের কবিরাজ বাড়ী ঔষধ আনিতে গেলাম । পথে বেলা অধিক হওয়ার সূর্য্য প্রামের সামস্তদের বাটীতে অতিথি হইলাম । মানাত্তিক সারিয়া

রন্ধন করিতে গিয়া দেখি—আদ সের খানেক চাউল ও কিছু তরিতরকারীর আয়োজন রহিয়াছে। দাদা তুমি ত জানই, আমার চাউল জল ঝাওয়া অভ্যাসটা অনেক দিনের, তবে সে সময় মন্দাঘির প্রকোপ ছিল বলিয়া, ওই আদসের চাউলে যো যা করিয়া, চাউল জলটা সারিয়া লইলাম। কিয়ৎক্ষণ পরে একজন ভৃত্য পান লইয়া আসিয়া আমাকে চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখিয়া অবাক হইল। আমি তাহাকে বলিলাম, বাপু হে! তোমরা যে কয়টা চাউল দিয়া গিয়াছিলে তাহাতেই আমি জোগেজাগে চাউল জলের কাষটা সাবিয়া লইয়াছি; তবে রন্ধনের চাউল না পাইয়া কাষেই বসিয়া আছি। ভৃত্য শুনিয়া কহিল,—“ঠাকুর! রন্ধনের জন্ত কতগুলি চাউল আনিব অনুমতি করুন” আমি কহিলাম—“বাপু! আমি মাসেক কারণ মন্দাঘিতে ভুগিতেছি, আহাৰ আর নাই, তুই বেশী দরকার নাই—সের দশেক চাউল ও তল্পমুক্ত তরিতরকারী আনাইয়া দিলেই যথেষ্ট হইবে।” ভৃত্য তৎক্ষণাৎ উক্ত জিনিষগুলি আনিয়া দিল। আমি পাকশাক সমাপন করিয়া ভোজনে বসিয়াছি এমন সময়ে বাটীর কর্তাবাবু আমার সমুখে উপস্থিত হইয়া বিশেষ শিষ্টাচার প্রদর্শন করিলেন। আর বলিয়াদিলেন—“মহাশয়ের প্রত্যাগমন সময়ে যেন একবার এখানে পায়ের ধুলা পড়ে।” কিন্তু দাদা সে পথ দিয়া না আসায় আব সেখানে যাওয়া হইল না।

কথাটা শুনিয়া উপস্থিত সকলেই হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, আমি কিন্তু এই নর-বান্ধবের কথা শুনিয়া অবাক হইয়া গেলাম।

কিয়ৎক্ষণ পরেই ঘোষজ মহাশয় অতি বিনীত ভাবে তাঁহাকে চরণ ধৌত করিতে বলিলেন। তিনি বার কয়েক হাঁই তুলিয়া তুড়ি দিয়া গেন নিতান্ত অনিচ্ছায় পদ প্রক্ষালনপূর্বক আসরে উপবেশন করিলেন। ভাই! বলিব কি, এই রাক্ষস কেবল জলযোগে প্রায় দশ সের দধি ১ খান, প্রায় ৫ সের ক্ষীর, সন্দেশ প্রায় ৩ সের ও কয়েক প্রকার ফল দেখিতে দেখিতে উদরসাৎ করিয়া ফেলিল এবং একটু হরিতকী চর্কণ করিতে করিতে ৫টা টাকা দক্ষিণা বা বৃত্তি লইয়া চলিয়া গেল। ভাই! এইরূপ নর-বান্ধব গুলার অন্ত না করিতে

পারিলে কখনই ভাবতের দারিদ্র্য দূর হইবে না, আর বাহারা এরূপ উদরপরায়ণ অলসগণের আলোকে প্রশ্রয় দেয়, তাহাদিগেরও গুরুতর শাস্তির প্রয়োজন; এজন্য আমাদের উন্নতি বিধায়িনী সভায় একটা নিয়ম বৃদ্ধি করিলে হয় না?

এইরূপে পূজার তিন দিনই কতকগুলি অসভ্য বর্ষবকে ভোজন করান হইল। কেবল ভোজন কেন বলি, সপ্তমীর দিন ঘোড়ার মহা-শয় ও তদীয় গৃহিণী গ্রামের প্রায় সমস্ত লোককেই নৃত্য-বস্ত্র প্রদান করিলেন। দেখ দেখি ভাই! কি বর্ষরতা!! কি অর্থের অপব্যবহার। এসব কুসংস্কারাপন্ন লোক থাকিতে আমাদের সমাজ কখনই উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিবে না।

রাত্রে নাচ থিয়েটারের নাম গন্ধও নাই। সে সব বিচ্ছিন্ন আমোদে আজ পর্য্যন্ত ইহাবা বঞ্চিত রহিয়াছে, সঙ্গীতের মণা দেখিলাম কতকগুলি বিকটাকার পুরুষ নিশীথের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া বিকট নৃত্য ও বিকট চীৎকারে কর্ণ বধির প্রায় করিয়া দিল। এই অশ্লীলতা-পূর্ণ বর্ষব আমোদকে ইহাবা “কবি” বলে।

ভাই পত্রে আব কত লিখিব? এ স্থানে আমি বেশী দিন থাকতে পারিব বলিয়া বোধ হয় না, সুতরাং তোমাদের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আদ্যোপান্ত কীর্তন কবিবাব প্রবল ইচ্ছা মনে রাখিয়া, আজ এ স্থলেই ‘ইতি’ দিতে বাধ্য হইলাম।

তোমারই ফেলারাম।

শ্রীবিনোদলাল চট্টোপাধ্যায়।

বীণাপাণি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।

“বীণা-পুস্তক-বজ্রিত হস্তে । ভগবতি, ভারতী দেবি নমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । } অগ্রহায়ণ, ১৩০৪ সাল । } ১১শ সংখ্যা ।

হরি-নাম ।

লণ্ঠন দোলা দেখিয়া ঘড়ী সৃষ্টি হয়, সময়েব মাপ কার্য্য :
যথা পূর্ব্বদিকে ছিল—পশ্চিমে যাইল, দিনেব পব রাত্রি আসিল,
অব্যবস্থা উদয় হইল, এই কার্য্যেব দ্বাৰা সময় মাপ হইয়া থাকে,
ইহা বাস্তবিত্ত আৰু সময়েব অন্তৰ নাই । ঘড়ীৰ অভাবে—অন্ধকার
বজ্রনীতে আমাদেব আপন কার্য্যেব দ্বাৰা সময় নির্ণয় কৰি ।
সন্ধ্যাব সময় বসিয়াছিলাম, এত পাতা পাঠ কৰিবাছি, স্নাতবাং
সময় এইকপ হওয়া সম্ভব ! কার্য্য যদি সময়েব পৰিমাণ হয়,
তাহা হইলে কোন এক মন্তব্য-সাধনেব নিমিত্ত কতটা কার্য্যেব
প্রয়োজন, তাহাই দেখা আবশ্যক । সহস্র সহস্র বৎসরে উপস্থিত
স্বাভাবিক নিয়মে অর্থাৎ ধীর কার্য্য-প্রবাহে খনিব মধ্যে হীৰা
প্রস্তুত হয় ; কিন্তু সেই হীৰক বাসায়নিক যন্ত্রে দুই তিন দিনেব
ভিতৰে প্রস্তুত হইতেছে, শুনা যায় । ইহাতে বুঝায় যে, ধীবে
ধীবে যাহা হইতেছিল,—অল্প কার্য্যেব দ্বাৰা যে ফল ফলিতেছিল, যে
সমস্ত কার্য্যেব দ্বাৰা হীৰক প্রস্তুত হয়, বিজ্ঞানবলে সেই সকল কার্য্য

অল্প সময়ের ভিতর একত্র সংঘত হইয়া হীরা প্রস্তুত করিয়াছে। বাহু জগতে যদি ধীব ও দ্রুত কার্যের ফলাফল প্রভেদ হয়, যদি কোটা বৎসরের কার্যের ফল পাঁচদিনে দ্রুত কার্যে সম্পাদিত হয়, বাহু জগতে যদি একপ নিয়ম দেখা যায়, অন্তর্জগতেও সেইরূপ। ইহা সকলেই দেখিয়াছেন যে, একজন বালক এক ঘণ্টায় যে সমস্ত পুস্তক কণ্ঠস্থ কবে, আব একজন তাহা ছয় মাসের পাবে নানি আমি দেখিলাম—একটি বালক তাহাব পুস্তক অভ্যাস করিত। “হি ব্যাণ্ য্যাট হাব” ভাল কবিতা আবৃত্তি করিতে পারিত না, “হি বেণ আটাব” বলিত। প্রতিদিন সমস্ত বাত্রি “হি রেণ আটাব” “হি বেণ আটাব” কবিতা এক বৎসবে তাহাব পাঠ সমাপ্ত হইল না। বিত্তা উপার্জনে যেকপ, ধর্ম উপার্জনেও ঠিক সেইরূপ হয়। আজীবন প্রাতঃস্নান, পূজা, ত্রিসন্ধ্যা, সর্বাপে হরিনামের ছাব, একাহাবী, ধর্মকথা, ধর্মচর্চা কবিতা মনেব মালিষ্ঠ কিছুমাত্র দূব হইল না, দেখা যায়। ববঞ্চ কার্যে অনুভব হয় যে, বয়সেব সহিত দিন দিন দুর্বুদ্ধি প্রবল হইয়াছে। নিজেব গুরু—অজ্ঞান, পৃথিবীর লোক পাপীষ্ঠ, সাধু-শাস্ত্র পেটের দায়ে, সাধু কোথায় নাই, সংসাব ধর্ম যেকপ তিনি একশত টাকায় পঁচাত্তব টাকা স্বেদ লইয়া পবিবাববর্গকে এক সন্ধ্যা খাওয়াইয়া, ভিক্ষুককে ভিক্ষা না দিয়া, কাহাকে কখনও মার্জনা না কবিতা, সন্ধ্যাব পব তাঁহার সমজ্ঞানী বৈষ্ণবীব সহিত ধর্মচর্চা কবিতা, প্রচুব মাল অর্থ ষ্টেট সংগ্রহ পূর্বক যেকপ তিনি সংসাবধর্ম নির্বাহ কবিতেছেন, তাহাই সারধর্ম, যদি কাহাকেও ত্যাগী দেখেন, সে তও ; যদি কেহ ভিক্ষাব জন্ত আইসে সে যোচ্চাব ; দয়া প্রভৃতি সদগুণচর্চা বাহা শাস্ত্র উপদেশ দেব, সে সমস্ত বুঝিয়া স্মৃতিয়া করিতে হয়, নতুবা চোবকে প্রশ্ন দেওয়া হয়। এক কথায় তিনি ও তাঁহাব ধর্ম সহায়িনী বৈষ্ণবী ব্যতীত আব ধার্মিক কেহ নাই, এই ধাবণ। দীনভাবে চোরাস্তায় বসিতা কুঁড়োজালি জপ করিতে থাকেন,—এই তাঁহার আজীবন ধর্মচর্চার ফল। আবার অপর

দিকে যদিচ বিরল, কিন্তু একপ দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, ঘোব সংসারী মহা-সংসার কার্যে লিপ্ত, ঘোর নাস্তিক, এক দিনও দেবতাব নাম লয় নাই, সহসা সৰ্ব্বত্যাগী হইল! অল্প অপবাধে পূর্বে যে শত্রুকে গুলি কবিত্তে যাইত, ভৃত্যকে চাবুক প্রহাৰ ভিন্ন অপব সম্ভাষণ কবিত্তে জানিত না, সেই ব্যক্তিকে প্রেমে গদ গদ হইতে দেখা গিয়াছে,—মস্তক হইতে ইকুন খসিয়া পড়িলে পুনর্বার মস্তকে বাধে। এ চং নয়, ছল নয়, লোককে দেখাইবার নিমিত্ত নয়, তাহার লোকের সহিত কণা কহিবাব সাবকাশ নাই, লোকের প্রশংসা-বাদ শুনিবার সাবকাশ নাই, এমন কি আহাবেব সাবকাশ নাই। সদাই ভয়, যে কার্য্য কবিবেন, সেই কার্য্যেই উচ্চক্ষণিতে হরি-নাম করার বিরাম পড়িবে। একপ মহাপুরুষ স্বচক্ষে দেখিয়াছি। অতি স্বল্প সময়ে দুরন্ত দানব, দেবদ্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সকল দৃষ্টান্তে অনুমান হয় যে, সূর্য্যোব গতা-গতি ধরিয়্য যে সময় আমবা নির্ণব কবি, সে সময় পরিমাণে মনের পবিবর্ত্তন নির্ণয় করা যুক্তিসঙ্গত নয়। মনে অধিক পবিমাণে কার্য্য হইলে, কয়লা মন হীবা হয়, যেমন বাহু জগতে দেখিতে পাওয়া যায়। এবং কোটী কোটী জন্ম মালা ফিরাইয়া জ্ঞান পথে কিছুমাত্র অগ্রসর হইবে না, তাহাও সম্পূর্ণ সম্ভব। যেমন বাহু জগতে কোটী কোটী বৎসব কয়লা থাকিয়া কয়লাই বহিয়াছে, তাহাতে হীবকত্বেব আভাস নাই। দেখা যায়—মনেব যে কার্য্যে মন নির্মল হয়, সেই কার্য্য যে পবিমাণে হইবে, সেই পরিমাণে স্বল্প সময়ে মন নির্মল হইবে। নাস্তিক সংসারিক হঠাৎ একদিন বুঝিল, যে নিজ কার্য্যে জগতের সমস্ত লোককে শত্রু করিয়াছে, নিজ বুদ্ধি ভেলা সংসার তরলে ডুবু হইয়াছে। উপায় হীন ছবস্ত পাথাব! গুরুর কৃপায় বুঝিল, দয়াময় ঈশ্বব আছেন, ডাকিলেই তাঁহাকে পাওয়া যায়, বিশ্বাস জন্মিল, সংসার-তাড়িত নাস্তিকেব আনন্দেব আর সীমা রহিল না, সংসার সাগর গোপ্পদ জ্ঞান হইল। জগৎ কর্ত্তা ঈশ্বব আছেন, ডাকিলে তাঁহাকে পাওয়া যায়! ঈশ্বরপদে

হৃদয় আকৃষ্ট হইল, ঈশ্বর ধ্যান-জ্ঞান জীবন হইয়া উঠিল, ক্ষণ-মাত্র ঈশ্বর অন্তরে থাকিতে সাহস হয় না, তাহা হইলেই ঘোব অন্ধকার নরক দর্শন হয়। নাস্তিক তবল সাগর হইতে উঠিয়া অটল শৈলাননে বসিল। একদিনেই পবিতর্জন,—একদিনেই চিত্ত-শুদ্ধি—তাহা আব সময় সাপেক্ষ নহে। ঈশ্বর তাহাব জীবনের পূর্ণ অবলম্বন হইলেন, কিছুই বাকী বহিল না। অপব এক ব্যক্তি পাপের আশ্রয় অস্থির। আত্মীয় পবিত্যক্ত, দেশ হইতে নির্কাসিত ব্যবস্থাপকেরা তুষানল বা উত্তপ্ত ঘৃত পান ব্যবস্থা দিয়াছেন, এমন সময়ে প্রকল্পকাস্তি দেবমূর্তি সন্ন্যাসীব মুখে অভাগা শুনিল, “একবার হরি-নাম কর, তোমার পাপ থাকিবে না।” অভাগা আশ্বাস বাক্যে আত্মহারা হইল, নাম প্রভাবে হৃদয়গ্রন্থী ভেদ হইল, উন্মাদ-আনন্দে বিতোর হইয়া গেল, এক নামে হরিগত প্রাণ, সাধু! তাঁহাব পদস্পর্শে শত শত লোক সাধু হইতে লাগিল, সেই অপবিত্র ব্যক্তি যে স্থান চলিয়া যায়, সেই স্থান পবিত্র হইতে লাগিল, এক নামে মহাপাপী উদ্ধার হইল।

মুমূর্ষু রোগের তাড়নায় অধীব, বৈষ্ণ আশা ত্যাগ করিয়াছে, পলে পলে মৃত্যু অগ্রসব হইতেছে, পীড়াব তাড়নায় অনুভব করিতেছে, জীবনের পাপ সমুদয় ভীষণ বেশ ধাবণ কবিয়া সম্মুখে নৃত্য কবিতেছে, ইন্দ্রিয় শৈথিল্য প্রযুক্ত রিপু সকল স্থিব হইয়াছে। অদ্ব ভবিষ্যতে মৃত্যু! তাবপর কি হইবে, হৃদয় শিহরিতেছে। মহাভয়ার্তের নিকট মহাপুরুষ দাঁড়াইয়া বলিলেন,—“ভয় কি হরি নাম কর।” হবি-নাম কবিল, অমনি অলকানন্দার পুতবারি তাঁহার হৃদয় বিধৌত কবিয়া স্বর্গের উপযোগী করিল, হবি-নাম করিয়া মরিল, কি হইল তাহা আর দেখিতে পাইলাম না সত্য, কিন্তু দর্শক সমূহেব মধ্যেই নিশ্চিত হইল যে সে হরি-পাদ-পদ্মে স্থান পাইয়াছে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। বালককালে একজন ব্রাহ্মণের কথা শুনিয়াছিলাম; আমাদেব পাড়ায় সে কথা বহুদিন প্রচার ছিল, ব্রাহ্মণের চরম সময় উপস্থিত, তীরস্থ করিয়াছে, ইতিপূর্বে

বেঞ্চালয়ে হাত কাটা গিয়াছিল, হাত জুড়িবার ক্ষমতা নাই, ধীরে ধীরে মা গঙ্গাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, “মা! ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলাম, কোনও দুষ্কর্মে করিতে ক্রটি করি নাই, ভয়না পতিতপাবনী তুমি আছ, এক্ষণে শবণাগত পতিতকে পাত্তম স্থান দাও” ব্রাহ্মণ গঙ্গাব গর্ভে প্রাণত্যাগ করিল। এই ঘটনা যাহাবা দেখিয়াছিল, যাহারা শুনিয়াছিল, সকলেরই মনে মনে আশার সঞ্চার হইল, যে ব্রাহ্মণ চবম কালে পরম গতি লাভ করিয়াছে। যদি শাস্ত্র সত্য হয়, যদি মহাপুরুষের বাক্য সত্য হয়, মানব হৃদয়ে এ আশা মহাফলপ্রদ। দেবতার স্থানে আশা বিফল হয় না, এই ঋষি মৃত্যুর দর্শনে বা শ্রবণে যাহাদের মনে মা গঙ্গাব পাদপদ্ম লাভ আশা জন্মিয়াছিল, সে আশা—কল্পলতিএ জননী পূর্ণ করিয়াছেন সন্দেহ নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই এমন হৃদয়-কুস্রব কথ্যও কাহাবও কাহাবও বিরক্তিজনক হইয়া উঠে। অন্তিমকালে বিশ্বাসের ফল তাঁহারা স্বীকাবই করেন না। দৃষ্টান্ত দেন, মহাপাতকী মুমূর্ষু অবস্থার ভয়ে দেবতা স্তব করিল কোন কারণে তাহাব মৃত্যু না হইয়া আবোগ্য লাভ করিল, তাহাকে পুনর্কীব পাপ কবিত্তে দেখা যায়, যদি চবম কালে দেবতার নাম উচ্চারণ করিলে পাপ হইতে নিষ্কৃতি পায়, তবে আবাব তাহাব পাপে মতি হইল কেন? এইকপ বহুপৃষ্ঠব্যাপী তর্ক করিয়া থাকেন। ইহা দেখা যায় সত্য; বাসনা অতি দুর্দ্দম—সবল দেহে অধিক প্রবল হইয়া উঠে, পাপে মতি হয়, কিন্তু চরম অবস্থায় যাহা দেখিয়াছিল তাহা কখনও স্মৃতি হইতে উঠিয়া যায় না, দিনে দিনে দেহ ক্ষয়ের সহিত সে স্মৃতি বৃদ্ধি হয়, সন্দেহ নাই। কিন্তু অভাগা শুনে নাই যে, ঈশ্বরের নামে পাপের ক্ষয় হয়, যদিও শুনিয়া থাকে, বিরোধী যুক্তি তাহাতে সন্দেহ উপস্থিত করিয়াছে, ভয়ে ঈশ্বরের নাম করিয়াছিল সত্য; কিন্তু সে নামে তাহাব রুচি জন্মায় নাই, সে জানে না যে, দয়াময় তাঁহাব নাম বিলা-ইয়াছেন, যে নামে মহাপাতকী নিষ্কার পায়, যদি একবার তাঁর

হৃদয়ে ধাবণা হয় যে, তাহার ছায় মহাপাতকীর নিমিত্তই নাম, নামে দয়ামাথা—সে দয়াব অবধি নাই, তাহা হইলে তাহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়। মনুষ্যের স্বভাব—কোনও দাতার কথা শুনিলে প্রকুল হয় না, এমন ব্যক্তি অতি বিবল, তবে দাতারাম ভগবানের নামে তাহাব হৃদয় প্রকুল হইবে না কেন? দয়াল রামকে দিন দিন মনে পড়িতে থাকে—অপাব করুণা দিন দিন উপলব্ধি কবে। বাসনার বল ক্রমে কমিয়া যাওয়াই সম্ভব, নামে কচি হওয়া অতি উৎকৃষ্ট সাধনেব ফল। এ স্থলেও আপত্তি আছে, আপত্তি-কারী এক দণ্ডে নিশ্চিত নাই, তিনি পাণ্ডিত্য অভিমাণে বলিতে থাকেন—“এ কথা সত্য হইলেও প্রকাশ কবিতে নাই, ইহাতে জগত্তের ক্ষতি হয়, একবাব ঈশ্ববেব নাম লইয়া মুক্তিনাভ হইবে, মানুষ্যের এ ধাবণা থাকিলে দুষ্কর্ম হইতে কখনই নিবৃত্ত হইবে না, দেখ না কেন, ব্রাহ্মণের কথাতে প্রকাশ “মা গঙ্গা! তুমি আছ বলিয়া বিস্তব পাপ কবিয়াছি।” সেইরূপ অনেকবই পাণে মতি হইবে। সত্য দ্বাবা অনিষ্ট হয়, এ কথা আমবা স্বীকাব পাই না। * ব্রাহ্মণেব কথাব কি প্রকাশ পাইতেছে? যে দিন তাহাব গঙ্গাভক্তি জন্মিয়াছিল, সেই দিনই তাহাব পাপেব প্রতি দৃষ্টি পড়ে। আপনাকে দীনহীন পাতকী জানা মহাসাধন—এই সাধন তাহাব হইতেছিল, যাহাকে ঈশ্বব বিশ্বাস দেন—তাহাকেই বিক্রি তাডনাও করিয়া থাকেন; ব্রাহ্মণেব অল্প তাডনায় হয় নাই, বেঙ্গালযেব আমোদেব ফলে তাহাব ছিন্ন হস্তে বিবাজিত ছিল, দিন দিন সেই ছিন্ন হস্ত অনুতাপ আনিত, অনুতাপনলে যেকূপ হৃদয় নিখল হয়, অভিমাণেব সহিত কোটী কোটী বৎসর মালা জপিয়া তাহা হয় না। নামে কচি হইলেই ঈশ্ববেব দয়া ও আপনার দীনতা সম্পূর্ণ উপলব্ধি

* অধিকাবী ভেদে উপদেশ দেওয়া যুক্তিযুক্ত, কিন্তু মনুয হরি নামে অধিকাবী নাই, এমন দীনহীন কেহ নাই, দীনের জন্ত হরি নাম সে নামে সকলেরই অধিকার।

হয়, এই উপলক্ষিই জ্ঞান স্বর্ঘ্যেব উষা, এই উপলক্ষির পর জ্ঞান স্বর্ঘ্যের উদয়ের বিলম্ব থাকে না, অজ্ঞান অন্ধকাব দূব হয়. এই সকল তार्কিকদের আমার গুণব :নামে বলি, নামে কচি 'হউক, নিজেব হীনতাৰ প্রতী লক্ষ্য হউক। সন্দেহ জড়িত তর্ক যুক্তি দূব হইবে, তৎপবিবর্তে আনন্দ লাভ করিবে, নামে কচি হউক, যিনি আমায় এ আশীর্বাদ কবেন, তিনি আমার গুরু।

আপত্ত্য উঠিতে পাবে যে, যাহারা একবার হবি-নাম করিয়া ফল লাভ কবিয়াছে, সে ফল তাহাদের বিশ্বাসের—হবি-নামের নহে, মহাপুরুষের কথায় বিশ্বাসেব ফল। মহাপুরুষ হবি-নাম দিয়াছিলেন, সেই নিমিত্ত অমৃত ফল ফলিয়াছিল, ইহাতে হবি নামেব গুণ কি? আমবা উক্তব কবি, যাহাবা যে বস্তু লইয়া চর্চা কবেন, সেই বস্তুব গুণ তাহাবাই বিশেষ অবগত। হবিগত প্রাণ মহাপুরুষেবাই হবি-নামেব গুণ যথার্থ ব্যাখ্যা কবিতে সক্ষম। যদি কেহ, শাস্ত্র-বাক্য মহাপুরুষ-বাক্য জানে হবি-নামে প্রত্যয় কবে, তাহারও হবি-নামেব ফল ফলিবে সন্দেহ নাই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীগিবীশচন্দ্র ঘোষ।

আশা।

হাত বাড়িয়ে ধ'বতে গেছ
আশায় গগন-চাঁদে,
লাফিয়ে চাঁদা পালিয়ে গেল
পা' দিলে না ফাঁদে ;
অবাক্ হ'ষে ভেকার মত
ববে ঘিরে আসি,
হেনকালে জুটল এসে
আবার আশাব রাশি ;

আশাব আশে হাঁফ ছুটিয়ে
খেতানেতে বাই,
সেই খানেতেই আশা চাঁদা
ধরা দেয় না তাই !
ধোবে তোমায় দেবো ব'লে
কত স্নহদ জোটে,
জুটে পোড়ে শেষকালেতে
মূল ধনুটা লোটে।

লুহু-তছকপে সকল গেল	যদি—বল “বেড়া ভেঙ্গে
নাইক কিছু আর,	যাও না কেন চ’লে,”
হাঁ ক’বে তাই রইল ব’সে	কোন দিকেতে কোথায় যা’ব
আশাই হুধু সার ;	কেবা দেবে ব’লে ?
তবু কেন আশার আশা	যে জন আমায় দেবে ব’লে
ছাড়তে নাহি পারি,	পাই না ত তার দেখা,
ঘুরে ফিরে আশার ফাঁসে	কাষেই আমায় ব’লতে হ’ল
পা’ জড়িয়ে মবি ;	অদৃষ্টের ফল লেখা ;
ইচ্ছা করে—আশায় ছেড়ে	দোষ দিতে হয় তারেই দোব’
অন্ত দিকে ধাই,	সেই ব্যাট! এর গোড়া,
চারদিকেতে আশার বেড়া	অসার আশার সংসাবেতে
রাস্তা বোথা পাই ?	সবাই আশায় বোড়া ।
	শ্রীউপেন্দ্রনাথ সিংহ ।

প্রাণের জ্বালা ।

কাঁচা বাঁশে ঘুণ ধরিয়াছে । এই কয়দিন পৃথিবীতে আসিয়াছি, ইহাবই মধ্যে এত জ্বালা কোথা হইতে আসিল ? জ্বালার উপর জ্বালা অতি বিষম, জ্বালায় প্রাণ মন অস্থির হইয়া পড়িয়াছে । শীত নাই, গ্রীষ্ম নাই, বসন্ত নাই, দিন নাই, রাত্রি নাই, অবিরাম অনিবার জ্বালায় জলিয়া মরিতেছি ; কিন্তু কি জ্বালা—কিসেব জ্বালা—কিছুই জানি না । দিনে কার্ঘ্যের অবসরে,—রাত্রিতে নিদ্রার প্রাক্কালে, যখনই মন এলাইয়া পড়ে, তখনই জ্বালা দ্বিগুণীত হইয়া উঠে, তখন প্রাণ আরও অস্থির হইয়া পড়ে । বল দেখি, কিসেব এ জ্বালা ?—কিসে এ জ্বালা জুড়ায় ?

নংসার ! তোমাতে কত কি আছে,—কত মহান্, কত বৃহৎ, কত উচ্চ, কত সামান্য, কত ক্ষুদ্র, কত নীচ ব্যাপার আছে ; ইহারই মাঝে পড়িয়া আমি জ্বালায় জলিয়া মরিতেছি । পৃথিবীতে

কত কি আছে, তাহাদের জ্বলনায় আমি কি? বিশাল সাগর গর্ভে একটা কীটাম্বর ত্রায—দিগন্ত ব্যাপিনী নীল কাদম্বিনী কোলে ক্ষুদ্র চাতকটিব ত্রায—অনন্ত অসীম আকাশপটে ঘৃণাকরের ত্রায আমি একটা ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ব্যাপাব!—সংসাব! তোমার বিশাল ক্রোড়ে কোথায় এতটুকু স্থান অধিকাব করিয়া পড়িয়া রহিয়াছি, তাহাতেও এত জ্বালা! সংসাব! বলিতে পার, এত ক্ষুদ্রে এত জ্বালা কেন? কিসেব এ জ্বালা?

কে জানে কিসেব জ্বালা। কে বলিবে, এত ক্ষুদ্রে এত জ্বালা কেন? জ্বালায় জ্বলিয়া সংসাবের ঘোঁড়কে চাহিয়া দেখি, দেখিতে পাই, সেই দিকেই আমারই মত জ্বালা ধরার—ঘৃণ ধবার ব্যাপার অহবহ ঘটতেছে। দেখিতে পাই, জ্বালা বাড়িবার কাবণ যথেষ্ট আছে, জ্বালা শাস্তির কিছু আছে কি না—দেখিতে পাই না। যে দিন হইতে প্রাণে জ্বালা ধবিযাছে, সেই দিন হইতে কতবার আমি অপেক্ষা বেশীদিনেব পূর্বাতন জ্বালাগ্রস্তকে জিজ্ঞাসা করিয়াছি, —আমাদেব এ জ্বালা কিসেব? তাহাবা যাহা বলে, তাহাব অর্থ বুঝি না, ভাব পাই না, স্মৃতবাং আমার প্রশ্নের সমাধান হয় না, বাসনাব পবিতৃপ্তি হয় না, আশা মিটে না। তাহারা বলে, —এ বিশাল বিক্ষে আদিয়া যাহা কবিযাছি, তাহাবই ফলে আমার এত জ্বালা। নীতির বন্ধনে বাঁধিয়া, বাসনাগুলিকে নিয়ন্ত্রিত কবিতে পারি নাই, স্মৃতবাং আমার চবিত্র গডিয়া উঠে নাই, তাই সেই অনিয়ন্ত্রিত বাসনায়, সেই অগঠিত চবিত্রে যাহা কবিযাছি, তাহাবই ফলে এত জ্বালা ঘটতেছে। যতদিন না বাসনাগুলিকে নীতিদ্বাবা নিয়ন্ত্রিত কবিতে না পারিব, যতদিন না সেই নিয়ন্ত্রিত বাসনার সাহায্যে আমার চবিত্র গডিয়া তুলিব, ততদিন আমার কার্য্য এইরূপ উচ্ছৃঙ্খল থাকিবে, আব এই জ্বালা—এই সহস্র বিষধবের বিষ জ্বালা—ভোগ কবিতেই চইবে।—বিশেষতঃ মন দিয়া এই কথাগুলি শুনিযাছি, শাস্তিব আশাব, অসহ জ্বালার হস্তে পরি-
ত্রাণের আশাব এই কথাগুলি শুনিযাছি; কিন্তু যাহা শুনিলাম,

তাহাও আমার কাছে, আদ্য কতকগুলি নূতন প্রহেলিকা উপস্থিত বরিল, তাহার অর্থ বুঝিলাম না, জালা জুড়াইল না, বরং আদ্য নূতন সন্দেহ—নূতন জালা হৃদয়ে স্থান পাইল। কার্য কি? বাসনা কি? নীতি কি? চরিত্র গঠনই বা কি? আমি যাহা করিয়াছি, তাহারই ফলে আমাব এ জালা ভোগ হইতেছে। আমি কি করিয়াছি? পৃথিবীর যাবতীয় ব্যাপাবেব সংঘর্ষে পড়িয়া কলেব ভাষ আমাব দ্বাৰা যে সকল পার্থিব ক্রিয়া নিষ্পন্ন হইতেছে, তাহাই কি আমাব কার্য? কে বলিল?—সে কার্য আমাব, তাহা কে বলিল? যখন জন্মিয়াছিলাম, তখন আমার কার্য কোথা? গর্ভে কোন কার্য ছিল কি? শরীর ও মন ছিল বটে; কিন্তু কার্য ছিল কি? কেহ বলে ছিল, কেহ বলে ছিল না। যাহাব বলে ছিল না, তাহাদের সহিত কোন কথা নাই। যাহারা বলে ছিল, তাহাব কেন বলে, বুঝি না। মন নিষ্ক্রিয় নহে, শরীর অচল নহে, পূৰ্ণ জন্মেব কার্যের ফল বিনষ্ট হইবাব নহে, সুতবাং গর্ভেও কার্য নষ্ট হয় না। পূৰ্ণজন্ম!—প্রতি পূৰ্ণজন্ম ধৰিবা বিচার কবিতে গেলে, কেহ বলিতে পারে না—আমাব এ জন্মের পূৰ্বে আর কয়টা জন্ম হইয়াছিল। হিন্দু শাস্ত্রকাব কেহ কেহ বলেন, ইহাই যদি আমার প্রথম মানব জন্ম হয়, তবে ইহার পূৰ্বে আমাব অগ্নিবিধ জন্ম চৌবাশী লক্ষবাব হইবা গিয়াছে। এসব কথাও “যদিব” উপব স্থাপিত, সুতরাং মীমাংসা কোথায়? তাহাব পর চৌবাশী লক্ষবাব জন্ম ধবিলেও একটা আদি জন্ম—জন্ম—প্রথম জন্ম স্বীকাব কবিতে হয়, সে জন্মে আমাব আর পূৰ্ণজন্ম ছিল না, পূৰ্ণজন্মেব কার্য ছিল না, মননিষ্ক্রিয় এবং শরীর অচল ছিল। সে জন্মেব কার্য কিসেব দ্বাৰা নিবন্ধিত হইয়াছিল? কে বলিয়া দিবে? আদিজন্ম স্বীকাব না কবিলে চলে না। কারণ, যাহাব বলে, চৌবাশী লক্ষবাব জন্মের পর মানব জন্ম লাভ হয়, তাহারাই বলে, শিব নিত্য, জীব নিত্য নহে। কাজেই বুঝি না, গর্ভাবস্থায় আমাব কার্য কিরূপ ছিল। কেহ বলেন, ভুমি

ভাবিতেছ, তোমার এ জন্মের জ্বালা কেন ঘটয়াছে; তাহাব মীমাংসার জন্ত তুমি আদি জন্ম ধবিতে যাও কেন? তোমার এ জন্মের পূর্বে যে জন্ম হইয়াছিল, তাহাবই কার্য্য ফলে তোমাব এত জ্বালা ঘটতেছে, ইহাই বিশ্বাস কব। বিশ্বাসই যদি করিতে হয়, তবে কারণাত্মসন্ধান করি কেন? একটী পূর্বজন্মই বা ধরি কেন? শুদ্ধ বর্তমান জন্মের কথা লইয়া বিচার কবিলেও হয়। বিশ্বাস লইয়া কথা, বিশ্বাস কারণের উপব করিতে পাবি, অকাব-ণের উপরও কবিতে পাবি; কিন্তু সে বিশ্বাসই বা হয় না কেন? বিশ্বাস হয় না বলিয়াই এত প্রশ্ন, এত সন্দেহ, এত জ্বালা, আবাব বিশ্বাসেরই বা মূর্ত্তি এত বিভিন্ন কেন? তোমাবা হুই জনেই বিশ্বাসী; কিন্তু কৈ, তোমাদের হুই জনের বিশ্বাস একরূপ কৈ? তুমি কন্মে বিশ্বাস কর, তিনি দৈবে বিশ্বাস কবেন, আব উনি দৈব ও পুরুষাকাব উভয়েই বিশ্বাস কবেন। বিশ্বাসের একরূপ ভেদ কেন হয়? দেখিতেছি পাত্র বা আধাব-ভেদেই বিশ্বাসের বিভিন্ন মূর্ত্তি ঘটে। তবে কি আধাবের প্রকৃতির উপব বিশ্বাসের প্রকৃতি নির্ভব করে না? যদি তাহা না হয়, তবে কি? তোমরা কেহ কি তাহার উত্তব দিতে পার? আবাব পূর্বজন্মের কথা কার্য্যফলের কথা, তত্ত্বাব সমন্বিত মনের কথা, আব তদনুযায়ী বিশ্বাসের কথা তুলিবে, তাহাতে কি হইবে? প্রমাণের স্বল্পত্ব প্রতিপাদন কি তাহাতে হয়?

বুঝিলাম না, তোমাব কার্য্যের কাবণ কোথায়? যে যাহা বলে, সে নিজের বিশ্বাসাত্মসাবে—বুদ্ধি অনুসাবে বলিয়া থাকে। আমাব ভাব অপবের প্রাণে আসিবে কেন? তৈল জলে মিশে না। এই উত্তর প্রত্যুত্তরে বুঝিলাম, অপবের মীমাংসা, অপবের সিদ্ধান্ত লইয়া নিজের তৃপ্তি হয় না, নিজের প্রাণে নিজে তর্ক-বিতর্ক কবিয়া যতক্ষণ না স্থিব কবিতে পাবিব, ততক্ষণ প্রাণের ক্ষোভ মিটিবে না, আশা পূরিবে না। এই জন্তই গ্রন্থকাব টীকাকারে ও ভাষ্যকারে মতভেদ দেখা যায়, গুরুশিষ্যে মতভেদ থাকে।

এই সকল ভাবিয়া নিজেরই নিজের জ্বালাব কারণ খুঁজিতে লাগিলাম দেখিলাম, জন্মকালে আমার মন শরীর যে অবস্থায় ছিল, ভূমিষ্ট হইবা মাত্র আমার জন্ম স্থানেব তন্মূহর্ত্তের বাহ্য জগতের যে অবস্থা, তাহার সহিত এক সংঘর্ষ ঘটিল। এ সংঘর্ষে আমার শরীর ও মনে যে পরিবর্তন ঘটিল, তাহাতেই আমার প্রথম পার্থিবকার্য্য সৃচিত হইল, প্রথম মল মূত্র নিঃসারণ ইচ্ছা, চেষ্টা ও ভোগ ক্ষমতা হইল, ক্ষুধাবোধ, খাদ্যাভাবে কষ্ট—কষ্টে ক্রন্দন পর্য্যন্ত হইল। জন্মিয়ামাত্র যাহার দেহ ও মনের উপর প্রকৃতি প্রভাবে এতটা পরিবর্তন ঘটাইল, তাহার তখন নিজের অবস্থা কি; সে কি নিজে একাধ্য করিল, না নৈসর্গিক-বলে তাহাকে করাইল? নৈসর্গিক প্রভাব যদি না হয় তবে কি বলিব,—তাহা জানি না, ভাবিয়া পাইনা। তাহাব নৈসর্গিক বস্তুর সহিত আমার দেহ ও মনের যতই ঘনিষ্ঠতা ও পরিচয় হইতে লাগিল, ততই আমার নানাবিধ জ্ঞান-ইন্দ্রিয়-জ্ঞান জন্মিতে লাগিল। এই জ্ঞান লাভে জীবের স্বাধীনতা কোথা; দেশ কাল পাত্র ভেদে ইন্দ্রিয়-জ্ঞান বিভিন্নাকার হয়। ঐংবাজ সন্তান ঐংবাজি শব্দ বুঝিতে পাবে, বাঙ্গালা শব্দ পারে না। এই ইন্দ্রিয়-জ্ঞান নৈসর্গিক শিক্ষা ব্যতীত আর কি? ইন্দ্রিয়-জ্ঞান হইতেই কার্য্য-শক্তির বিকাশ হয়। স্মৃতবাং কার্য্য শক্তিও নৈসর্গিক প্রভাকেই নিবন্ধিত বলিতে বাধ্য। তাহাব পব ইচ্ছাব কথা—যাহা থাকাতো জীবকে স্বাধীনবলিয়া বোধ হয়, সেই অপূৰ্ণ শক্তির কথা।—ইচ্ছা মনেব কার্য্য, মনেই ইচ্ছাব প্রকাশ হয়। জন্মকালে মানসিক অবস্থা যেকপ থাকে—ইচ্ছাব বিকাশও সেইরূপ হইয়া থাকে। আমার উৎপত্তিকালে পিতাব মাতাব মনেব অবস্থা যাহা ছিল, আমার মনের অবস্থা কতকটা নির্ভব তাহাবই উপব কবে, (শরীবের অবস্থা এই কাবণেব উপব যতটা নির্ভব কবে, মনেব অবস্থাও ততটাই নির্ভব কবে, তবে তর্ক স্থলে, ততটা স্বীকাব না কব, ক্ষতি নাই।) স্মৃতরাং মনের বা শরীবের গঠনের উপব আমার স্বাধীন চেষ্টা কিছুই নাই। তাবপর Carlyleএর কথাটাও ঠিক অতিমাত্র সত্য—যেকপ সমাজে জন্মগ্রহণ করা যাব, চরিত্র গঠনেব মূলে সেই সমাজের সামাজিক

অগ্রহায়ণে কার্যকারিতা দেখা যায়—সুতরাং যে সমাজে জন্মিলাম, সে সমাজের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থা আমার ইচ্ছাগত নহে; সুতরাং তাহার সংস্পর্শে আমার যে মানসিক পবিবর্তন বা শিক্ষা হইতে লাগিল, তাহাও আমার ইচ্ছাগত নহে। এইরূপে আমাব অধ্যাধীন অবস্থার আমার ইচ্ছাশক্তি যেরূপ গঠিত ও বিকশিত হইতে লাগিল, তাহাতে আমার কোন ক্ষমতা দেখা গেল না। তাহার আবও সংক্ষেপ করিয়া ধরিলে, যে পরিবাবে জন্মিলাম, সেই পরিবারের অবস্থা, শিক্ষা, আচাব-ব্যবহাব আমাকে এমন ভাবে নিয়ন্ত্রিত কবিয়া ফেলিল যে, আমি আমার অজ্ঞাতসাবে ঠিক একটা ছাঁচের পুতুল হইতে লাগিলাম। আমার মন, বুদ্ধি, অহংকার, শিক্ষা সবই সেই ছাঁচের গ্রাস হইল। এ ছাঁচ আমার ইচ্ছামত নহে। অতএব প্রথমতঃ পিতামাতার শরীর ও মন হইতে প্রাপ্ত শরীর ও মন লইয়া ভূমিষ্ঠ হইবাব সময় দেশকালের নৈসর্গিক পরিবর্তনের বশীভূত থাকিয়া, যে সমাজে জন্মিয়াছি, তাহাব তদানীন্তন নিরমাদিব অধীনে পৈতৃক অবস্থা শিক্ষা ও আচাব ব্যবহাবেব ছাঁচে পড়িয়া আমি যে জ্ঞান বা ইচ্ছাশক্তি বিশিষ্ট হইলাম, তাহাব পরিণুক্ততা, শ্রেষ্ঠতা বা মহত্ত্ব সম্বন্ধে আমার কি বিস্ময়াত্রও আধীনতা ছিল? সেইরূপে গঠিত ইচ্ছাশক্তি দ্বাবা আমি যে কার্য্য কবিতে লাগিলাম, তাহা কি নৈসর্গিক প্রভাবেব ফল নহে? এইরূপে অজ্ঞাত ছাঁচে ঢালা মন, ইচ্ছা—কার্য্যশক্তি লইয়া যাহা কবিতে লাগিলাম, তাহা কি পবম পবিত্র, বিশুদ্ধ, “আমি” নামক জীবের কার্য্য? অথবা সেই “আমি” উপব কতকগুলি নৈসর্গিক প্রভাবেব যৌথ ফল? কেহ বলিতে পার ইহার স্বরূপ কি? আমার ক্ষুধাবোধ হইলে কান্দি—ইহা যেমন স্বাভাবিক, অর্থহীনতায় চুরি কবাও তেমনি স্বাভাবিক নহে কেন? আমি যদি এমন কোন সমাজে জন্মিতাম যে, তাহাতে চুরি বলিয়া একটা কার্য্য কেহ জানে না, তাহা হইলে কি আমি চুরি শিখিতে পাবিতাম? আমার সমাজে চুরি আছে, অবস্থার বশে শিক্ষার দোষে চুরি কবিয়াছি, আবার

আমার সমাজেই চুরির শাস্তি আছে, চোরের প্রতি ঘৃণা আছে, তাই শাস্তিও পাইয়াছি, ঘৃণ্যও হইয়াছি; কিন্তু বল দেখি—আমার এই চুরি কার্য্যেব জন্ত দায়ী কে? আমি, না আমার সমাজ? বলিতে পার, আমার স্বাধীনতা এখানে কতটুকু? আমার সমাজে হিতাহিত জ্ঞানও আছে, আবার প্রলোভনও আছে। আমি হিত-জ্ঞান লাভ কবিয়া প্রলোভন দূর করিতে পারি, তবু করি না, বা বলিতে পারি না। হিতজ্ঞান স্বল্পেও প্রলোভনে পড়ি, ইহার কি কোন কারণ নাই? তুমি হয়ত একটা ছোট কথা বলিয়া আমার শাস্ত করিবে যে—‘কুশিক্ষা বা অশিক্ষা’। আমি যদি বলি—তোমার শ্বশ্রুকাই বা হয় কেন, আব আমাবই বা অশিক্ষা হয় কেন? গ্রাহ্য এমন কোন উত্তর দিতে পারিবে না যে, তাহা কেবলই আমার দোষে ঘটয়াছে, আমাব পৈতৃক অবস্থা, সামাজিক অবস্থা, অন্ততঃ আমার পিতা মাতা তাহার জন্ত দোষী নহেন। আবার সমাজেব পক্ষ হইতে, পিতা মাতার পক্ষ হইতে, এগুলি বিচার করিলে এইরূপেই দেখিতে পাইব যে, পিতা মাতাও আমারই মত ঘটনাব দাস, সমাজও ঘটনাময়। এখন যদি স্থির করা যায় যে, এই ঘটনাগুলি ঘটাব কে? আমার মতে যাহার পৃথিবী—তাহারই ও ঘটনা। সেই সর্ব্বঘটে বিরাজমান অচিন্ত্যশক্তি প্রভাবে যেমন সৌরজগৎ নিয়ন্ত্রিত হইয়া চলিতেছে, তেমনি তুমি আমি ততুলনার গীতাদপি কীট হইলেও তোমার আমার দৈনিক—দৈনিক কেন, প্রতিক্ষেপেব কার্য্যও নিয়ন্ত্রিত হইতেছে। সৌরজগতে সমস্ত শূন্যতা স্বত্বে যেমন সময়ে সময়ে গ্রহ-সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, যদি তাহাকে অনিয়ম বা বিশৃঙ্খলা বল, তবে এই জীবের কার্য্য প্রশালীর মধ্যে যে পাপ-পুণ্য কল্পনা, ইহাও সেইরূপ বিশৃঙ্খলা বলিতে পার। এই জগৎহ গীতাকার পার্থিব-ব্যাপাবে আকুলিত, মায়ামোহিত, পাপ-পণ্যভীত জীবকে শ্রীকৃষ্ণেব মুখ দিয়া বলাইয়াছেন;—

“কর্ম্মণ্যোবিকাবস্তে মা কলেশু কল্যাণন।

মা কর্ম্মফল হেতুভূমী তে সঙ্গোহ কর্ম্মণি॥ গীতা ২।২।

মহামাটককারও স্বাধীনতার ত্রায় প্রসিদ্ধ অকর্মকুং পাগলামীর মুখ
দ্বারা পান্নীদিগের সাধনার জন্ত বলাইয়াছেন;—

“জানারি ধর্মঃ নচ মে প্রবৃন্তিঃ,

জানাম্যধর্মঃ নচ মে নিবৃন্তিঃ।

স্বপ্না জয়ীকেশ হৃদিস্থিতেন,

অথা নিযুক্তোহস্মি তথা কথোমি।”

এই অশুরের নির্ভরতা না থাকিলে জীব এতদিন কি হইত
কে জানে? যে ভগবান্ সর্বনিষ্পত্তা, সর্বশক্তিমান্, সে ভগবানের
ইচ্ছার বিরুদ্ধে জীব যে কার্য্য করিতে পারে বা তাহার ফলভাগী
হইতে পারে, ইহা বিশ্বাস কবাই পাগলামী নহে কি?—এই
নির্ভরতা যেদিন প্রতি জীবের হৃদয়ে সেই ভগবান্ কর্তৃক উদ্ভাসিত
হইবে, সেই দিন তাহাদেব “প্রাণের জালা” দূর হইবে, কস্মিভ্য
যুচিবে—কর্ম বন্ধনও যুচিবে। ভক্তি ভিন্ন নির্ভরতা আসে না,
ভগবান্ না দিলে ভগবৎস্বাক্ষর জাগে না। সাধনায় ভক্তি হয়,
কিন্তু ভগবান্ না দয়া কবিলে সাধনা পথে অগ্রসব হয় কে?
সাধনায় সিদ্ধিলাভ করে কে?

শ্রীবোমকেশ মুস্তফী।

“মুখীল।”

প্রথম পল্লব।

বিমল বিভাতী বায়,	থবে থরে ফুল কুল,
মন আন্দোলিয়া কাষ,	ধরাধ নাহিক তুল,
ধীরে ধীরে কুঞ্জবনে করিতেছে কেলি	সৌভ অমিয়া ঢেলে করে মন চুবি,
পান্থীগুলি শাখী-পরে,	কুসুম কলিকা বালা,
মনোহারীতান ধবে,	হের ওই করে খেলা,
গাহিতেছে নানারবে মধুব কাকলী;	মন মন সমীরণে উঠিবে মুগ্ধবি।

মনোরম কুঞ্জবন,
 মনোবম নিকেতন,
 আহা কি সুবম্য হৃদ্য নয়ন শোভন !
 সুসঙ্গীত গৃহ সব,
 মরি কিবা ধব্ ধব্ ! [হন ;
 আলেখ্য শোভিছে তায় মন বিমো-
 কার্কাষ্য বিনিমিত,
 মধ্মলে বিমণ্ডিত, [সারি,
 সাজান আসনাবলী শোভে সারি
 প্রতিবিম্ব ধরিবারে,
 স্কন্দর দেউল পরে,
 স্কন্দর মুকুর রাজে, প্রতিবিম্ব ধারী ।
 সমুদ্রেতে সরোবর,
 হেব স্বচ্ছ মনোহর,
 দিয়াছে মিকুঞ্জবনে অপকৃপ সাজ ;
 ফুটেছে নলিনী কুল,
 তায় ছোটে অলিকুল,
 মানব স্কন্দরী সবে পাইতেছে লাজ ;
 রাজহংস কবে কেলি,
 সন্তরিছে মীনাবলী,
 মলয়া হিলোলে নাচে সরসী স্কন্দরী,
 ভীৰ'পরে ঝাউ গাছ,
 সারি সারি চাঁপা গাছ,
 করিয়াছে সবোবরে মন মুগ্ধকারী ।
 এ হেন নিকুঞ্জ বনে,
 খেলি শিশু ফুলমনে,
 পাছেপাছে ফিরিতেছে দাসদাসীগণ,
 কভু হাসে, কভু কাঁদে,

দিনমানের চার চাঁদে,
 কভু বা গম্ভীর ভাবে খোপে নিমগন
 কুল নবমীত কায়,
 অলঙ্কার শোভা পায়,
 কটিনেশে কটিবন্ধ, গলে হেম হার,
 মাথে হের বাধা চূড়া,
 যেন বৃন্দাবন চূড়ল, [তার ।
 হেলে হলে করে খেলা নাহি চিন্তা-
 অতীব সুতনু-পিতা,
 তায় গুণবতী মাতা,
 সমন্তনে করিতেছে সন্তান পালন ;
 প্রফুল্লিত শিশু চিত্ত,
 তায় অতি সুশোভিত,
 প্রফুল্লিত পিতা মাতা রহে অনুক্ষণ,
 প্রফুল্ল শিশু বালকে,
 “সুশীল” বলিয়া ডাকে,
 প্রফুল্ল সুশীল শোভে প্রফুল্লিত মনে ;
 সরসী লহরী সম,
 হেব শোভা মনোরম,
 হাসির ফোয়ারা ছোটে শিশুর বদনে
 এইরূপে করে খেলা,
 বাড়িছে নবীন বেলা,
 সুমধুব বাল্যকাল একে একে গত ;
 বাল্য সনে ধূলা খেলা,
 হাসিব সে মহালীলা,
 হতেছে বিলীন ক্রমে কৈশোর আগত
 কৈশোরেতে অধ্যয়ন,
 করে শিশু প্রাণপণ,

প্রতিভা কানন মাঝে ক্রমে অগ্রসর
জ্ঞান-গুপ্ত বিশোভক,
প্রদানিছে নবালোক,
নবালোকে আলোকিত সুশীল সুন্দর
বিদ্যালয় বিদ্যাত্যাসে,
সুশীলেব বাব মাস,
সর্বোচ্চ প্রধান স্থান আছে অধিকার
সুশীল সুবোধ অতি,
তায় মাতা গুণবতী,
সাক্ষায়েছে তারে দিয়া নানা অলঙ্কার
লভিবাবে জ্ঞান বহু,
কৈশোবে সদাই যত্ন.
সদাই প্রমত্ত থাকে জ্ঞান অন্বেষণে ;
বিদ্যা শিক্ষা নানা মত,
কবিতোছে অবিবত,
বিজ্ঞান সাহিত্য-সেবা বিবিধ বিধান
পরীক্ষা মন্দিবে যায়,
কভু না বিফল হয়,
ভাগ্যলক্ষ্মী সুপ্রসন্না সদা তা'ব প্রতি
যে কক্ষে সুশীল ধায়,
কৃতকার্য্য সুনিশ্চয়,
জ্ঞানমার্গে বিশেষত অতি দ্রুতগতি,
ধনীৰ সন্তান বটে,
এ হেন কভু না ঘটে,
দীনৈব সন্তান প্রতি কবা অবহেলা,
সকলেবে মিষ্টভাষে,

সুশীল সদাই তোষে,
সরল সবাব প্রতি নাহি কোন ছলা,
বিদ্যা শিক্ষা অধ্যয়নে,
কৈশোর কাটিল ক্রমে,
সবস যৌবন আসে যুহু মন্দ গতি ;
যেন কোন দেব বালা,
কবে লখে ফুল মালা,
দীবে দীবে পদক্ষেপে সুশীলেব প্রতি,
লাবণ্য উথলে যায়,
গও গোলাপেব প্রাণ,
সুশীল যৌবন রাগে অতি মনোবশম ;
গুভ পবিগষ তবে,
পিতা মাতা যত্ন কবে,
সুন্দরী বালিকা খোঁজে ফুলবালা সম।
যৌবনৈব সনে সনে,
সুখলিপ্সা মনে মনে, [প্রাণ,
থেকে থেকে জেগে উঠে সুশীলেব
তীব্র বিষাদের বেথা,
দিয়াছে আননে দেখা,
চিন্তা কুচকিনী ঘন ঢেকেছে বদনে ;
সে সুখমা নাহি আব,
গুকারেছে ফুল হার,
তাই যুবা বহুক্ষণ নিভূতে কাটায় ;
যখন সমুখে আসে,
হাসিতে নয়ান ভাসে, [জানাষ।
কিন্তু সে যে বৃথা হাসি আঁখিতে

[ক্রমশঃ]

কিরণ।

সুধাংশু ।

[১]

গ্রাম ভূণ পূর্ণ বিস্তীর্ণ প্রান্তবেব এক প্রান্তে, মুহু প্রবাহিনী বজ্রতললিলা চিত্রাব তীরে, ঘন বনাস্তবালে ত্রিবাটী গ্রাম । বাধিকা-প্রসাদ ত্রিবাটীর জমিদার । কথিত আছে, এক সময়ে তাঁহার পরাক্রমে ‘বাধে গরুতে এক ঘাটে জল পান করিত’ ।

বাধিকাপ্রসাদের দুইটী সন্তান । প্রথম—কন্না, নাম মেহ ; দ্বিতীয়—পুত্র, নাম শশীশেখর । মেহের, বনিষ্ঠেব প্রতি আন্তরিক মেহ ; সেই মেহেব বশীভূত হইয়াই মেহ অনেক সময় স্বপ্নবাসী যাইতে চাহে না ; শশীশেখর সেটা বুঝিতে পারে, সুতরাং জননী অপেক্ষা ভগিনীর নিকট সমধিক বাধ্য ।

শশীশেখর কিশোর-যুবা, সুন্দর, বলিষ্ঠ ; অত্য়াপি অবিবাহিত । মেহেব সেটা ভাল লাগে না, তাহাই ভ্রাতাব বিবাহের জন্ত মধ্যে মধ্যে পিতা মাতার নিকটে অনেক অন্ননয় করিয়া থাকে ।

ভ্রাতা, ভগিনীকে কেবল এই বার্ষ্যে বড় সন্তুষ্ট নহে, তবে পিতা মাতা, বিবাহের কথায় ততটা কর্ণপাত করেন না, সুতরাং ভ্রাতার বিরক্তিতাব প্রকাশ করিবাব বিশেষ প্রয়োজন হয় না ।

রাধিকাপ্রসাদ বড় একজন জমিদার, তাঁহাব একান্ত ইচ্ছা পুত্রের বিবাহে একটা বিরাট ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিবেন, সুতরাং কন্নার কথায় ভাল মন্দ কিছুই বলেন না ।

[২]

‘ওগো ! আমায় ছেড়ে দাও’—

চিত্রার তীরে সায়াহ্নেব সুমন্দ পবনে কাননভাস্কর হইতে একটা যুবকের শ্রবণ পথে এই কয়টা কথা প্রবেশ করিল— স্বরটী বড় কোমল ও ককণ—যুবা দ্রুতবেগে কানন মধ্যে প্রবেশ করিল ।

যুবা কানন পথে স্বর লক্ষ্য করিয়া ছুটিল এবং কিয়দূর গমন

করিয়া বাহা দেখিল, তাহাতে ক্রোধে তাহার সর্বাঙ্গ কম্পিত হইতে লাগিল। তাহার সম্মুখে অদূরে একটি দীর্ঘাকৃতি পুরুষ একটি অসুমান চতুর্দশ বর্ষীয়া বালিকার হস্ত ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, বালিকার মস্তকে ধানের একটা বোঝা। বালিকা বহু আয়াসেও পুরুষটির হস্ত হইতে আপনার হস্ত মুক্ত করিতে না পারিয়া, এক একবার ইতস্ততঃ সক্রম দৃষ্টিপাত এবং পূর্বোক্ত কথাগুলি বলিয়া চীৎকাব করিতেছে। যুবা সহসা তাহাদিগের সম্মুখে বাইয়া দাঁড়াইল।

যে পুরুষটি বালিকার হস্ত ধারণ করিয়াছিল সে যুবককে দেখিয়াই সসম্মে নমস্কার করিল এবং ব্যাগ্রভাবে জিজ্ঞাসা করিল, “বাবু! এখানে কি মনে করে?”

বালিকার মস্তক হইতে সহসা ধানের বোঝা ভূপতিত হইল, এবং শত ছিন্ন মলিন বসন দ্বারা সে স্বীয় অঙ্গ আবৃত করিবার প্রয়াস পাইল—কিন্তু সে চেষ্টা বৃথা হইল—প্রথমতঃ কিশোরী বালিকার বিকাশোন্মুখ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আবৃত করিবার ততটা আয়তন সে বস্ত্রের নাই; দ্বিতীয়তঃ সেই কোমলাঙ্গের তরল মেঘাঙ্কুর শশাঙ্কহ্যতি কিছুতেই লুকাইবার নহে। যুবর কিম্ব সেমিকে দৃষ্টি নাষ্ট, তাহার তীব্র কটাক্ষ সেই পুরুষের উপর পতিত।

পুরুষটি বালিকার হস্ত মুক্ত করিয়া দিয়াছে, স্মৃতরাং অবসব পাইয়া বালিকা পলাইবার চেষ্টা করিল, পুরুষটি পুনরায় তাহার হস্ত ধারণ করিল, যুবক গভীর স্বরে বনভূমি কাঁপাইয়া বলিল—“রতন! বালিকার হাত ছাড়িয়া দাও এবং ব্যাপার কি আমাকে বল।”

রতন বালিকার হাত ছাড়িয়া দিল, এবং বলিল, “বাবু! এ ঘেরেটা চোর, এ রোজ ধান চুরি করে নিয়ে যান, একে ধরিচি, এই দেখুন না, এক বোঝা ধান চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিল, আমি একে আজ কাছারিতে ধরে নিয়ে যাব—নায়েবের হকুম।”

যুবক বলিল—আমার হকুম তুমি এই দণ্ডেই এ স্থান হইতে প্রস্থান কর, তোমার বাহা ক্ষতি হইয়াছে আমি দায়ী।

বতন আর দ্বিতীয় বাক্য মা বলিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া গেল।
বালিকা দাঁড়াইয়া কি ভাবিতে লাগিল।

[৩]

ঘুবকেব নাম শশীশেখর, বতন জটনক গ্রাম্য মণ্ডল।

বালিকা শশীশেখরকে চিনিয়াছে, স্মৃতরাং লজ্জায় ও অভিযায়ে
কিংকর্ষ্যাবিস্মৃত হইয়া পড়িয়াছে।

শশীশেখর ধীরে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল,—“আপনি কে ?
আপনার বাড়ী কোথায় ? কি জন্ত এই ধানৈব বোঝা মাথায়
করিয়া ঘাইতেছিলেন ?”

টপ্ টপ্ কবিয়া বালিকার গম্বু বহিয়া অশ্রুবিদ্ধ ভূতলে পড়িল ;
এত মধুর সম্ভাষণ তাহার জীবনে বুঝি এই প্রথম—কে জানে
শেষ কি না।

বালিকা কিছু না বলিয়া ধীরে ধীরে ধানের বোঝা আপনার
মাথায় তুলিল এবং ধীরে ধীরে অগ্রসর হইল—শশীশেখর মীরবে
তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিল, তাহার অভ্যন্ত কৌতূহল হইয়াছে,
ত্রিবাচীতে এ বালিকা কে ? সে যে কান্দালিনী, কিন্তু এত রূপ
ত কোন দেব কল্পাবও নাই।

বালিকা বিদ্রুপ হইয়া গ্রামের প্রান্তভাগে ক্ষুদ্র একটা আশ্র-
কানন মধ্যে একখানি ক্ষুদ্র কুটার দ্বারে আসিল, ধীরে ধীরে
কুটারের দ্বার খুলিল—শশীশেখর প্রাঙ্গণে স্থাণুবৎ নিশ্চল ভাবে
দাঁড়াইয়া রহিল—বালিকা তাহা দেখিল—কিন্তু কিছু বলিল না।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হইয়া, বালিকা কুটার মধ্যে প্রবেশ করিয়া অন্ধকাবেই
একপার্শ্বে ধানের বোঝা নামাইল—অল্প একটু শব্দ হইল, সেই শব্দে কে
ক্লীণ কণ্ঠে বলিল, কে—আ—আ—পু—পু—এ—লি—বালিকা ‘হ্যাঁ’
বলিয়া দ্রুত প্রদীপ আনিয়া—শশীশেখর সকল শুনিয়া এবং প্রাঙ্গণ
পার হইয়া দাওয়ায় উঠিয়া দাঁড়াইল।

মূহূর্ত্ত মধ্যে পুষ্প কাঁদিতে কাঁদিতে বাহিরে আসিল এবং

শশীশেখরকে বলিল,—“আপনি আজ আমাকে যখন রক্ত্রনের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়াছেন, তখন আর একটু কষ্ট করিয়া কুটির মধ্যে আগমন করুন—আবার মা বোধ হয়, আর বাঁচিবেন না।”

শশীশেখর পুষ্পের সহিত কুটিরাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল। বাহা দেখিল তাহাতে তাহার চোখ কাটিয়া জল আসিল। পুষ্পের মাতা যথার্থই স্বভূ-শম্যায় শাসিত।

পুষ্প জননীর কাণের কাছে যাইয়া উচ্চকণ্ঠে বলিল,—“মা শশীশেখর—”

পুষ্পের জননী অতি কষ্টে “তো—মা—রই”—এই কয়টি কথা বলিয়াই চিরনিদ্রাভিত্তিতা হইল, পুষ্প শশীশেখরের দিকে চাহিয়া চক্ষু মুছিল—শশীশেখর তাহার অর্থ বুঝিল, এবং স্বাক্ষার মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া পুষ্পের হস্ত ধরিয়া বলিল—“পুষ্প শশীশেখর তোমারই—”

পুষ্প ও শশীশেখর উভয়ে মিলিয়া মৃত্যু সংকার করিল—রাত্রি শেষে উভয়ের অনেক কথা হইল, পরদিন প্রত্যুষে শশীশেখর গৃহে ফিবি। পুষ্প দরিদ্রের কন্ডা বলিয়া এত বয়সেও তাহাব বিবাহ হয় নাই।

[ক্রমশঃ]

শ্রীশ্যামলাল মজুমদার।

সমালোচনা ও মতামত।

তিতুমীর—বা নাটিকেল বেড়িয়ার লড়াই। শ্রীযুক্ত বিহারীলাল সরকার কর্তৃক সঙ্কলিত। পুস্তকখানি তিতুব জীবনী স্থায়ী হইবার সম্ভাবনায় প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গ সাহিত্যে উপেক্ষিত হইয়াও বেহাৱী বাবুর কৃপায় তিতুব জীবনী বঙ্গ সাহিত্যে স্থায়ী লাভ করিল দেখিয়া আমরা যৎপরোনাস্তি আনন্দ লাভ করিলাম। তিতুব জীবনী অতি সংক্ষিপ্ত হইলেও ইহাতে দেখিবার শিথিবার অনেক জিনিস

আছে। ইহার মূল্য অতি সামান্য ১/০ আনা মাত্র। আশা করি নাটক নভেল প্রাবিত বঙ্গদেশে তিতুর সংক্ষিপ্ত জীবনী অনাদৃত হইবে না। দেবত্বে পশুত্বে মিশিয়া লোকের কি সর্বনাশ হইতে পাবে, তাহা স্থিরচিত্তে দৃঢ়দৃষ্টিতে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে পারিলে লোকের জ্ঞানেব উন্মেষনা হয়, চৈতন্যের উদ্বীপনা হয়।

বসন্ত—গার্হস্থ্য উপন্যাস। শ্রীযুক্ত শ্রামলাল মজুমদার প্রণীত; ক্যাক্সিয়ালী হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ১/১ টাকা। গ্রন্থকার ক্রমেই বঙ্গ সাহিত্যে পবিচিত হইয়া উঠিতেছেন, ক্রমেই তাহার চরিত্র চিত্রণ ক্ষমতা বাড়িয়া উঠিতেছে। হস্তগত “বসন্ত” পাঠ কবিতা আমরা বড়ই আনন্দিত হইলাম। উপন্যাসের প্রত্যেক চবিত্রই বেশ ফুটিয়া উঠিয়াছে। গ্রন্থকার পুস্তকেব অঙ্গ-সৌষ্ঠবেব দিকেও দৃষ্টি রাখিতে ক্রটি করেন নাই। আমরা সাধাবণ্যে “বসন্তকে” অদৃত হইতে দেখিলে সুখী হইব।

নবীন কুসুম ও সারদীয়াঞ্জলি—হুথানি “কবিতা ও গান” সম্বলিত পুস্তিকা। শ্রীযুক্ত রাজকুমার সেনগুপ্ত প্রণীত। বেঙ্গল মেডিকেল লাইব্রেরী হইতে প্রকাশিত। গ্রন্থকার নূতন কবি। চর্চা রাখিলে উন্নতি হইতে পাবে—হস্তগত পুস্তিকা দুইখানি পড়িয়া আমরা সে আশা করিতে পারি। মধ্যে মধ্যে দুই একটা কবিতার কিছু কিছু কবিত্ব আছে। গ্রন্থকার উৎসাহ পাইবার শাস্ত্র। পুস্তক দুইখানির মূল্য যথাক্রমে ১০ চারি আনা ও ১/০ এক আনা মাত্র।

বীণাপাণি ।

মাসিকপত্রিকা ও সমালোচনী ।



“বীণা-পুস্তক-বজ্রিত হস্তে । ভগবতি, ভারতি দেবি মমস্তে ।”

৪র্থ খণ্ড । } পৌষ, ১৩০৪ সাল । } ১২শ সংখ্যা ।

ফুল ।

বহুদিন বিবহেব পবে
মিলনেষ অপূৰ্ণ আবেশে,
দুইজনে আঁখি জলে ভেনে,
জানায় রে, যে ব্যথা অন্তরে !
সেই মধু-মাখা অশ্রু-নীর,
জমে যং প্রকৃতিব কোলে,
নিত্য তা'ই উষার হিল্লোলে,
ফুল রূপে ফুটে অবনীৰ,
বাড়ায় বে, সৌন্দৰ্য্য অপার !
তা'ই ফুল মধুর আধাব ।

শ্রীমদাদ্যপ্রসাদ সেনগুপ্ত ।

হরি-নাম ।

[পূৰ্ণ-প্রকাশিতের পর ।]

আপত্য রহিল বিশ্বাস,—বহু সাধনে বিশ্বাস জন্মে । ভ্রান্ত, অভ্রান্ত, জানতে অজানতে হরি-নাম লইলে মুক্ত হয়, এ কথাব স্বার্থকতা কোথায় ? বিশ্বাসেব সহিত স্বেচ্ছায় হরি-নাম কবিলে মুক্তি হইতে পারে, এ কথা ববং সম্ভব, কিন্তু বিশ্বাস নাই—একবার হরি-নাম ববিলে তাহাতে কি ফল ?

যদি কোন ব্যক্তি আজন্ম ঈশ্বর-দেবী হইয়া জীবন কাটাইয়া থাকে, কবে একদিন হবি-নাম বলিয়াছিল, তাহাব কি ফল ফলিবে ? সেইরূপ জীবন—একবার কল্পনা করিয়া দেখা যাক । যতদূর অবিশ্বাস জীবনে থাকুক, যতদূর মনেব ভিতব দৃষ্টীকৃত কবিয়াছিল—যে মৃত্যুব পর সকলই ফুবাইয়া যাইবে, ঈশ্বর নাই, শাস্ত্র-শাসন—বাক্য মাত্র, মরণকালে সে জ্ঞান প্রায়ই বড় দৃঢ় থাকে না, সন্দেহ চুপি চুপি বলে যে মৃত্যুব পর বা যমরাজের রাজ্যে জীবনের হিসাব দিতে যাইতে হয় ; সেই মহাভয়ের সময় যে ধর্মফল জনিত ভয় পাও না, এমন ব্যক্তি কল্পনা করা যায় না । সেই মহাভীত ব্যক্তি জীবন সমালোচনা করিয়া দেখে যে, সমস্ত অন্ধকারময়—পাপপূর্ণ, কেবল একটা স্থান উজ্জল রহিয়াছে,—একদিন হরি বলিয়াছে । হরি-নামেব গুণে হৃদয়ে বিশ্বাস আসিল । মহাভয়ে আব উপায় নাই, সেই একবার হবি-নামেই আশ্রয়, আর আশ্রয় নাই । নামেব গুণে বিশ্বাস, ও সেই বিশ্বাসে হরি-নামে অনন্ত ফল ফলিবে সন্দেহ নাই ।

কর্মক্ষয় ভিন্ন মুক্তি নাই, অর্থাৎ যে ব্যক্তি নির্কাসনা না হই-বেন, তাহাব চিত্ত অবিক্রিয় ভাবে ঈশ্বরে সংলগ্ন থাকিতে পারে না । বাণীতে মরিলে শিব হয়, একজন মহাপুরুষের নিকট গুনি-বাছি, তিনি কাশীধামে ভাব-দৃষ্টিতে দেখিয়াছিলেন, মনিকর্ণিকার

ঘাটে মহানন্দশানে, মহাদেব জীবকে তারকব্রহ্ম নাম দিতেছেন। মহাপুরুষের বাক্যে বিশ্বাস হয়, কাশীর মহাশ্যে কালীধামে মৃত্যু হইলে শিবস্ব লাভ হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে কথা আছে—মুক্তি হইবে সত্য, শিবস্ব লাভ হইবে সত্য; কিন্তু কালভৈরবের বাঁতাঘ নিষ্পেষিত হইয়া কৰ্ম-ক্ষয় ব্যতীত মুক্তিলাভ হইবে না। জীব লাভ নিশ্চয় বঠিন, কৰ্মক্ষয় ব্যতীত হয় না। হরি-নামেও কৰ্মক্ষয় হওয়া আবশ্যক, নতুবা কিরূপে সে ব্যক্তি পরম-পদ লাভ করিবে? এ আপত্ত্য যুক্তি-সঙ্গত। কিন্তু বিবেচনা করিয়া দেখুন—বার বার সংসারে তাড়িত না হইয়া কাহারও সংসার বাসনা দূর হয় না। আমরা যে দৃষ্টান্ত দিয়াছি—যে ব্যক্তির প্রতি তুষানল বা তপ্তসুত পান ব্যবস্থা হইয়াছিল, তাহার সংসার বাসনা তখন মলিন সন্দেহ নাই, মহাভয়ে ব্যাকুল হইয়া উপায় অনুসন্ধান কবিতোছে, উপায় পাইল, ধীরে ধীরে কৰ্ম-ক্ষয় হইতে লাগিল, যখনই সংসার বাসনা উদয় হয়, লোকেব তাড়না মনে পড়ে, মহাপুরুষকে মনে পড়ে, হরি-নাম মনে পড়ে, আর সংসার তাহাকে আকর্ষণ কবিতো পারে না, হরির রূপায় কৰ্ম-ক্ষয় হইয়া যায়। আমরা অপর দৃষ্টান্তে বলিয়াছি—সে জীবনে একবার হরি-নাম কবিয়াছিল। মুমূর্ষু অবস্থা হইল, মৃত্যু যাতনায়, আব কালভৈরবের বাঁতাঘ পেঘনে, একপ তীব্র অবস্থায় মুহূর্ত মধ্যে কোটা জন্মের কার্য হইয়া যায়। এই স্থলে আপত্ত্য হইতে পারে যে, হবি-নাম কবিবার উপযুক্ত হইয়া হরি-নাম করিলে তবে ফল হয়। এ কথা সত্য হইলেও হবি-নামের গুণ গেল না। সকলই অবস্থা-সাপেক্ষ নিশ্চয়। মৃত্যু জন্ম একটা অবস্থা, যথাব হবি-নাম হয়, এমন স্থলে জন্ম দ্বিতীয় অবস্থা, যে জাতি হবি-নাম করে, তাহার মধ্যে বাস করা তৃতীয় অবস্থা, হরি-নাম শেখা চতুর্থ অবস্থা, ইচ্ছায় হোক, অনিচ্ছায় হোক, নান লইবার অবসরে পঞ্চম অবস্থা। এ সকল অবস্থা কেহ গড়িতে পারে না, ভাগ্যোদয় ব্যতীত এসব অবস্থার সম্ভাবনা নাই। নিম্ন যোনি ভ্রমণ, নানাস্থানে জন্মগ্রহণ, নানা অবস্থায় জীবন

যাপনের পর বিনি একবার হরি-নামে মন না দিতে চান, এত কষ্টেও যাব জীবন দুর্বারাধ্য—এ ভাবের স্বার্থকতা না হইয়াছে, তাহার বন্দীক-রাশিব মধ্যে বসিয়া কোটা কল্প জপ করুন—যতদিন জীবন দুর্বারাধ্য ভাবে ভূষিত না জন্মায়, ততদিন ও তত জন্ম জপ করিতে থাকুন। কিন্তু যাহাদের হরি-নামে বিশ্বাস, তাহারা হরি-নাম করিয়া হৃদয়ে শান্তি লাভ করিবেন নন্দেহ নাই।

কিন্তু এ সকল যুক্তি দ্বারা যাহাদের মনে ভূষিত না জন্মায়, তিনিও সত্য বলেন, ভগবান্ দুর্বারাধ্য হউন, বা না হউন, আমরা দুর্বারাধ্য। কল্পমা করুন, ভগবান্ আসিয়া আরাধনা করিতেছেন, “এস আমার কাছে এস, কেন ত্রিতাপে নষ্ট হইতেছ? বারবার দেখিতেছ যাহা করিতেছ তাহা যন্ত্রণা মাত্র। তবে আর কেন, আমার কাছে এস, তোমায় পবন শান্তি দিব।” এ কথায় কি আমরা ভুলি? দুর্বারাধ্য বিষয়-জড়িত চিত্ত এ আরাধনায় প্রসন্ন হয় না। ইন্দ্রিয়েরা তাহাকে বলিতেছে, এই যে সুখ, এই যে আনন্দ, এই সকল পাইবার চেষ্টা কব, বাববাব চেষ্টা বিফল হইতেছে, তাহাতে কি আসিয়া গেল, পাইলে ত সুখ হইবে, যত যত্নে মাকাল ফল পাইলাম, ব্যস্ত হইয়া কামড়াইয়া দেখি তিক্ত, মজ্জা বিষ্ঠাপূর্ণ। এটা কেমন করিয়া তিক্ত হইয়াছে—অন্ত ফলের চেষ্টা কবি; বারবাব মাকাল ফল পাইয়া নিবাশা আসিল না, মন ক্ষান্ত হইল না, ইন্দ্রিয়েরা বারবার উত্তেজনা করিতেছে, দুর্বারাধ্য চিত্ত প্রসন্ন হইল না, এ কথাটি আমার জীবনে প্রত্যক্ষ। পরমহংসদেবকে কেহ অবতাব বলিয়া স্বীকার করুন বা না করুন, অনেকে মহাপুরুষ বলিয়া স্বীকার করেন। তাঁর নিকট যে যতক্ষণ থাকিত, সে সময়ে তাহাদেরই মধ্যে জীবন্তুকাবস্থা অনেকেরি হইত। তিনি কখন কখন বলিতেন, “আমি কল্পতরু হইয়াছি কি চাও বল?” কিন্তু বাসনা জড়িত মন সে সময়ে নির্বাসনা হইত, মনের কোন প্রার্থনা থাকিত না, একপ অবস্থা বাববাব হইয়াছে, আমারও হইয়াছিল; তথাপি তিনি চক্ষের জল ফেলিয়া বলিতেন, “তুমি কেন আমার

কাছে এস না? অনুরোধ করি তিনটা দিন এস।” হুরারাধ্য চিত্ত
 বাইতে চাহিত না। তিনিই আসিতেন, যে সময়ে সাবকাশ সেই
 সময় আসিতেন। আনন্দ—বাটাতে বৃষ্টিতাম, তথাপি তাহাব সন্ধ
 লিপ্সা জন্মিলনা, ইহাতে আমার সম্পূর্ণ অন্তর হয়, যে মহাপুরুষ
 বাক্য সত্য, হস্তস্থিত আমলকীর ন্যায়—ঈশ্বর আমাদিগের সঙ্গে
 সঙ্গে আছেন, আমরা তাঁহাকে চাহিনা বলিয়া কাছে আসিতে
 পারেন না। একজন মুসলমান সাধু ঈশ্বর লাভের পর বলিয়া
 ছিলেন যে, “হে ভগবান! তুমি আমার সঙ্গে সঙ্গে আছ, তাহা আমি
 চক্ষুর বৎসরে অনুভব করিতে পারি নাই।” ঈশ্বর হুরাবাধ্য বলিয়া
 তাঁহাকে পাই নাই একরূপ নয়, আমরাই হুরারাধ্য—বহু আরাধনাব
 প্রসন্ন হই না—তাঁহাকে দেখিতে চাহিনা, তাঁহার কথা শুনিতে
 চাহি না। মালিনীর মাগধে ক্রুরূপে মেছনী যাইয়া নিদ্রা যাইবে?
 অনবরত ফুলের সৌরভ—মাছের আঁটে গন্ধ নাই, নিদ্রা হওয়া অসম্ভব।
 যদি কোনও মনুষ্য উচ্চ-পদে অভিষিক্ত হয়, তাহাদেব মনে মনে প্রায়ই
 বাসনা যে সমস্ত নিম্নস্থ ব্যক্তি তাহার কৃতদাস ভাবে থাকে—ইচ্ছায় বা
 অনিচ্ছায় তাহার নিকট উপস্থিত থাকে, গোলামী করে, ভগবানেব
 স্বভাব সেরূপ নহে, তিনি গোলামী চান না। পবমহৎসদেব বলিতেন—
 “ভগবান খেলুড়ে—তিনি খেলা করিতে ভালবাসেন,” যেমন রাখালের
 সহিত শ্রীকৃষ্ণ, যেমন আমাদেব সহিত রামকৃষ্ণ পবমহৎস। ভগবান
 গোলামী চান না। স্বেচ্ছায় যে তাঁহার উপাসনা করিবে, যে নিজেব
 আনন্দের নিমিত্ত তাঁহার উপাসনা করিবে, সেই উপাসনা তাঁহাব
 প্রিয়। প্রিয় ভক্তের নিমিত্ত, তাঁর নিমিত্ত নয়। আনন্দময় আপনাকে
 বিলাইয়া দিবেন এই নিমিত্ত প্রিয়, তাঁর আনন্দের নিমিত্ত নয়, তিনি
 আনন্দময়। যদি মানব জীবনে মহাখেদের কথা কিছু থাকে, তাহা
 এই—যে উপাসনা করিতে সক্ষম হইয়া উপাস্য ব্যক্তিব উপাসনা
 করিল না, যুক্তিকার শরীর ভাল বাসিলান, আমার অন্তরাত্মা ভগবানকে
 ভাল বাসিলাম না, আজীবন কি করিলাম তাহা বুঝিতে পারিলাম না,
 মুখে বলি আনন্দ চাই, কিন্তু আনন্দের স্বরূপ দেখিলাম না।

আপত্য হইতে পারে যে, যদি একবার হরি-নামে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত দৃষ্টান্তে যে ব্যক্তি আজন্ম সর্বদা হরি-নামাঙ্কিত করিল, তাহার ফল ফলিল না কেন ? উত্তর এই যে ভাবেব ঘরে চুবি, ভাবের দ্বারা লাভ হয়। হরি-নাম ব্রাহ্মে অব্রাহ্মে জানতে অজানতে ফলপ্রসূ হয় সত্য। আমাদের সকল দৃষ্টান্তেই প্রকাশ হইতেছে যে লাভ ভাবের দ্বারাই। এস্থলে সেই ভাবের ঘরে চুরি। যে সরিষা দিয়া ভূত ছাড়াইবে সেই সরিষাকে ভূতে পাইয়াছে। হরি-নাম ফলিবে, কাশীতে মৃত্যু হইবে, কিন্তু কাল ভৈরবের যাতায় পেণ্ডিত হওয়া চাই। এই কপট, যার ভাবের ঘরে চুরি, সে সংসাবে দিন দিন উন্নতি করিয়াছে, টাকা স্বেদ খাটিতেছে, শোক তাপ কিছুই পায় নাই, বৈষ্ণবীর সহিত দিব্য সম্ভাব, সংসাবেব তাড়না সহ কবিতা হয় নাই; স্মৃতরাং হরি-নামে তার বিশেষ প্রয়োজন নাই। এক প্রয়োজন লোক দেখান—সেটা হয়। আব হবি-নামে আবশ্যক কি ? কল্প-তরু হবি-নামের তলায় যে ফল চাহিয়াছে, তাহাই পাইয়াছে। ভববোগ এখনিও অনুভব হয় নাই, যন্ত্রণা হয় বটে। কিন্তু যে, সে যন্ত্রণা ঘোর নরক যন্ত্রণার প্রাবল্য তা সে জানে না। মুহূর্তের নিমিত্ত পরকাল চিন্তা কবে না। স্মৃতবাং হরি-নামও ফলে না। বিশেষরূপে যখন যম-যন্ত্রণা অনুভব হইতে থাকিবে, বৈষ্ণবীকে আব দেখিতে পাইবে না। মহিষেব গলঘণ্টা ধ্বনি কর্তৃক বধিব করিয়াছে, বৈষ্ণবীর কথা আর শোনা যায় না, সে সময়ে সে ভাব চোরের চুরি বিস্তা আর প্রবল থাকিবে না। যদি ব্রাহ্ম হইত, তাহাব ব্রাহ্মি ছুটিত, কি এ চোব। ভাবেব ঘরে চুবি অপেক্ষা চুরি নাই, একরূপ মহাপাপও নাই, সম্ভবত সে চোরও নামেব আশ্রয় লইবে, আশ্রয় লইলে যে ফল-প্রাপ্তি হইবে, তাব আর সন্দেহ কি ?

আবাব আপত্য অনেকেই হরি-নাম করে, সকলেই কি ফল পাইবে ? উত্তর—যদি শাস্ত্রে বিশ্বাস রাখিতে হয়, যে শাস্ত্রে বিশ্বাস করিয়া আপত্তিকার ঈশ্বর দ্বারাধ্য জানিয়াছেন, কঠিন সাধনে

প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা হইলে হরি-নাম ফলপ্রসূ হইবে। সাংসারিক নিয়ম স্বতন্ত্র হইতে পারে, সংসারে দোষের মার্জনা না থাকিতে পারে, কিন্তু ঈশ্বর রাজ্যের দরজায় উন্টা চাবি। পুণ্যভূমি ভারত-বর্ষে জন্মগ্রহণ, সাধু মুখে হরি-নাম শ্রবণ, পবিত্র হরি-নাম উচ্চারণ, পূর্ব্বে বলিয়াছি ইহা সাধাবণ যোগাযোগ নহে, যখন যোগাযোগ হইয়াছে, বাক্য প্রস্তুত বহিয়াছে, বোদ্ধে গুকাইয়াছে, অগ্নিশূলিঙ্গ পতনেই মহাবেগে জলিয়া যাইবে, জলস্থল কম্পিত করিয়া, আশু আলোড়িত করিয়া ঘোর শব্দে দগ্ধ হইয়া যাইবে, অগ্নিশূলিঙ্গহরি-নামে, পূর্ব্বেজন্ম সঞ্চিত পাপরূপ বারুদবাশী মুহূর্ত্তে ভস্মীভূত হইয়া যাইবে।

কেহ এ সকল কথা, ভক্তিব কথা বলিয়া ঘৃণা করিতে পারেন। যাহারা ভক্তি বিদ্যেবী তাঁহারা মনে করেন—জ্ঞান ও ভক্তি স্বতন্ত্র পদার্থ। দুর্ব্বলচিত্ত, তর্ক যুক্তি অক্ষমচিত্ত, বিচাবে পবাস্থ্য চিত্ত ভক্তি অবলম্বন কবে। জ্ঞানস্থ্যের কিরণ তাহাদের অসহ। একপ ভক্তি-নিন্দকের জ্ঞানগর্ভ অপেক্ষা অজ্ঞানতা আর নাই। বস্তু-জ্ঞানে ভক্তি হয়। গোলাপ ফুটিয়াছে, সৌরভ ছুটিতেছে, নয়ন রঞ্জন করিতেছে, আনন্দ জন্মিল, গোলাপদর্শক যুক্তি করিল না সত্য, কিন্তু যুক্তির কার্য্য তাহাতে হইয়াছে। যে ব্যক্তি গোলাপ না দেখিয়া গোলাপের সুন্দর বৎ গুলিয়া ও সৌবভেব কথা পুস্তকে উল্লেখ দেখিয়া গোলাপ আনন্দপ্রদ হয় কিনা। এই বিষয় বিচাব করিতে বিতণ্ডায় প্রবৃত্ত হয়, ভক্তি-নিন্দুক জ্ঞানেব অবস্থা ঠিক সেইরূপ। ঈশ্বরজ্ঞান জন্মিয়াছে, ভক্তি আসিবে না, এতদ্র ভ্রমাত্মক কথা কখনও অক্ষরে গঠিত হয় নাই। সকলে বলে—বিবেকানন্দ জ্ঞান প্রচার করিতেছেন, কিন্তু তাঁর মুখে বাববাব শুনিবে শ্রদ্ধা, শ্রদ্ধার প্রতি তাঁহার এরূপ শ্রদ্ধা যে, তিনি বহু ভ্রাতাজ হইয়াও তাহার প্রতি-কথা জানেন না। শ্রদ্ধা কথা লইয়া বৈদান্তিক বিবেকানন্দ উন্নত—ভক্তরা যেকপ উন্নাদ হইয়া থাকে—সেইরূপ উন্নাদ। ভক্তরা যেকপ বলেন, তিনিও বলেন, ‘শ্রদ্ধাবলে নরত্ব খুচিয়া দেবত্ব হয়, শ্রদ্ধাই সার, যার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই শ্রেষ্ঠ।’ এহলে কুট

তार्কিক বিজয়ী বিবেকানন্দের তর্ক নাই, কেবল বলেন শ্রদ্ধা।
কথার অর্থ বলিতে সক্ষম নন, বলেন শ্রদ্ধা। জ্ঞান-গর্ভিত ব্যক্তির
এই শ্রদ্ধাবান্ মহাপুরুষের শ্রদ্ধার উপর শ্রদ্ধা রাখিলে আর জ্ঞান-
ভক্তি লইয়া বিবাদ থাকে না। তিনি তত্ত্বকে পরম জ্ঞানী জানিয়া
তাহার পদানত হইবেন।

একটি গল্প বলিয়া আমার প্রবন্ধটি শেষ করি। কাশীধামে
বিশ্বেশ্বর দর্শনেব নিমিত্ত একজন মহাপুরুষ প্রচলিতভাবে নিত্য
আসিতেন, কোন ব্যক্তি, কিরূপে তাহাকে ধরা যায়—ভাবিতে
লাগিলেন, একজন ঋষি উপদেশ দিলেন, বিশ্বেশ্বরের মন্দিরের দ্বারে
কাশীপ্রাপ্ত ব্যক্তির শবদেহ একটি ফেলিয়া রাখিও। যিনি সেই
শবদেহ দর্শন করিয়া আর বিশ্বেশ্বর দর্শনে যাইবেন না, তিনিই
সেই মহাপুরুষ। যিনি শবদেহ দর্শনে ফিবিবেন, তাহার তাৎপর্য্য
এই যে, তাহার শিববাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস। কাশীর শবদেহ শিবত্ব প্রাপ্ত
হইয়াছে। শিববাক্যে বিশ্বাস বা শাস্ত্র শ্রদ্ধা একটি ভক্তি বা জ্ঞানেব
পরিচয়। শ্রোতৃবর্গের নিকট আমার প্রার্থনা, আমি যথাসাধ্য প্রবন্ধে
একবার হরি-নাম বলার গুণ ব্যাখ্যা করিবার চেষ্টা পাইয়াছি,
সকলে আশীর্বাদ করুন, যেন হরি-নামের গুণ আমাতে ফলবান হয়।

শ্রীগিরীশচন্দ্র ঘোষ।

“সুশীল ।”

দ্বিতীয় পল্লব ।

নব নাবী সন্মিলন,	শুভ পরিণয়-ক্ষেত্রে,
কবে যা'বা অমুক্ষণ,	মিলন বিবাহ-হৃদ্রে,
আনিল কুমারী এক সুরবালা সম,	বরমালা দেয় বালা সুশীলের গলে,
কপেগুণে অতুলনা,	সুশীলের পাশে বালা,
সুধাময়ী সে ললনা,	তমালেতে তরুবালা,
মন্দার কলিকা সম অতি মনোরম ;	অথবা চন্দ্রমা যেন সরসীর জলে ।

মনোরমা, মনোরমা;
 যদি ব্যাধা হবে বামা,
 স্ত্রীলের মলিনতা যুচায় বতনে,
 কুল মনে করে খেলা,
 আনন্দের মহামেলা,
 আঁখিতে থাকে সদাই হৃৎকনে;
 সুবক-সুবকী মনে,
 কবে কেলি কুল মনে,
 ভুলে আছে কাহিরের সংসার ব্যাপার
 রসেতে অলস তাঁরা,
 প্রেম-মদে মাতোয়ারা,
 সদাই প্রকুল মনে করিছে বিহার।
 এ হেন রূপের খেলা,
 আনন্দের মহামেলা,
 সহিল না বিধি হৃদে, ঘটে পরমাদ,
 যুচিল সেরূপ খেলা,
 ভাঙিল সে মহামেলা,
 অকস্মাৎ বিধি আসি সাধিল গো বাদ
 সুশীল সরল মতি,
 হেরিয়ে সবার প্রতি,
 দংশিল কুসঙ্গ-কাল-কণি—ভয়ঙ্কর,
 বিমোহিনী ফণাহার,
 ঢালিল বিষের ধার,
 সুশীল সরল মতি বিষে জর জ্বব।
 প্রলোভন নামে বালা,
 দশ দিশি ক’রে আলা,
 ছুটাইল মায়াবিনী রূপের তরঙ্গ,
 সুশীল সুন্দর হাস,

তার হাবুডুবু খায়,
 বিশ্ব-বিমোহিনী খেলা ফোঁসেনেব বঙ্গ
 সুশীল কু-সঙ্গী সহ,
 ভ্রমিতেছে অহুত,
 সাধেব সে কুঞ্জবন নর্তকী আলায়,
 যে কুসুমে দেব সেবা,
 আজি বিলাসিনী-সেবা,
 কি পরিবর্তন হের সঙ্গ বিনিময়!
 ধন মান আদি যত,
 ক্রমে হের পলায়িত,
 ক্রমে ক্রমে পলাইল শৈশব ভূষণ,
 মধু মাধা সুধা হাসি,
 আর কভু নাহি আসি,
 সাজাবে সে সুধালয় সুশীল-আনন;
 সবলতা, কপটতা,
 মধুরতা, বটিনতা,
 শৈশবে যোবনে হেব কত বিনিময়,
 এক চন্দ্রমাব হাসি,
 রবির কিরণ রাশি,
 মধুবে কঠোর কত বিভিন্নতা হয়?
 মিথ্যাচার, ব্যাভিচার,
 হইয়াছে অলঙ্কার,
 রূপ-জীবনী-প্রণয় কণ্ঠের ভূষণ,
 পবিত্র দেবী মুরতি,
 আহ্ন মনোরমা সতী,
 না পায় হৃদয়ে স্থান অধিছে নয়ন;
 পতি ভালবাসা ধনি,
 মনোরমা সীমন্তিনী,

পেয়েছিল হায় তাহা কোথায় এখন ?

এখন দেখিলে তা'রে,
সুশীল প্রহার করে,
শুভদৃষ্টি যা'র সনে বিবের নয়ন ।
অলঙ্কে নয়ন জলে,
ভাসায় সুগুণ্ডলে,
সমুপেতে দীর্ঘশ্বাস হযেছে সখল,
সোহাগের সোহাগিনী,
আজি হেব বিষাদিনী,
উদাসিনী সম সন্না আঁখি ছিল ছল ।
সতীর সে অপমানে,
লাগিল বিধির প্রাণে,
হেব শোকবাণ ত্যজে সুশীলেব প্রতি
অব্যর্থ শব সন্ধান,
বধিল পিতাব প্রাণ,
লয়ে যাব দিব্যধামে অতি দ্রুতগতি ।
কিন্তু হায় একি বীত,
হিতে হল বিপবীত.
বাড়িল আনন্দ মাত্রা পিতাব মরণে,
গৃহে আব নাহি যায়,
বাহিবে বাহিরে বয়,
সাধেব সে কুঞ্জবন নাহি লয় মনে ;
কুঞ্জবন বন তুল্য,
নহে তাহা মহামূল্য,
ইতাদব কেব সেবে কাছে নাহি যায়,
দিব্য স্থান ছিল যাহা,
আজি ছেয় ঘৃণ্য তাহা,

সংসারের মহামেলা-দু'দণ্ডে কুরায় ।

মনোরমা একাকিনী,
কুঞ্জবনে বিষাদিনী,
সুশীল জননী হায় ত্যজেছে জীবন,
একে একে সব গেল,
সব খেলা কুরাইল,
ইচ্ছাময় তব ইচ্ছা হউক পূরণ ;
সুশীলেব বন্ধু যারা,
ক্রমে হেব সবে তাবা,
নধুচক্র ভেঙ্গে গেলে ভুজ নাহি রয়,
আজি হের পথে পথে,
কোন বন্ধু নাহি সাণে,
ঐশ্বৰ্য্যের অনাদরে এইরূপ হয় ।
কুঞ্জবনে ওকে ধায়,
লাল আঁখি মন্ত প্রাণ,
কাবে হেব মারে লাগিবুক ফেটে যায়
সতী সাধ্বী মনোরমা,
প্রাণ বায়ু ত্যজে বামা,
ছিন্ন ব্রততীব মত ভূমেতে লুটায় ;
সাধেব বাসব হায়,
অকালে ভাঙ্গিয়া যায়,
হাঃ হাঃ অটুহাস্তে সুশীল হাসিল,
অবশেষে বাপীজলে,
সুশীল পরাণ ঢালে, [ডাকিল ?
“সুশীল” বলিয়া তোরে কেনরে
কি কুঞ্জে পিতামাতা ও-নাম রাখিল !
কিরণ ।

সুধাংশু ।

[পূৰ্ণ প্রকাশিতের পব ।]

[৪]

শশীশেখর গৃহে আসিয়া প্রথমেই স্নেহের নিকট গমন করিল, স্নেহ আপনার কক্ষে বসিয়া অশ্রুপাতি করিতেছিল, ভ্রাতাকে সম্মুখে দেখিয়া অঞ্চল দ্বাৰা অশ্রু মুছিল।

শশীশেখর স্নেহেব চক্ষে অশ্রু দেখিয়া প্রমাদ গণিল এবং ধীরে বলিল, ‘দিদি! আমি কাল আসিনি বলে কান্দচ?’

স্নেহ বলিল “হ্যাঁ ভাই! শুধু তাই নয়—বতন এসে বাবাকে কাল রাত্রে অনেক কথা বলে গেল। তুমি সরকারী কাণ্ডের ক্ষতি কর্ছ, বাবা আর তোমার মুখ দেখবেন না।”

শশীশেখর আত্মোপাস্ত ব্যাপার বুলিল, এবং স্নেহের পদতলে পড়িয়া বলিল দিদি! তুমি?—মা? বাপের বাড়ী চলে গেলেন, তোমাকেও সেই—

স্নেহ। তুমি যা’ বলবে।

শশী। কিছু বলবো না—আমি চলেম;—

স্নেহ। কোথায়?

শশী। যেখানে পিতার অধিকার নাই,—

স্নেহ। পুন্স?

শশী। তাকে সঙ্গে কবে নিষে যাবো;—

স্নেহ। কাল পুন্সেব সঙ্গে কি কথা হ’ল?

শশী। কাল তার জননীৰ মৃত্যু হয়েছে—সারারাত্রি জাগিয়া তাহার সংকার করিয়াছি;—

স্নেহ। তারপর?

শশী। পুন্সের জনীর মৃতদেহ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছি, “পুন্স আমার।”

স্নেহ। পুষ্প কি সত্যই তোব ?

শশী। তুমি ভগিনী—দিদি, নতুবা অথ কেহ ও-কথা বলিলে
জন্মে তাহাব মুখ দেখিতাম না।

স্নেহ। তবে সে ধান কোথায় পেলে ?

শশী। স্নেহ-দিদি তোমাব তা জানা উচিত, কেন না, তুমি
আমাব বড়, তুমি অনেক দিন ত তাদের বাড়ী গেছ ?

স্নেহ। পুষ্প স্বর্গের পাবিজাত—দানবের অত্যাচার স্বর্গ-শ্রীহীন
হইলেও পাবিজাতের গন্ধ ও শোভা তেমনই আছে।

শশী। দিদি! বাবা তার পিতাব সর্বনাশ করিয়াছেন তা'ই
পুষ্পেব এই দশা—সে দরিদ্র হইয়াছে—কিন্তু ভিক্ষা করিতে জানে
না, কাহাব সাহায্যও চাহে না। যতদিন তাহাব জননী'ব শরীবে
বল ছিল, পুষ্প ঘবে বসিয়া থাইতে পাইত, কিন্তু আজ কখনো—
তিনি শয়্যাগত ছিলেন, পুষ্প মাঠে পথে যে ধান কাঁধাব বোঝা
হইতে খসিয়া পড়িত, তাহাই কুড়াইয়া বোঝা কাঁধিয়া ঘরে লইয়া
যাইত—এবং তদ্দ্বারা নিজের ও জননীর আহার চালাইত।

স্নেহ। পুষ্পকে তুমি প্রথমেই চিনিয়াছিলে কি ?

শশী। না, তাহাব কুটির দেখিয়া চিনিয়াছিলাম।

স্নেহ। এখন কিছু খা ?

শশী। না দিদি চলিলাম—এ বাটীতে আব আমার স্থান নাই
আমি পুষ্পের নিকট ভয়ানক ষড়যন্ত্রেব কথা শুনিলাম। পিতা
এখন পুষ্পেব প্রাণ নাশেব চেষ্টায় আছেন, আমাকেও ছলে
কোন কুঠিতে আবদ্ধ করিয়া রাখিবেন, কেন না আমার অপরাধ
—আমি পিতার পাপকার্যে সহায়তা করি না—তিনি লোকের
সর্বনাশ করিয়া বিষয় বৃদ্ধি কবেন—আমি তাহাতে দ্বাধা দিই।
আহা! অনাথিনী পুষ্প! বাবাব জন্ত তাহার এই দশা! কিন্তু
দিদি! আমি পুত্র হইয়া পিতাকে সে পাপ হইতে মুক্ত করিব।
অতই পুষ্পকে লইয়া এ গ্রাম পরিত্যাগ করিব, তাহা হইলে
পিতা আর নারী-হত্যা-জনিত পাপে পতিত হইবেন না, তাহার

এখন আমি ভিন্ন আর কেহ নাই। দিদি! আমি চলিলাম, বিদায়,—বদি কখন দিন পাই আবার দেখা হইবে, নতুবা এই পর্য্যন্ত।”—এই বলিয়া শশীশেখর দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন।

স্নেহের মুখে কথা সরিল না, কেবল চক্ষু দিয়া হৃৎকঁটা অশ্রু জল গণ্ডস্থল বহিয়া পড়িতে লাগিল।

[৫]

শশীশেখর বরাবর পুষ্পের কুটিবে গমন করিয়া সেই দিনই তাহাকে সঙ্গে লইয়া গ্রামান্তরে যাইয়া বাস করিল এবং অশৌচাঙ্গে ব্রাহ্মণ আনাহইয়া ধর্ম্ম সাক্ষ্য করিয়া তাহার পাণি-গ্রহণ করিল—পুষ্প এখন শশীশেখরকে দেখিলে কিঞ্চিৎ লজ্জা না করিয়া থাকিতে পারে না।

শশীশেখর এতদিন নিজ-বচ হইতে যে অর্থ সঞ্চয় করিয়াছিলেন, তাহাতেই বেশ সুখে দিন কাটাইতে লাগিল, পুষ্প এখন সম্ভবিকণিত গোলাপ ফুলের প্রায় হইয়া উঠিল।

অপর গঞ্জে বাধিকাপ্রসাদের কি হইল—স্নেহই বা এখন কি করিতেছে? শশীশেখর অমন করিয়া চলিয়া যাইবে, স্নেহ ততটা ভাবে নাই—সুতরাং ভ্রাতার অবিজ্ঞানে তাহাব দেহ মন জীর্ণ নীর্ণ হইয়া পড়িল, ইহাব উপর অল্পদিন পরেই তাহাব স্বামীবিয়োগ ঘটিল—তথাপি স্নেহ শশীশেখরের জন্ত বাঁচিয়া বহিল—স্নেহের জননী বন্ধ-উন্মাদিনী হইলেন। রাধিকাপ্রসাদ কিঞ্চিৎ অশ্রুমনস্ক হইলেন।

ঘরে অগ্নি লাগিয়া রতন মণ্ডল গৃহস্থ ও সর্বস্বান্ত হইল—সেই বিষম অগ্নিকাণ্ডে তাহার একমাত্র পুত্র পুড়িয়া মরিল—রতন তখন শশীশেখর ও পুষ্পের জন্ত কঁাদিতে আবন্ত করিল—কিন্তু তাহাদের উভয়ের সংবাদ জিবাটাতে কেহ জানে না।

রতন বুদ্ধিল—এ সকলই তাহার প্রভু-দ্রোহিতা এবং সরলা বালিকা পুষ্পের সর্বনাশ সাধনের সমুচিত প্রতিকূল; সুতরাং সে মনে মনে একটা প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থা স্থির করিল—রতন, শশীশেখরের সন্ধানে চলিল।

[৬]

যেখানে শশীশেখর পুষ্পকে লইয়া বাস করিতেছেন, সে স্থান ত্রিবাটী হইতে প্রায় দশ পনর ক্রোশ দূরে; রতন কিন্তু অসুসন্ধানে বহির্গত হইয়া প্রায় পঞ্চাশ ক্রোশ দূরে যাইয়া পড়িল।

শশীশেখর ও পুষ্প একত্রে আর চাৰি বৎসর সুখ-সন্তোষ করিল, ইতি মধ্যে পুষ্পের একটি পুত্র হইয়াছে—স্বামী ও স্ত্রী, মধ্যে মধ্যে পুত্রের প্রতি চাহিয়া চাহিয়া অশ্রুপাত করেন। কিন্তু শশীশেখরকে আর বড় অধিক দিন এ যজ্ঞগা ভোগ করিতে হইল না।

শশীশেখর প্রতি মাসে প্রচুর বেগে, এক একবার অশ্রারোহণে ত্রিবাটী গমন করেন। এবাবেও গমন করিলেন, কিন্তু প্রত্যাগমন সময়ে পথিমধ্যে অন্ধকারে পথ হারা হইয়া অন্ধ সহিত একটা কূপে পতিত হইলেন, এবং সমস্ত রাত্রি সংজ্ঞা-হীন অবস্থায় পড়িয়া রহিলেন—প্রভাতে একজন লোক আসিয়া তাহাকে উঠাইল—এবং পাকী আনাইয়া গৃহে লইয়া গেল।

এই আঘাতে শশীশেখর অসুস্থ হইলেন, এবং এক মাস পরে তাহার মৃত্যু হইল—পুষ্পের দশা এইবার কি হইল তাহা বর্ণনাতীত!

[৭]

প্রায় তিন মাস পবে একদিন রতন শশীশেখরের সন্ধানে লমণ করিতে করিতে পুষ্পের বাটী আসিল—পুষ্প তখন পুত্রটিকে ক্রোড়ে লইয়া বাটীর দ্বারদেশে দাঁড়াইয়া আছে। রতন পুষ্পকে দেখিল—কিন্তু চিনিতে পারিল না—পুষ্পও তাহাকে চিনিল না। রতন ধীবে ধীরে অগ্রসর হইয়া বলিল “মা!—আমি আজ করদ্দিন পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হইয়াছি, যত্বপি আমাকে আশ্রয় দেন, তবে বড় উপকৃত হই—আব এই গ্রামে কি শশীশেখর নামে কেহ বাস করেন?—আমি বে গ্রামে যাইতেছি, সেই গ্রামে প্রত্যেককেই এই কথা জিজ্ঞাসা করিয়া আসিতেছি।”

পুষ্প এতক্ষণে রতনকে চিনিলা, এবং ভয়ে গৃহ মধ্যে পলায়ন করিল। রতন ডাবিল—রমণী তাহাকে দেখিয়া কিছু না বলিয়া পলাইল কেন? ভাবিতে ভাবিতে তাহার পুষ্পের কথা মনে পড়িল, তখন সে বাটীর প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিয়া কাতব-কণ্ঠে বলিল ঘা—পুষ্প! আমি তোমায় চিনিয়াছি, তুমি আমাদের ত্রিবাটীর পুষ্প। আর ভয় নাই মা! একবার গৃহের বাহির হইয়া ভাল করিয়া দেখ, রতনের কি দশা হইয়াছে—তোমাদের অনু-সন্ধানে আমি আজ কয় বৎসর পথে পথে ফিরিয়াছি—আমার পাপেব প্রায়শ্চিত্ত হইয়াছে—আমাব গৃহ অগ্নিতে ভস্মসাৎ কবি-য়াছে—আমার পুত্রকে বিনাশ করিয়াছে—আমি এখন পথের কাঙ্গালি—কিন্তু পাপেব প্রায়শ্চিত্ত এখনও বাহা বাকী আছে, তাহা শেষ-করিব। এস মা—আমার ত্রিবাটীর যোত্র-জমা তোমাকে দেওয়াইব—রতনের কথায় রাধিকাপ্রসাদ অমত করিবে না—এখন এস এবং বল শশীশেখর কোথায়?—সেই দবিদ্রেব ‘মা বাপ’ শশী-শেখরকে দেখাও।”

এই সময় গৃহ মধ্যে হইতে অক্ষুট ক্রন্দন ধ্বনি বতনের কর্ণে প্রবেশ করিল। রতন সে ক্রন্দনেব মৰ্ম্ম বুঝিল, তাহার মৰ্ম্ম স্থান বিদ্ধ হইল—রতন ভূমে পড়িয়া বালকের আয় কাঁদিতে লাগিল—পুষ্প আব গৃহ মধ্যে থাকিতে পারিল না—বাহিরে আসিয়া রতনকে বলিল;—

“বতন!—আর কাঁদিও না,—তোমাদের প্রভু স্বর্গে গিয়াছেন, কিন্তু তাহার পরিবর্তে এ শিশুকে গ্রহণ কর—যতপি ইচ্ছা হয়, ইহাকেই তোমাদের প্রভু বলিয়া মনকে সান্ত্বনা কর।—

রতন দ্রুত বাইয়া শিশুকে ক্রোড়ে লইল—শিশু রতনেব ক্রোড়ে আসিয়া ‘দা’ ‘দা’ বলিয়া তাহার নাকটী কামড়াইতে লাগিল—রতন ক্ষণেকের জন্ত সকল শোক বিস্মৃত হইল। পুষ্প রতনকে পূৰ্ব্বাপর সকল কথা বলিল।

রতন সেই কথা শুনিয়া শিশুকে আদর করিতে করিতে

বলিল,—“মা!—এখানে থেকে আর কি করছি—চল জিবাটা বাই—
জিবাটার শিশু জমিদারকে এখানে কে আদর বন্ধ করবে?”

পুষ্প কান্দিয়া বলিল—“রতন! যে পরের ধান চুরি করিয়া জীবন
ধারণ করিত—তাহাব পুত্রকে জিবাটার লোক খাওয়াইবে কেন?”

রতন পুষ্পের পদতলে পড়িল—পুষ্প সরিয়া দাঁড়াইল এবং
বলিল,—“রতন! আমি আজ তিনদিন অনাহারে আছি, এখনও
অনাহারেই থাকিব—এ কথা কাহাকেও বলিতাম না, কেবল এই
শিশুর জন্তই বলিতেছি। তুমি আজ থাক, কাল এতে জিবাটা
যাইয়া স্নেহ দিদিকে সকল কথা বলিও—যদি তাঁহার পিতার মত
হয়—ইহাকে লইয়া বাইও—আর জিবাটাতে শেষদিন যে ধানের
বোঝা চুরি করিয়াছিলাম, তাহাও রাখিয়া দিয়াছি—তোমাকে ঐ
সঙ্গে তাহাও দিব—উহা তোমাদের মৃত প্রভুর জীবনের মূল্য;
সুতরাং উহা জিবাটার লোকেবই প্রাপ্য—আমি কেবল পেড়া
পেটের জ্বালায় পথে পথে কুড়াইয়া একত্রিত করিয়াছিলাম।”

রতন বলিল “মা—! এখন চলিলাম—পারি—কাল মধ্যাহ্নে এখানে
আসিয়া যাহা ভাল বুঝিব করিব।”

এই বলিয়া আর উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া রতন ক্রতবেগে
বাটাব বাহির হইয়া গেল। পুষ্প আসিয়া ঘূহের দ্বার বন্ধ করিয়া
শয়ন করিল।

[৮]

পল্লীগ্রামে প্রত্যেক গৃহস্থেরই হই একটি ঘোটক থাকে—সে
সকল ঘোটক অনেক সময় দিবারাত্রি মার্চে, পথে চরিয়া বেড়ায়।
রতন পুষ্পের বাটা হইতে কিয়দূর গমন করিয়া একটা অশ্ব
দেখিতে পাইল এবং ধীরে ধীরে নিকটে বাইয়া তাহার উপর
চড়িয়া বসিল, এবং প্রায় ৪১৫ ঘণ্টা পরে জিবাটা আসিয়া উপ-
স্থিত হইল। তখন অপ্রয়োজন বোধে অশ্বটিতে ছাড়িয়া দিল,
এবং ক্রতগতিতে রাধিকাপ্রসাদের গৃহাভিমুখে চলিল, পথে পূর্বোক্ত

নারেবের সহিত সাক্ষাৎ হইল, রতন তাহার সহিত বাক্যালাপও করিল না—রতন বরাবর হাইয়া রাধিকাপ্রসাদের বিজ্ঞানক্ষেত্রে গমন করিল, এবং তাহাকে সম্মুখে দেখিতে পাইয়া নমস্কার করিয়া বলিল,—“বাবু! আমি এসেছি।”

রাধিকাপ্রসাদ করতলে মস্তক রাখিয়া কি ভাবিতেছিলেন—রতনের স্বর তাহার মস্তক স্পর্শ করিল এবং চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন—রতন স্বপ্ন! তাহার আপাদমস্তক কাঁপিয়া উঠিল—রতন আবার বলিল “বাবু! একবার আপনার কত্না দেখকে এই খানে ডাকিয়া পাঠান।—”

রাধিকাপ্রসাদ বিস্মিত হইয়া বলিলেন—“কেন রতন? এতদিন কোথায় ছিলে?”

‘শশী বাবুর অহুস্কানে’ এই বলিয়া রতন স্বয়ং একজন চাকরকে ডাকিয়া দেখকে ডাকিয়া আনিতে বলিল—চাকর তাহাকে চাকিতে চলিয়া গেল।

রাধিকাপ্রসাদ বসিয়াছিলেন, রতনের কথা শুনিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন—রতন ফিরিয়া আসিয়া তাহার সম্মুখে দাঁড়াইল।—রাধিকাপ্রসাদ বলিলেন—“রতন! কোথায় গিয়াছিলে বলিলে?”

রতন দৃঢ়স্বরে বলিল—“শশী বাবুর অহুস্কানে—তাহাকে দেখে ফিরাইতে—”

রাধিকাপ্রসাদ তীব্র স্বরে বলিলেন,—“শশীশেখর আমার পুত্র হইয়া আমার শত্রু, আমার উন্নতির পথের কণ্টক, আমার—আমার শত্রুর কত্নাকে বিবাহ করিয়া আমায় যথেষ্ট অপমানিত করিয়াছে—তুমি তাহাকে আবার আনিতে গিয়াছিলে, সুত্তরাং তুমিও আমার শত্রু।”

এই সময় সেই সেই কক্ষে প্রবেশ করিল, রতন রাধিকা-প্রসাদের কথার কোন উত্তর না দিয়া দেখকে লক্ষ্য করিয়া বলিল,—“মা দেখ! একটী অনাথ শিশুর ভার গ্রহণ করিতে পারিবে কি?”

স্নেহ বলিল,—“পারিব।”

রতন। আগে সকল কথা শোন, তবে বলিও।

স্নেহ। তবে বল।

বতন। ত্রিবাটীৰ প্রবল জমিদার রাধিকাপ্রসাদের এক পুত্র মৃত শশীশেখরের পুত্র অনাথ শিশু আজ তিন দিন অনাথ মৃত প্রায়।

রাধিকাপ্রসাদ ও স্নেহ উভয়েই সংজ্ঞাহীন হইয়া কুতলে হইল।

[২]

রাধিকাপ্রসাদ শীঘ্র সংজ্ঞালাভ করিল, কিন্তু স্নেহ মৃতকর রহিল—রতন অনেক যত্নে তাহার চৈতন্য সম্পাদন করিল। ধীরে ধীরে উত্তিয়া বসিল, এবং “বাবা! তোমার ত্রিবাটী আমি চলিলাম”—এই বলিয়া রতনকে সঙ্গে লইয়া কক্ষ নিষ্ক্রান্ত হইল। রাধিকাপ্রসাদ বিদ্যুৎবেগে তাহাদের পশ্চাতে করিলেন এবং স্নেহকে সম্মুখে পাইয়া বলিলেন;—

“মা স্নেহ! কোথায় যাও?”

স্নেহ কাতরকণ্ঠে বলিল,—“যেখানে পুঙ্গ শশীশেখরের লইয়া অনাহারে আছে?”

রাধিকা। তাহার পর?

স্নেহ। বাহ্যিক ত্রিবাটীর অধিকার প্রাপ্ত হয়, তাহাই করিব।

রাধিকা। আমি স্নেহচার্য্য তাহা দিব—এই রাত্রেই ত্রিবাটীর মণ্ডল, প্রজা, পাইক লইয়া সেই স্থানে যাই কি চাও?

এই বলিয়া তিনি রতনকে সেই রাত্রেই সকলকে গমনের আয়োজন করিতে বলিলেন। রতন আপনার কা করিল।

স্নেহ আসিয়া পিতার পদতলে পড়িয়া কঁাদিতে কঁাদিতে বলিল,
“বাবা! আমাদের শশী?—”

রাধিকা। স্নেহ—আর কেন? আমার পাপের প্রতিফল যথেষ্ট
হইয়াছে।

এই বলিয়া উভয়েই নিম্নে গমন করিলেন। অল্পক্ষণ পরেই
পাকী, বেহারা, পাইক, প্রহরী, সকলেই আসিল—রাধিকাপ্রসাদ
সদলভাবে পুষ্পানয়নার্থে গমন করিলেন। রতন সকলের অগ্রে
অগ্রে চলিল।

[১০]

পরদিন পূর্বোক্ত পুষ্পের বাটীর অদূরে বিষম কোলাহল সমুদ্ভূত
হইল। পুষ্প শিশুটিকে জোড়ে করিয়া ভূমে পড়িয়া অনাহারের
ভাবনায় ভাবিতেছিল, এমন সময় এ স্বর তাহার কর্ণে প্রবেশ
করিল। ব্যাপার কি জালিবার জন্ম সে উঠিয়া বলিল—কিন্তু শরীর
বিষম দুর্বল বলিয়া শুইয়া পড়িল—এমন সময় রতন আসিয়া
ডাকিল, “মা—লক্ষ্মি! এই দেখ কে এসেছে?”

পুষ্প বুঝিল রতন আসিয়াছে, স্ততরাং অতি কষ্টে উঠিয়া দ্বার
খুলিল এবং সমুখে রতন ও স্নেহকে দেখিয়া মুচ্ছিতের প্রায়
বসিয়া পড়িল। স্নেহ যাইয়া তাহাকে ধরিয়া বলিল—পুষ্প স্নেহের
স্বকোমল স্পর্শে যেন কিঞ্চিৎ বল পাইল, এবং ক্ষীণকণ্ঠে বলিল—
“তাই স্নেহ! তুমি এসেছ? এই শিশুটিকে ধর—এটা তোমার।”

স্নেহ স্নেহভরে বলিল—“হ্যাঁ জ্বাই এসেছি, বাবা এসেছেন,
ত্রিবাটীর তোমার অধিকাংশ প্রজাই আসিয়াছে। এই বলিয়া
শিশুটিকে জোড়ে লইয়া বারখার তাহার মুখ চুম্বন করিল—এবং
স্বীয় নয়ন জলে তাহাকে স্নান করাইল।—

এই সময় রাধিকাপ্রসাদ ও অত্যন্ত লজ্জিত সেই গৃহ-প্রাঙ্গণে
আসিল।—স্নেহ শিশুটিকে লইয়া পিতার হস্তে প্রদান করিল—
রাধিকাপ্রসাদ নির্নিমেমে তাহাকে দেখিতে লাগিলেন। ইহা পর

মধ্যাহ্নে সেই স্থানে সকলেই আহারাদি সমাপন
অপরাহ্নে সকলেই দ্বিবাটী ফিরিলেন ।

সেই মরে আসিয়া পুত্রকে বলিলেন—“ছেলের কি :
রাহিস ।” পুত্র—“বলিল কিছুই না ।” সেই বলিল আমি
নাম রাধিকাম—সুধাংগু ।

শ্রীভামলাল ২ ।

সমালোচনা ও মতামত ।

মীমাংসা-তত্ত্ব—প্রথম ভাগ, ত্রিযুক্ত নবকুমার
নিরোগী কর্তৃক প্রণীত । মূল্য ১ টাকা মাত্র ।

পাশ্চাত্য-শিক্ষা-প্রাপ্ত মহোদয়গণের হিন্দু ও
বিরুদ্ধে উপর্যুপরি লেখনী চালন, অধাস্থিকগণের
বাদান্তবাদ (যাহা হিন্দুধর্ম বরাবরই গা’ পালতিয়া সহিয়া
তাহার একটি মীমাংসা করিবার জন্য গ্রন্থকার অনেক
ও অর্থ ব্যয় করিয়া এই “মীমাংসা-তত্ত্ব” প্রচার করিয়াছে
পাদ নবকুমার বাবুর এই অভিনব ও সর্বজন প্রীতিপ্রদ
আমরা বাস্তবিকই অত্যন্ত আশ্লাদিত হইয়াছি । গ্রন্থে
আধুনিক পুরাণ ও তত্ত্ব হইতে হয় নাই ; শৈবেরা মহা-
করিয়া তাহাদের দেবতাকে বড় করেন নাই, বৈষ্ণব
ব্রহ্মা শিবকে বিষ্ণুর ভক্ত বলিয়া ও বিষ্ণু ব্রহ্মাঙ্ক শিবকে
নির্দেশ করিয়াছেন, বেদে সাকার উপাসনা ও প্রতিমা
নাই, বেদে জাতিভেদ নাই—এই সকল পাশ্চাত্য
গণের সমালোচনা আশ্লাচনার—মীমাংসা করিয়া তাহ
চিন্তা-শক্তির পরিচয়ের সহিত হিন্দু সাধারণের বিশেষ উ-
করিয়াছেন । নাটক-নভেলাদি-প্রাবৃত্ত বহুদূরশে এই
অতি সাবধান গ্রন্থের আদর হইবে কি না বলিতে পা-